শিক্ষার আলোকে মনোবিজ্ঞান

শিক্ষার আলোকে
মনোবিজ্ঞান

[বি. এড.-এর দ্বিতীয় পত্র, বি. এ. ও বি. এ. অনার্স (এডুকেশন)-এর এবং নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠ্যসূচী অবলম্বনে রচিত]

গায়ত্রী যতি

এম. এ. ডাবল (দর্শন—দ্বিতীয় শ্রেণী, এডুকেশন—প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয়); স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ প্রাপ্ত (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, বাণীপুর); বি. এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম—রিজিওনাল ট্রেনিং কলেজ—ভুবনেশ্বর), ইংলিশ টিচিং ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত (ইনষ্টিটিউট অব ইংলিশ—কলিকাতা)।

শিক্ষাপদ্ধতি ও শারীরবিজ্ঞান পুস্তক প্রণেতা এবং পদ্ধতি, পরিচালনা ও স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গে পুস্তক রচয়িত্রী; অধ্যক্ষা, রামকৃষ্ণ মিশন সারদামন্দির নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থা, ইউনিট—২, সরিষা, ২৪ পরগণা।

—প্রাপ্তিস্থান—

স্যাঙ্গুইন পাবলিশার্স কনসার্ন

৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,

কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীশান্তিরঞ্জন সন্যাল
জেনুইন পাবলিশার্স কনসার্ন
৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মূল্য : চৌদ্দ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীসুধাতোষ বসু
ইম্প্রেশন
৩৩বি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

॥ কেন এই প্রয়াস ॥

শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব দিন দিন যে গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে—একথা বোধকরি আজ আর কাউকে বলে বোঝাতে হবে না; বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে নিরন্তর ভাঙাগড়ার কাজ এটি স্পষ্টই প্রমাণ করেছে যে শিক্ষাকাজ চলা উচিত শিশুমনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে—তা না হ'লেই ছন্দোপতন ঘটবে। মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রেখেই অবশ্য শিক্ষাজগতে বহু পুস্তক মুখর হ'য়ে উঠেছে। তার ফলে পুস্তকগুলি ভয়ঙ্কর রকমের স্ফীতোদর হ'য়ে উঠেছে—যা দেখে নবীন শিক্ষার্থীর মনের খবর জানার স্পৃহা হয়তো অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু একটু সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে মনের জটিল খবরগুলি পরিবেশন করার প্রচেষ্টা মন্দ কি? তাই বোধ হয় ভয় ভাঙানর উৎসাহ নিয়ে, বেশী উদাহরণজালে না জড়িয়ে, ক্ষীণ কলেবর নিয়ে পুস্তকখানি আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হচ্ছে। এতে যদি তরুণ বিদ্যার্থীরা মনোবিজ্ঞানের মর্ম উদ্ধারে কিছুমাত্র হদিশ পেয়ে থাকেন তবে এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে সার্থক হ'য়ে উঠবে।

পুস্তকখানি রচনাকালে অবশ্য বি. এড. শিক্ষার্থী, বি. এ. পাশ ও অনার্সের (এডুকেশানের) শিক্ষার্থী ও বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণের ভাই বোনেদের মুখগুলি ভেসে উঠেছিল। তাদের পাঠ্যক্রমের বিষয়গুলিই পু,্তকখানিতে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে।

পুস্তকখানি রচনাকালে বহু দেশী বিদেশী পুস্তক ও পত্র পত্রিকার সাহায্য নিতে হয়েছে। যাঁদের রচনা জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে পুস্তকখানিতে ছায়া ফেলেছে তাঁদের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। মুদ্রনজনিত ত্রুটি আশাকরি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা সংশোধন করে নেবেন।

পুস্তকখানি প্রকাশে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। প্রচ্ছদপট এঁকে ও ছবি এঁকে সাহায্য করেছেন আমার সহকর্মী প্রীতিভাজন শ্রীমান বীরেন গৌতম; তাঁকে জানাই ধন্যবাদ। আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি প্রকাশককে যিনি পুস্তকখানি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন।

আজ এই শুভমুহূর্তে আর একজনের আশীর্বাদ ভিক্ষা করি—যিনি পুস্তকখানি পেলে খুশী হতেন—তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই—সেই নির্মোহানন্দজী মহারাজের অমরলোকের আশীষ বর্ষিত হোক পুস্তকখানির জন্মলগ্নে।

গায়ত্রী যতি

সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম

উৎসর্গ

একান্ত আপনজন

পিনাকীকে

বইখানি দিলাম।

॥ সূচীপত্র

শিক্ষার আলোকে মনোবিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

মানস জীবনের জৈবিক নির্ভরতা

দেহ ও মনের সম্পর্ক অতি নিবিড়; একটির সুস্থতা অন্যটির উপর নির্ভর করে। শরীর খারাপ থাকলে মনটা সাধারণভাবে বিক্ষিপ্ত থাকে, আবার মনে কোন আঘাত পেলে শরীরের উপর তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়; যেমন, শরীরটা দুর্বল বোধ হয়, মাথা ঘোরে ইত্যাদি। এটা আজ প্রায় বৈজ্ঞানিক সত্য যে প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার সাথে একটা না একটা শারীরিক প্রতিক্রিয়া জড়িত থাকে; যেমন দেখা যায়, আমরা যখন রাগ করি তখন আমাদের বিভিন্ন রকম শারীরিক পরিবর্তন হয়—চোখ লাল হয়, গলার স্বর জোর হয়, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে, হাত পায়ের চঞ্চলতা বেড়ে যায় ইত্যাদি। যে কোন বাইরের উদ্দীপক আমাদের শরীরের উপর তার ছায়া ফেললে, সেই ছায়া তৎক্ষণাৎ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

বাইরের জগত থেকে মন যখন জ্ঞান আহরণ করে তখন তাকে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করতে হয়; আবার মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে হলে দেহযন্ত্র ছাড়া কোন উপায় নেই। পঞ্চ-ইন্দ্রিয় নানান অভিজ্ঞতা নিয়ে মনের দরজায় হাজির হয় এবং মনের নির্দেশের অপেক্ষায় কাল গুণতে থাকে। কাজেই দেহ ও মন কোনটিরই একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে জানার প্রচেষ্টা অর্থহীন। মনকে জানতে হলে দেহকে অবশ্যই জানতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের আচরণকে দেহ ও মন উভয়েই প্রভাবিত করে; দেহযন্ত্রের যে সব অংশ আমাদের আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তাদের আলোচনা একান্তভাবেই আবশ্যক। দেহের মধ্যে স্নায়ুতন্ত্র ও গ্রন্থিতন্ত্র প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই এগুলির গঠন ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

আমরা সাধারণভাবে বলে থাকি কান দিয়ে শুনি, চোখ দিয়ে দেখি, নাক দিয়ে গন্ধ শুঁকি, ইত্যাদি। কথাগুলি খানিকটা সত্য কিন্তু সবটা নয়, কারণ চোখ, কান, নাক প্রভৃতির সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে আমাদের মস্তিষ্কের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে; এই যোগাযোগ ছিন্ন হলে আমরা কিন্তু চোখেও দেখতে পাব না, কানেও শুনতে পাব না। কাজেই আমাদের দেখাশোনা, হাসিকান্না সবের মূলেই আছে স্নায়ুতন্ত্রের কাজ, তাই মানুষের আচরণ ও মনের খবর

জানতে হলে স্নায়ুতন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের খানিকটা ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

স্নায়ুতন্ত্র

দেহের বিভিন্ন কাজের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করে তাকে সুনির্দিষ্ট পথে চালিত করে স্নায়ুতন্ত্র। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বাইরের জগৎ থেকে জ্ঞান আহরণ করি ও পেশীর সাহায্যে আমরা বাইরের জগতের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করি; আর এই ইন্দ্রিয় ও পেশীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে দেয় স্নায়ুতন্ত্র।

আমাদের সারা দেহে সূক্ষ্ম সুতোর জালের মত ছড়িয়ে আছে অসংখ্য স্নায়ু (Nerve)। কাজকর্ম ও জৈবিক প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে বিচার করে এই স্নায়ুগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) প্রধান বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous System)।

(২) উপান্ত স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral Nervous System)।

(৩) স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic Nervous System)।

স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System)

- প্রধান বা কেন্দ্রীয়
  - মস্তিষ্ক
    - গুরু মস্তিষ্ক
    - মধ্য মস্তিষ্ক
    - নিম্ন মস্তিষ্ক
    - সেতু মস্তিষ্ক
  - সুষুম্নাকাণ্ড
- উপান্ত
  - মস্তিষ্ক স্নায়ু
  - সুষুম্না স্নায়ু
- স্বতন্ত্র
  - সমবেদী
  - পরাসমবেদী
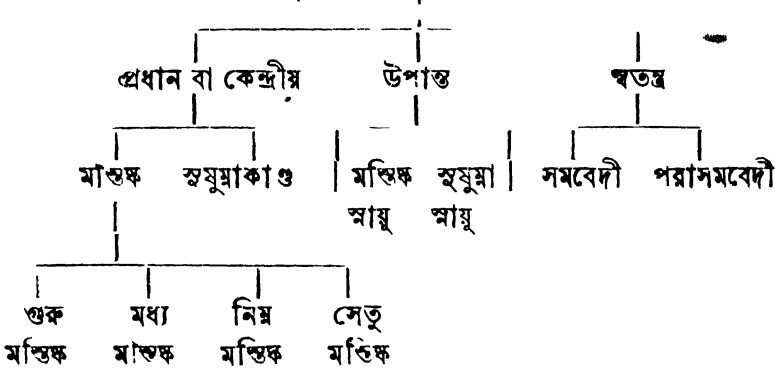
কেন্দ্রীয় বা প্রধান স্নায়ুতন্ত্র

স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র হল মস্তিষ্ক (Brain); তারপরেই আছে মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal Cord)। এই দুই প্রধান অংশ থেকেই সব শাখাপ্রশাখা বেরিয়েছে, যাদের একত্রে স্নায়ুতন্ত্র বলা হচ্ছে।

(ক) মস্তিষ্ক (Brain)—মাথার খুলির (skull) মধ্যে একরকম জেলীর মত ধূসর রঙের অর্ধতরল পদার্থ থাকে যাকে আমরা মস্তিষ্ক বলি। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের ওজন প্রায় তিন পাউণ্ড। মস্তিষ্ক হ'ল বিচারবুদ্ধি, ইচ্ছা-

শক্তি ও অন্যান্য মানসিক ক্রিয়ার উৎস। বিশেষ বিশেষ কার্যক্ষমতা অনুসারে মস্তিষ্ককে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা হয়। (ক) গুরুমস্তিষ্ক (Cerebrum)
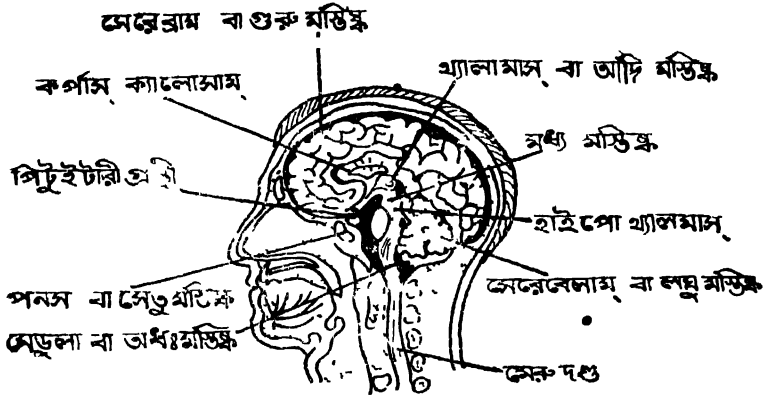
মস্তিষ্ক

(খ) মধ্য মস্তিষ্ক (Cerebellum), (গ) নিম্নমস্তিষ্ক (Medulla Oblongata) ও সেতু মস্তিষ্ক (Pons Vaiolii)।

(ক) গুরু মস্তিষ্ক (Cerebrum)—মস্তিষ্কের এই অংশটি প্রায় সারা মাথাটা পাগড়ীর মত ঢেকে রেখেছে, সম্পূর্ণ মস্তিষ্কের প্রায় $\frac{৯}{১০}$ ভাগ জুড়ে আছে এই গুরু মস্তিষ্ক। গুরু মস্তিষ্কের ঠিক মাঝখান দিয়ে একটা সিঁথির মত ফাটল আছে, এটাই মস্তিষ্ককে ডান ও বাঁ দুটি ভাগে ভাগ করে দিয়েছে—প্রত্যেক ভাগকে অর্ধগোলক বা hemisphere বলে। প্রত্যেক অর্ধগোলকের
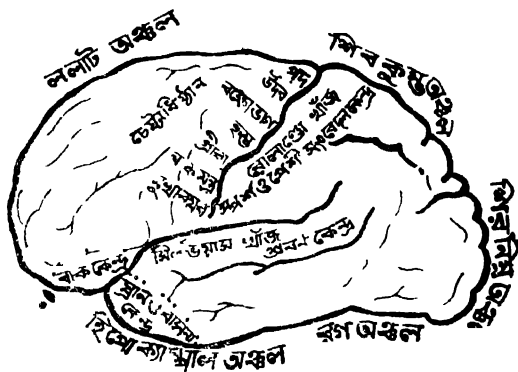
গুরু মস্তিষ্ক

মধ্যে আবার চারটি করে ভাগ আছে—যেমন, সম্মুখ (frontal lobe), মধ্য (perietal lobe), পশ্চাৎ (occipital lobe) আর নিম্ন (temporal lobe)।

গুরু মস্তিষ্কে দুটি বৃহৎ খাঁজ আছে—একটির নাম রোল্যাণ্ডো খাঁজ, অপরটির নাম সিলভিয়াস্ খাঁজ। রোল্যাণ্ডো খাঁজের সামনে ও ললাট অঞ্চলের পিছনে যে অংশটা আছে তা হল ক্রিয়াশক্তির কেন্দ্র (motor area) অর্থাৎ এখান থেকে সমস্ত কাজ করার নির্দেশ আসে। রোল্যাণ্ডো খাঁজের পিছনে থাকে পেশী সংবেদনের কেন্দ্র (sensory area) অর্থাৎ আমাদের ত্বকের যা কিছু কাজ—স্পর্শ, উত্তাপ, শৈত্য, ব্যথা ইত্যাদি অনুভব করা যায় এই কেন্দ্রের সাহায্যে।

সমস্ত জ্ঞানবহা স্নায়ুগুলি এই গুরু মস্তিষ্কের মধ্যে শেষ হয়েছে আর কর্মবহা স্নায়ুগুলি এখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে। গুরু মস্তিষ্ক মানুষের বুদ্ধি, চৈতন্য, আবেগ, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। গুরু মস্তিষ্কের নিচের দিকে যেখানে রগ আছে (temporal lobe) সেখানে শ্রবণ, ঘ্রাণ ও স্বাদকেন্দ্র আছে। গুরু মস্তিষ্কের পেছন দিকটা (occipital lobe) চোখের অক্ষিপট থেকে স্নায়ু গিয়ে এখানে পৌঁছেছে। গুরু মস্তিষ্কের মাঝখানে যেখানে parietal lobe আছে সেখানে স্পর্শকেন্দ্র আছে। একটা কথা আমাদের এখানে জানা দরকার, আমাদের দেহের ডানদিকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি গুরু মস্তিষ্কের বাঁ দিকের কেন্দ্রগুলির অধীনে আর বাঁ দিকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ডান দিকের কেন্দ্রের অধীন। বাক্‌শক্তির কেন্দ্রটি বাঁ দিকেই অবস্থিত।

মস্তিষ্কের সর্বাপেক্ষা জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হোল গুরু মস্তিষ্ক। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, যে প্রাণী যত উন্নত সে প্রাণীর গুরুমস্তিষ্কের ধূসর অংশের উপর ভাঁজ তত বেশী। এই ধূসর অংশকে বলা হয় কর্টেক্স (cortex)।

মস্তিষ্কের কাজ নিয়ে গাল (Gall), ফ্রিট্স ফ্রানৎস্ (Franz), লাশলে (Lashley) প্রভৃতি বিজ্ঞানী বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। ল্যাশলের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা জানতে পারি—(১) গুরু মস্তিষ্কের যে বিভাগ আছে তা এক একটি কাজে নিযুক্ত, (২) বিভিন্ন অংশ সম্পূর্ণ পৃথক নয়—এদের পিছনে একটি ঐক্য আছে; (৩) একটি অংশের ক্ষতি হলে অন্য অংশ এটির বিকল্প হিসাবে কাজ করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে গুরু মস্তিষ্কের মধ্যেই কেবলমাত্র ঐক্য ও সংহতি নেই, সমগ্র মস্তিষ্কের মধ্যেই এই সংহতি বিদ্যমান।

(খ) **মধ্য মস্তিষ্ক** (Cerebellum)—গুরু মস্তিষ্কের নীচে ঘাড়ের ঠিক উপরে মধ্য মস্তিষ্ক থাকে। দেখতে অনেকটা কমলালেবুর মত; এটাও দুভাগে

বিভক্ত ; এর ওপরেও ধূসর ও সাদা রঙের স্নায়ু চাপ আছে। মধ্য মস্তিষ্ক শরীরের পেশীগুলির কাজের সমতা বজায় রাখে, শরীরের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখে, চলাফেরা করা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। এই কেন্দ্র অসুস্থ হলে মাথা, হাত, পা কাঁপতে থাকে।

(গ) **নিম্ন মস্তিষ্ক** (Medulla Oblongata)—মধ্য মস্তিষ্কের ঠিক নীচে নিম্নমস্তিষ্ক অবস্থিত। এটি প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা পৌনে এক ইঞ্চি মোটা। নীচের দিকে এটি ক্রমশঃ মেরু মজ্জায় মিশে গেছে। এই মস্তিষ্ক আমাদের হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, রক্তাবহা নাড়ীর পেশী, খাদ্য গ্রহণ করার পেশী প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। মস্তিষ্কের এই অংশটি নষ্ট হলে মানুষের বোধশক্তি লোপ পায়—ফলে ব্যথা-বেদনা অনুভব করার ক্ষমতা থাকে না। নিম্ন মস্তিষ্ক খাদ্য পরিপাক করতে ও ঘাম সৃষ্টি করতেও সাহায্য করে।

(ঘ) **সেতু মস্তিষ্ক** (Pons Verolii)—মেরুদণ্ডটা যে জায়গায় মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করেছে, সেই জায়গাটিতে শরীরের বাঁ দিকের স্নায়ুগুচ্ছগুলি ডানদিকে ও ডানদিকের স্নায়ুগুচ্ছগুলি বাঁদিকে মোড় ফিরে পরস্পর কাটাকাটি করে মস্তিষ্কের দুদিকে বিস্তৃত হয়েছে, সেই জায়গাটিকে সেতু মস্তিষ্ক বলা হয়। আমাদের স্নায়ুগুলি মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে এসে এখানে থেকে পরস্পর বিপরীত দিকে চলে যায়।

সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal cord)

মস্তিষ্ক থেকে যে স্নায়ুগুচ্ছ মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে তাকে সুষুম্নাকাণ্ড বলে। মেরুদণ্ডের অস্থিগুলি এমনভাবে সজ্জিত যে, একটির
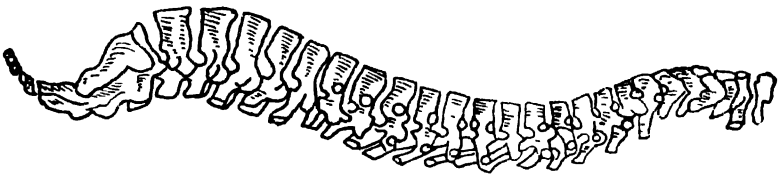
মেরুদণ্ড

গহ্বর-মুখ অপরটির গহ্বর-মুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। প্রতিটি স্নায়ু মেরুদণ্ডে প্রবেশের সময় দুইভাগে ভাগ হয়ে গেছে। পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করেছে অন্তর্মুখী বা উদ্দীপন বহনকারী স্নায়ু (sensory nerve) আর সামনের দিক দিয়ে প্রবেশ করেছে ক্রিয়াবাহী স্নায়ু (motor nerve)।

ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হলে সেই উদ্দীপনা অন্তর্মুখী স্নায়ুপথে সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ুমূলে এসে হাজির হয় এবং সেখানকার কোষগুলি বহির্মুখী স্নায়ুপথে শক্তি সঞ্চালিত করে, তারই ফলে প্রতিক্রিয়া সম্ভব হয়। এই পথটি আকারে বৃত্তাংশের মত বলে একে প্রতিবর্তক বৃত্তাংশ (reflex arc) বলা হয়। যেমন, যখন আমরা কোন গরম জিনিষ ধরলাম, তখনই হাতটা সরিয়ে নিলাম। এই কাজটি প্রতিবর্তক বৃত্তাংশের দ্বারা সম্ভব হল।

উপান্ত স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral Nervous System)

যে স্নায়ুতন্ত্রগুলি আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে কোন-অংশের যোগসূত্র রক্ষা করছে তাদের বলা হয় উপান্ত স্নায়ু। কাজ অনুসারে এই স্নায়ুগুলিকে দুভাগে ভাগ করা হয়—মস্তিষ্ক স্নায়ু ও সুষুম্না স্নায়ু। যে স্নায়ুগুলি মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে মাথার খুলির মধ্যে দিয়ে সোজা আমাদের চোখ, কান, নাক, জিহ্বার মধ্যে চলে যায় তাদের মস্তিষ্ক স্নায়ু বলা হয়। আর কতকগুলি স্নায়ু সুষুম্নাকাণ্ড থেকে বেরিয়ে—হাত, পা, চামড়া প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়, তাদের সুষুম্না স্নায়ু বলা হয়ে থাকে। সুষুম্নাকাণ্ড থেকে একত্রিশ জোড়া এই ধরণের স্নায়ু বেরিয়েছে।

স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic Nervous System)।

আমাদের সুষুম্নাকাণ্ডের দুপাশে কতকগুলি স্নায়ুগ্রন্থি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে পরস্পর যুক্ত থেকে একটা আলাদা স্নায়ুতন্ত্র গড়ে তুলেছে যাকে আমরা স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র বলি। এই স্নায়ুগুলি সবসময় মস্তিষ্কের আদেশ মেনে চলে না। শরীরের প্রয়োজন অনুসারে এরা স্বাধীনভাবে কাজ করে; এদের কাজ কখন কিভাবে ঘটছে তা বেশীর ভাগ সময় আমরা টের পাই না। যেমন, পাকস্থলী, অন্ত্র, হৃদযন্ত্রের স্নায়ুগুলির কাজ সম্বন্ধে আমরা সব সময় সচেতন থাকি না।

স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে দুটি ভাগ আছে—সমবেদী (sympathetic) পরাসমবেদী ও (parasympathetic)। সমবেদী স্নায়ু-গ্রন্থি মেরুদণ্ডের কাছাকাছি থাকে কিন্তু পরাসমবেদী স্নায়ু-গ্রন্থি ঐ বিভাগ দ্বারা যেসব পেশী উত্তেজিত হয় তাদের কাছাকাছি থাকে। সমবেদী স্নায়ু উত্তেজনা সৃষ্টি করে, পরাসমবেদী স্নায়ু তা নিরোধ করে। রাগ, ভয় ইত্যাদির সময় সমবেদী স্নায়ু কাজ করে; আনন্দ, তৃপ্তি, ইত্যাদির সময় পরাসমবেদী স্নায়ু কাজ করে।

স্নায়ুতন্ত্রের উপাদান (Elements of the Nervous System)—স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হয়েছে ; এখন আমরা দেখব স্নায়ুতন্ত্র কি দিয়ে গঠিত। মানব শরীরের প্রত্যেকটি স্নায়ু ছোট ছোট স্নায়ুকোষ দিয়ে তৈরী। প্রত্যেক স্নায়ুকোষের দুটো অংশ থাকে—(ক) কোষের মূল অংশ বা nucleus আর (খ) কোষের বাইরের কাঠামো বা cell-wall। স্নায়ুকোষের এই দেওয়াল থেকে চারিদিকে কতকগুলো সাদা রঙের তন্তু বেরিয়ে থাকে। এই তন্তুগুলো আবার দু রকমের—(১) অ্যাকসন (Axon), (২) ডেনড্রাইট্স (Dendrites)। ঐ সাদা তন্তুগুলোর মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় তাকে অ্যাকসন বলা হয় ; এটা লম্বা প্রায় পাঁচ ফুট পর্যন্ত হয়। আর অ্যাকসনের চেয়ে ছোট তন্তুগুলোকে ডেনড্রাইটস বলা হয়।

সাধারণ ভাবে দেখা যায় প্রত্যেক স্নায়ুকোষে একটা অ্যাকসন ও কতকগুলো ডেনড্রাইটস থাকে, তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। অ্যাকসন ও ডেনড্রাইট্সের প্রান্তগুলো খুব সরু হয়ে একটার সঙ্গে আরেকটা যুক্ত হয়। একটা অ্যাকসনের শেষভাগ যখন একটা ডেনড্রাইটসের শেষপ্রান্ত ছোঁয় তখন তাকে স্নায়ুসন্ধি (synapse) বলে।

স্নায়ুতন্ত্রের কাজ (Functions of the Nervous System)—প্রথমে দেখা যাক স্নায়ুকোষের কাজ কি রকম। স্নায়ুকোষের কাজ হল দুরকমের—উত্তেজিত হওয়া ও তা পরিবহণ করা। কোন শক্তি যখন স্নায়ুকোষের ওপর ক্রিয়া করে, তখন তা চেতনা জাগায়। সামান্যতম উত্তেজকের সংস্পর্শে এলেই স্নায়ুকোষ উত্তেজিত হয়। কোন শক্তি দ্বারা স্নায়ুকোষ উত্তেজিত হলে সে উত্তেজনা অ্যাকসনের মধ্যে দিয়ে অপরপ্রান্তে যায় ও সেই প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত ডেনড্রাইট্সের মধ্যে দিয়ে অন্য স্নায়ুকোষকে উত্তেজিত করে। স্নায়ুকোষের এই কাজকেই পরিবহন ক্ষমতা বলা হয়।

এ ছাড়া স্নায়ুকোষের আরও কাজ আছে। যেমন, কতকগুলি স্নায়ু উত্তেজনাকে ইন্দ্রিয় থেকে সুষুম্নাকাণ্ড বা মস্তিষ্কে নিয়ে যায়, এদের বলা হয় অন্তর্মুখী স্নায়ুকোষ (afferent neurone)। আর একরকম স্নায়ুকোষ আছে যাদের কাজ হল স্নায়বিক শক্তিকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে ইন্দ্রিয়ে বয়ে আনা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে সক্রিয় করা, এদের বলা হয় বহির্মুখী স্নায়ুকোষ (efferent neurone)। এছাড়া আরও একধরণের স্নায়ুকোষ আছে যারা অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী স্নায়ুকোষের মধ্যে সংযোগস্থাপন করে।

স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের কাজ আমরা আগেই কিছু আলোচনা করেছি। এখন দেখব আমরা কেমন করে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছি। জোরে শব্দ শুনলেই বা খুব উজ্জ্বল আলো দেখলেই আমরা চোখ বন্ধ করে ফেলি; আবার অনেক কাজই আমরা বহু চিন্তাভাবনা করে করি। সমস্ত রকম কাজই আমরা স্নায়ুতন্ত্রের সাহায্যে করে থাকি। আমাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রাগ, ভয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে এবং হৃৎপিণ্ডে, অন্ত্রে ও গ্রন্থিতে যেসব পরিবর্তন ঘটছে তাও স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারাই সম্ভব হচ্ছে। স্বয়ংক্রিয় কেন্দ্রগুলি জৈব জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। স্বয়ংক্রিয় কেন্দ্রগুলি না থাকলে মস্তিষ্ককে আরো অনেক অনেক গুণ ব্যস্ত থাকতে হোত ও কাজের চাপে শিগ্‌গির বিকল হয়ে যেত। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দেহযন্ত্রটি একটি আশ্চর্য ও সমবায়ী কাজের যন্ত্র; এর কোটি কোটি কোষের মধ্যে যে শৃঙ্খলা, সহযোগিতা ও কর্মক্ষমতা আছে তা পৃথিবীর আর কোনও যন্ত্রের আছে বলে মনে হয় না।

গ্রন্থিতন্ত্র (Glandular System)।

স্নায়ুতন্ত্রের মত আমাদের দেহে আর একধরনের দেহযন্ত্র আছে যাদের কাজ আমরা বাইরে থেকে বুঝতে পারি না কিন্তু অনুভব করতে পারি। এগুলিকে বলা হয় গ্রন্থি বা Gland। গ্রন্থিগুলি দেহের বিভিন্ন স্থানে থাকে এবং দেহের গঠন, বুদ্ধির বিকাশ, দেহের সুস্থতা, কার্যক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই গ্রন্থিগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়—সনালী গ্রন্থি (Duct gland) ও অনালী গ্রন্থি (Ductless gland)।

সনালী গ্রন্থি—এই গ্রন্থিগুলির ক্ষরণ রক্তস্রোতের মধ্যে হয় না, দেহের বাইরে ও দেহের ভিতরে এদের ক্ষরণ হয়। যেমন লালা গ্রন্থি (Salivary gland), মূত্র গ্রন্থি (Kidney), ঘর্ম গ্রন্থি (Sweat gland), অশ্রু গ্রন্থি (Tear gland), পাচক গ্রন্থি (Gastric gland), দুগ্ধক্ষরা গ্রন্থি (Mammary gland) ইত্যাদি।

এছাড়া আর একরকম গ্রন্থি আছে যাদের সঙ্গে কোন নালিকা নেই। এই সব গ্রন্থি থেকে এক রকমের রাসায়নিক রস নিঃসৃত হয়ে সোজা রক্তস্রোতের সঙ্গে মেশে এবং দেহের সর্বত্র খুব শীঘ্র ছড়িয়ে পড়ে। এই নিঃসৃত রসকে বলা হয় হর্মোন (Hormone) আর এই গ্রন্থিগুলিকে বলা হয় অনালী গ্রন্থি (Ductless Gland) বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Endrocrine Gland)। মানসিক

প্রক্রিয়ার ওপর এদের প্রভাব খুব বেশী। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থি হল থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, অ্যাড্রিনাল, পিটুইটারী, পিনিয়াল, গোনাড গ্রন্থি ইত্যাদি।

থাইরয়েড—গলায় শ্বাসনালীর দু পাশে ঠিক ডানামেলা প্রজাপতির মত এই থাইরয়েড গ্রন্থি অবস্থিত। এই গ্রন্থি থেকে যে রস বা হর্মোন বেরোয় তাকে বলে থাইরক্সিন। থাইরক্সিন যদি কম বেরোয় তবে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়, এর ফলে একরকম রোগ দেখা দেয় যার নাম ক্রেটিনিজম। এই রোগে আক্রান্ত শিশু ক্ষীণদেহী, খর্বাকৃতি, স্ফীতোদর ও ক্ষীণবুদ্ধি হয়। পরিণত বয়সে যদি হর্মোন কম বেরোয় তবে রক্তের চাপ কমে যায় চামড়া শুকিয়ে যায়, চুল উঠে যায়, হজমের ব্যাঘ্যাত হয়, হাত পা ফোলে, লাবণ্য কমে যায়, কর্মোত্তম কমে যায়। আবার এই গ্রন্থির ক্ষরণ বেশী হলে অস্থির ও চঞ্চল হয়, রক্তের চাপ বাড়ে, ক্ষুধা বাড়ে, ওজন কমে যায়, অনিদ্রা প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়।

প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি—থাইরয়েড গ্রন্থির চারকোণে ছোট ছোট চারটে গ্রন্থি আছে এদের প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি বলা হয়। এদের মধ্যে থেকে যে চুণ জাতীয় জিনিষ বেরোয় তা হাড ও দাঁতের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

থাইমাস গ্রন্থি—থাইরয়েড গ্রন্থির ঠিক নীচে আর একটা গ্রন্থি আছে যার নাম থাইমাস গ্রন্থি। কৈশোর পর্যন্ত এই গ্রন্থি খুব সক্রিয় থাকে, আয়তনেও বড় থাকে। পরে এটা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে থাকে। প্রাপ্ত বয়সে যৌন আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই এটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি—এই গ্রন্থি সংখ্যায় দুটি। মূত্রাশয়ের উপরে দুই দিকে দুটি গ্রন্থি থাকে। প্রতিটি গ্রন্থির দুটি করে অংশ থাকে—বাইরের অংশের নাম কর্টেক্স ও ভিতরের অংশের নাম মেডালা। দুটি অংশ থেকেই পৃথক রস বার হয়। বাইরের অংশ থেকে যে রস বেরোয় তার নাম কর্টিন এবং ভিতরের অংশের রসের নাম অ্যাড্রিনালিন। কর্টিন দেহের পক্ষে বিশেষ উপকারী, এর অভাবে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এই রসের ক্ষরণ বেশী হলে পুরুষের নারীসুলভ আচরণ ও নারীর পুরুষালী আচরণ দেখা যায়। অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণ বেশী হলে রক্তের চাপ বাড়ে, হৃদস্পন্দন বাড়ে, হজমের ব্যাঘাত ঘটে। আবেগের সাথে এই গ্রন্থিরসের সম্পর্ক আছে। এই গ্রন্থি বিপদের সম্মুখীন হতে দেহযন্ত্রকে প্রস্তুত করে।

পিটুইটারী গ্রন্থি—মাথার মাঝখানে মস্তিষ্কের ঠিক নীচে এই গ্রন্থির অবস্থান। এই গ্রন্থির ক্ষরিত রসের নাম পিটুইট্রিন। গ্রন্থিটির দুটি অংশ আছে—সম্মুখ অংশ ও পশ্চাৎ অংশ। সম্মুখ অংশের রস দেহের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করে। অতিরিক্ত রসক্ষরণ হ'লে মানুষ দৈত্যের মত লম্বা হয়, আবার কম রসক্ষরণ হলে মানুষ বামন হয়।

পিনিয়াল গ্রন্থি—মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগে এই গ্রন্থি অবস্থিত। এই গ্রন্থি-রসের সঙ্গে যৌনজীবনের সম্পর্ক আছে।

গোনাড গ্রান্থি—এটিও মানুষের যৌন জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত।

প্যানক্রিয়াস গ্রন্থি—এই গ্রন্থি থেকে যে রস বেরোয় তার নাম ইনসুলিন। রক্তের শর্করা যাতে দেহযন্ত্র ব্যবহার করতে পারে এই গ্রন্থিরস তাতে সাহায্য করে।

যদিও গ্রন্থিগুলি বিভিন্ন ধরণের কাজ করে তবুও এদের মধ্যে কিন্তু সহযোগিতার ভাব আছে। এইসব গ্রন্থি ব্যক্তির সুষম বিকাশে প্রভূত ভাবে সহায়তা করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান

মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ।

আমরা জানি মানুষের অধিকাংশ জ্ঞান তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই আসে। কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। মানব অভিজ্ঞতাকে—অভিজ্ঞতা গ্রহণরত কোন মানব-মনই ছাড়াই যখন স্বতন্ত্রভাবে বিচার করার চেষ্টা করা হয় তখন তার যাবতীয় সমস্যার সমাধান মেলে প্রকৃতি বিজ্ঞানের (physical science) মধ্যে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা কে গ্রহণ করবে—এই প্রশ্ন ওঠা খুব স্বাভাবিক। মানব-মনের অস্তিত্ব স্বীকার করে না নিলে অধিকাংশ অভিজ্ঞতাই অর্থহীন মনে হবে। এই অভিজ্ঞতাকে যখনই মনে করা হয় অভিজ্ঞতা গ্রহণরত কোন মনের উপর এটি নির্ভরশীল আর্থাৎ প্রত্যেক অভিজ্ঞতার পিছনে একটি মানব-মনের অস্তিত্ব আছে এবং মনকে বাদ দিয়ে অভিজ্ঞতাকে জানতে যাওয়া অর্থহীন তখনই আমাদের মনোবিজ্ঞানের দ্বারস্থ হতে হয়। কারণ মনোবিজ্ঞান ছাড়া অন্য কোন শাস্ত্র 'মন'-এর মত জটিল ও দুর্জ্ঞেয় বিষয় নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করে নি। 'মন'-এর খবর জানতে হলে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আমাদের মেনে নিতেই হয়।

এখন প্রশ্ন হোল মনোবিজ্ঞান বলতে আমরা কি বুঝি? মনোবিজ্ঞান কথাটি বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে—এটি মন সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। ইংরেজীতেও 'Psyche' মানে হোল আত্মা, logos মানে হোল শাস্ত্র—কাজেই Psychology হোল আত্মা সম্বন্ধীয় শাস্ত্র।

'মন' সম্বন্ধে শাস্ত্রটিকে বিজ্ঞান এই নামটি অর্জন করতে অনেক ক্রমবিবর্তনের স্তর পার হতে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই শাস্ত্রটির জন্ম হয়েছিল দর্শনশাস্ত্রের জঠরে। দর্শনশাস্ত্রের প্রধান কাজই হোল দৃশ্যমান জগতের বাইরের মূলতত্ত্বটি নির্ণয় করা; দার্শনিকদের মতে মানুষের মৌলিক সত্তা হোল আত্মা। আত্মা একটি অতীন্দ্রিয় বস্তু; বহিঃপ্রত্যক্ষণের সাহায্যে আমরা প্রতিটি বস্তুকে যে ভাবে জানতে পারি আত্মাকে আমরা সে ভাবে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানতে পারি না। ফলে আত্মাকে রূপকের সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা করা হোত। যেমন, আত্মাকে বলা হোত অগ্নিশিখার মত। কিন্তু এই অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। পরবর্তীকালে এই শাস্ত্রটি 'মন'-কে প্রধান

জ্ঞাতব্য বিষয় বলে ধরে নিল। মনকে তবু খানিকটা জানা যায়। মনকে আমরা জানি কি ভাবে? মনের নানাপ্রকার কাজের মাধ্যমে। মনের প্রধান তিনটি কাজ হোল চিন্তন (thinking), অনুভূতি (feeling) ও ইচ্ছা (willing)। অনেক মনে করেন এই তিনটি কাজ ছাড়াও মনের একটা আলাদা অস্তিত্ব আছে। মনের আসল স্বরূপ জানতে হলে আবার দর্শনশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে হবে। সে প্রশ্ন এখন এখানে আসছে না।

কোন কোন মনোবিদ আবার মনের পরিবর্তে 'চেতনা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। চেতনাকে কেমন করে জানা যাবে? অন্তর্নিরীক্ষণের সাহায্যে চেতনাকে জানার চেষ্টা করা যায়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি পরীক্ষণ (experiment), নিরীক্ষণের (observation) বাইরে। তাই সঠিক সিদ্ধান্তে আসা খুবই অসুবিধাজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

একদল মনোবিজ্ঞানী এবার মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিলেন—'আচরণের বিজ্ঞান' হিসাবে। আমেরিকায় J. B. Watson এই আচরণবাদের প্রবর্তক। আচরণবাদীদের মতে মানুষ হোল একটি সজীব যন্ত্র—মন বলে কোন কিছুর আলাদা অস্তিত্ব নেই। কিন্তু মানুষ কি কেবল একটি দেহবিশিষ্ট যন্ত্র? মানুষ যখন কোন উদ্দেশ্যমূলক কাজ করে তখন তার যথাযথ ব্যাখ্যা আচরণবাদীরা দিতে পারেন না। তবুও এই শাস্ত্রটিকে বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করতে হলে আচরণকে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা চলে—এই হিসাবে এটি তাৎপর্যপূর্ণ।

অতএব দেখা যাচ্ছে, ক্রমবিবর্তনের পথ বেয়ে মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে বদলেছে। Woodworth মজা করে বলেছেন—'First Psychology lost its soul, and then lost its mind, then lost its consciousness. It still has behaviour of a kind…'। ম্যাকডুগালের মতে সম্পূর্ণ মানুষটাই হল মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। প্রকৃতপক্ষে মনোবিজ্ঞানকে একটি বাস্তবধর্মী আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বলা চলে। প্রাণীর আচরণের ভিত্তিতে মানসিক প্রক্রিয়াগুলির বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিন্যাস, কারণ ও পরিমাণ নির্ণয় ইত্যাদি কাজগুলি সঠিকভাবে করাই মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

মনোবিজ্ঞার দৃষ্টিভঙ্গী

আমরা দেখেছি প্রত্যেক বিজ্ঞান মানুষের অভিজ্ঞতার কোন না কোন দিক

নিয়ে আলোচনা করে ; বিভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্যে কেবলমাত্র দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছাড়া অন্য কোন পার্থক্য নেই।

এখন প্রশ্ন হোল মনোবিজ্ঞানের সাথে অন্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য কোথায়? অন্যান্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হোল বস্তুনিষ্ঠ (objective), আর মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হোল ব্যক্তিনিষ্ঠ (subjective)।

বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী বলতে আমরা কি বুঝি? বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আমরা যে জ্ঞান পাব তা হবে একান্ত বিজ্ঞানসম্মত ; বস্তুর উপর নির্ভরশীল, অসার কল্পনা থাকবে না, অতিপ্রাকৃত (supernatural) দিয়ে ব্যাখ্যার চেষ্টা থাকবে না, সত্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ মনোভাব থাকবে আর থাকবে সাধারণ নিয়ম (general law) আবিষ্কারের প্রচেষ্টা।

এইসব দিক থেকে বিচার করে মনোবিদ্যাকে জ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে একে হতে হবে সত্যাশ্রয়ী ; অসার কল্পনা-বর্জিত, বস্তুনিষ্ঠ ও সুপরিকল্পিত। মানসিক ঘটনাপ্রবাহকে পর্যবেক্ষণ করে সাধারণ সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করতে হবে একে।

কিন্তু মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু মন— আর মনের প্রকাশ ঘটে দেহের মাধ্যমে। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মত মনকে সহজে জানা যায় না। নিজের মনকে খানিকটা প্রত্যক্ষভাবে তবু জানা যায়, অন্যের মনকে অনুমানের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করা হয়। তাই মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হোল ব্যক্তিনিষ্ঠ। এখানে নানারকম বিরোধেরও যথেষ্ট অবকাশ আছে।

তবুও মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য কি?

(ক) মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্তিকেন্দ্রিক। বিজ্ঞান হিসাবে দৃষ্টিভঙ্গী নিরপেক্ষ হলেও এর আলোচ্য বস্তু ব্যক্তিমনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তার মানে এই নয় যে, মনোবিজ্ঞান কেবলমাত্র একটি মন নিয়ে আলোচনা করে। একটি মন নিয়ে আলোচনা করলে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করতে পারত না।

(খ) এক একটি মানসিক ঘটনার সামগ্রিক রূপ আছে। এই সামগ্রিক রূপটি বুঝতে হলে বিশ্লেষণ (analysis) ও সংশ্লেষণ (synthesis) করা প্রয়োজন।

(গ) মনের প্রকাশ যেহেতু কতকগুলি মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে, সেইজন্য এই প্রক্রিয়াগুলির পর্যবেক্ষণ একান্ত প্রয়োজন।

(ঘ) মানসিক ঘটনার কারণ জানতে হলে এর পূর্বগামী অবস্থা জানলেই চলবে না, এর উদ্দেশ্য ও জানতে হবে।

(ঙ) মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞান হিসাবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে উপাত্ত (data) বা ঘটনাবলী সংগ্রহ করে। ঘটনা সংগ্রহকালে এর অর্থ, তাৎপর্য ও মূল্যও যাচাই করতে হয়।

(চ) মানসিক ঘটনাবলীর পরিমাণগত ও গুণগত দৃষ্টিভঙ্গীও ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়।

(ছ) মনের বৈশিষ্ট্য হোল চেতনা স্তর অতিক্রম করে মনের অনেকখানি প্রসারতা আছে। সমগ্র মনকে জানতে হলে মনের নির্জ্ঞান স্তরেও অনুসন্ধান চালাতে হয়।

(জ) ব্যক্তিবিশেষকে জানতে হলে তাকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে জানা যায় না। তাই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীও মনোবিজ্ঞানের আওতায় আসে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে বোঝা যায় মনোবিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞান থেকে বেশ খানিকটা আলাদা। মানব-মনের বৈশিষ্ট্যই মনোবিজ্ঞানকে এই বিশিষ্টতা দান করেছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

মনোবিত্তার বিষয়বস্তু (The Subject matter of Psychology)।

মনোবিদ্যা মনের কথা আলোচনা করবে এটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। মনের প্রকাশ বিভিন্ন ভাবে হয় এবং মনের এই বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গী মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। মানুষ তার আবেষ্টনীর সাথে নিয়ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় রত। আবেষ্টনী বলতে মানুষের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে বুঝি। বাইরের জগৎ থেকে মানুষ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সব সময় জ্ঞান আহরণ করছে; এই জ্ঞান তার মধ্যে অনুভূতি ও প্রেরণা জাগাচ্ছে; এর ফলে মানুষ কোন না কোন কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। এই কাজগুলি কিন্তু এলোমেলো কাজ নয়—বাইরের জগতের সাথে নিজেকে খাপখাওয়াবার জন্য সে এই কাজগুলি করে।

মনের কাজগুলিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়—চিন্তন (Thinking, Cognition), অনুভূতি (Feeling, Affection) এবং ইচ্ছা (Willing, Conation)। এর অর্থ এখানে অনেকটা ব্যাপক। চিন্তন বলতে সংবেদন (sensation), প্রত্যক্ষণ (Perception), প্রতিরূপ (image), স্মৃতি

(memory), কল্পনা (imagination), ধারণা (conception) এবং যুক্তি (reasoning) প্রভৃতি বুঝায়। অনুভূতিকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়—সরল (Simple) ও জটিল (Complex)। জটিল অনুভূতিকে প্রক্ষোভ বা আবেগ বলা যায়। ইচ্ছাকে আমরা দেখি কাজের মধ্যেই এর প্রতিফলন। এই কাজকে মোটামুটি দুভাগে বিভক্ত দেখি—ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক। সব রকমের কাজই মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

মনোবিজ্ঞান মানুষের ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করে। এখন প্রশ্ন হোল ব্যক্তিত্ব বলতে ঠিক কি বোঝায়? ব্যক্তিত্ব বলতে সমগ্র মানুষটিকেই বোঝায় —তার চিন্তা, বুদ্ধি, অনুভূতি, কর্মদক্ষতা, ভাব, ধারণা ইত্যাদি সব কিছুই ব্যক্তিত্বের মধ্যে পড়ে।

আবার সব মানুষের ব্যক্তিত্ব সমান হয় না—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে খানিকটা মিল থাকলেও অনেক পার্থক্য চোখে পড়ে। এগুলিকে বলা হয় ব্যক্তিগত বৈষম্য (Individual difference)। মনোবিজ্ঞান ব্যক্তিগত বৈষম্যের স্বরূপ নির্ণয় করার চেষ্টা করে—এর পরীক্ষা ও পরিমাপের কাজও মনোবিজ্ঞানের আওতায় আসে।

এখন মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, বুদ্ধি কাকে বলে। কি কি নিয়মে এর বিকাশ ঘটে, বুদ্ধি-সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব, বুদ্ধি কিভাবে পরিমাপ করা যায়, বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সুবিধা-অসুবিধা নির্ণয়, বুদ্ধির স্তরভেদ, এর উন্নতি সম্ভব কি না, বুদ্ধির সঙ্গে আচরণ ও বৃত্তির সম্পর্ক প্রভৃতি মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে।

মনোবিজ্ঞান সাধারণত কি কি পদ্ধতি নিয়োগ ক'রে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করে সেটাও আমাদের জানা দরকার। মনোবিজ্ঞান যেহেতু বিজ্ঞান সেইজন্য অন্য সমস্ত বিজ্ঞানের মত পর্যবেক্ষণের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। খুব সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে না শিখলে মন সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। পর্যবেক্ষণ বলতে আমরা কি বুঝি?—কোন ঘটনা যেমন যেমন ঘটছে তেমনি ভাবে নজর রাখা। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করার দুরকম সুযোগ আছে—এই পর্যবেক্ষণ অন্তর্মুখী (introspection) হতে পারে, যেমন নিজের মানসিক প্রক্রিয়াগুলি জানতে চেষ্টা করা; আবার বহির্মুখীও হতে পারে—কোন ঘটনা বাইরে যেমন ঘটছে তা জানা ও নজর রাখা। অন্তর্মুখী পর্যবেক্ষণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক—একটিমাত্র মনের খবর জানতে সাহায্য করে।

বহিঃপর্যবেক্ষণ অবশ্য দুভাবে করা যায়। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পর্যবেক্ষণ ও অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পর্যবেক্ষণ। কোন ঘটনা পর্যবেক্ষণ করার জন্য যদি পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তবে সেটা পরীক্ষণ পদ্ধতি (experiment) হয়ে যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে মনোবিজ্ঞানও অন্যান্য বিজ্ঞানের সমস্ত পদ্ধতি নিয়োগ করে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করে কি না এটাও মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে।

আমাদের দেহের সঙ্গে মনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মনোবিজ্ঞান প্রথমেই এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে বলে, দেহ ভাল থকেলে মন ভাল থাকবে আবার মন ভাল থাকলে দেহও ভাল থাকতে বাধ্য।

দেহ ও মনের সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে কিসের সাহায্যে দেহ ও মনের সম্পর্ক নিবিড় তাও মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে। আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—স্নায়ুর দ্বারা কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত। কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের মধ্যে মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড ইত্যাদি পড়ে। এছাড়া ইন্দ্রিয়ের গঠন ও কাজ সম্বন্ধেও মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে।

এর পর প্রশ্ন ওঠে আমরা কেমন করে শিখি, শিখন কাকে বলে, শিখন সম্বন্ধে নানান তত্ত্ব কি কি ইত্যাদি। এগুলিও খুব স্বাভাবিকভাবে মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

মনোবিজ্ঞান 'মন' নিয়ে আলোচনা করে এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু মনের সমস্ত গলিগলির খবর সংগ্রহ করতে হলে মনকে বিভিন্ন স্তরে যাচাই করা প্রয়োজন। মনের বিভিন্ন স্তর হোল—চেতন (conscious) অবচেতন (sub-conscious) ও নির্জ্ঞান (unconscious)। মনের সমস্ত স্তরই মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

আবার আমরা দেখি মনের অভিব্যক্তি দুরকমের—স্বাভাবিক (normal) ও অস্বাভাবিক (abnormal)। এই দুই মনের প্রতিক্রিয়া সমাজের ওপর কিরূপ —মনোবিদ্যা তাও দেখার চেষ্টা করে। এ ছাড়া মানুষ বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে বড় হয়—এবং প্রত্যেক স্তরে মানব-মনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে। শিশু-মন, তরুণ-মন, প্রাপ্তবয়স্কদের মন, বৃদ্ধের মন ইত্যাদি সব স্তরের মন নিয়েই মনোবিদ্যা আলোচনা করে। এ ছাড়াও ব্যক্তি-মন (individual mind) সমষ্টিগত মন (collective mind), গোষ্ঠী-মন (group mind), জনতার মনস্তত্ত্ব (crowd psychology) প্রভৃতি নিয়েও মনোবিজ্ঞান আলোচনা করতে চেষ্টা করে।

মানুষের মন নিয়ে যখন মনোবিদ্যা আলোচনা করে তখন মনের অধিকারী যে মানুষ তার সমগ্র পরিবেশকে জানার চেষ্টা করে। কাজই মানুষের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশও মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিধি দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে। মনোবিদ্যা মনের বিশেষ খবর সংগ্রহ করার জন্য নানান শাখায় বিভক্ত হয়ে কাজ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মনের সঙ্গে যুক্ত সব কিছুই মনোবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মনোবিদ্যার বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি বোঝাতে গিয়ে ডক্টর ওয়ার্ড বলেছেন—'চেতনার বিষয়বস্তু হিসেবে স্বর্গের সুমিষ্ট সংগীত ও মর্তের যাবতীয় সজ্জা মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হতে পারে।' (In this sense the whole choir of heaven and furniture of earth may belong to psychology'—Dr. Ward)।

মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা (Branches of Psychology)।

আধুনিককালের অতি বিশেষীকরণের যুগে মনোবিজ্ঞানের মত বিশাল পরিধি যুক্ত বিষয়টি বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হতে বাধ্য। মনোবিজ্ঞান যে কয়টি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়েছে তাদের নাম হোল—(১) সাধারণ মনোবিজ্ঞান (General Psychology), (২) অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান (Abnormal Psychology), (৩) শিশু মনোবিজ্ঞান (Child Psychology), (৪) সামাজিক অথবা গোষ্ঠী মনোবিজ্ঞান (Social or Group Psychology), (৫) শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology), (৬) শিল্পমূলক মনোবিজ্ঞান (Industrial Psychology), (৭) তুলনামূলক মনোবিজ্ঞান (Comparative Psychology), (৮) শরীর-সম্বন্ধীয় মনোবিজ্ঞান (Physiological Psychology), (৯) প্রযুক্তি মনোবিজ্ঞান (Applied Psychology)। (১০) জীবের বংশগতি মূলক মনোবিজ্ঞান (Genetic Psychology) ইত্যাদি।

১। সাধারণ মনোবিজ্ঞান—স্বাভাবিক প্রাণী সাধারণভাবে যেভাবে আচার আচরণ করে থাকে তা জানা হলো সাধারণ মনোবিজ্ঞানের কাজ।

২। অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান—এই নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে কোন প্রাণী যখন অস্বাভাবিক আচরণ করে তখন তা পর্যবেক্ষণ করা ও তার সম্বন্ধে নানা ভাবে জ্ঞান পরিবেশন করা হোল এই মনোবিজ্ঞানের কাজ।

৩। শিশু মনোবিজ্ঞান—শিশু-মনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করে। শিশু-মনের আবেগ, অনুভূতি, বুদ্ধি, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই বয়স্কদের থেকে আলাদা। এগুলিকে সমাজ অনুমোদিত বাঞ্ছিত পথে নিয়ে যেতে হলে, শিশুকে পূর্ণ বিকশিত হতে সাহায্য করতে হলে কিভাবে কাজ করতে হবে তার ইঙ্গিত দেয় এই মনোবিজ্ঞান।

৪। সামাজিক বা গোষ্ঠী মনোবিজ্ঞান—এই মনোবিজ্ঞান প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করে না। প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের এক জন একথা ধরে নিয়ে তার আচরণের বিচার করে থাকে। রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, পরিচালক ইত্যাদিদের এই মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা একান্তভাবে আবশ্যক।

৫। শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান—এর লক্ষ্য হোল মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা; শিক্ষার ক্ষেত্রে নানান সমস্যার সমাধান করা, শিশু-শিক্ষার্থীর ব্যবহারে উন্নতিসাধন করা ইত্যাদি।

৬। শিল্পমূলক মনোবিজ্ঞান—শিল্পক্ষেত্রে যদি আমরা উৎপাদন বাড়াতে চাই তবে শিল্পকাজের কর্মীদের মনের খবর জানা একান্ত প্রয়োজন; আর এই প্রয়োজন মেটায় শিল্পমূলক মনোবিজ্ঞান।

(৭) তুলনামূলক মনোবিজ্ঞান—তুলনামূলক মনোবিজ্ঞানকে প্রাণী মনোবিজ্ঞানও বলা চলে। মনুষ্যেতর প্রাণী নিজের মনের ভাব ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না বলে আচরণে তা প্রকাশ করে। প্রাণীর আচরণ লক্ষ্য করতে হলে পরীক্ষা-পদ্ধতির (Experiment-এর) সাহায্য নিতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন পরীক্ষার কাজ মানুষের উপর সরাসরি চালান খুব অসুবিধাজনক হয়—কারণ এতে মানুষের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তখন বিভিন্ন প্রাণী নিয়ে এই পরীক্ষা সুরু হয়। তারপর তার থেকে লব্ধ জ্ঞান মানুষের উপর প্রয়োগ করা হয়।

(৮) শরীর-সম্বন্ধীয় মনোবিজ্ঞান—আমাদের আচরণের সঙ্গে শরীরের বিভিন্ন অংশ কি ভাবে জড়িত সে সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা দেয় এই মনোবিজ্ঞান।

(৯) প্রযুক্তি মনোবিজ্ঞান—সাধারণ মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানগুলিকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এই মনোবিজ্ঞান।

(১০) জীবের বংশগতিমূলক মনোবিজ্ঞান—প্রত্যেক জীব কি ভাবে জন্মায়, কি কি গুণ সে জন্মসূত্রে পায়, কি ভাবে তার বৃদ্ধি ও বিকাশ হয় ইত্যাদি জানতে সাহায্য করে এই মনোবিজ্ঞান।

শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ (Nature of Educational Psychology)।

শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান সাধারণ মনোবিজ্ঞান থেকে খুব একটা আলাদা নয় একথা আমরা আগেই জেনেছি। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সাধারণ মনোবিজ্ঞানেরই একটি অতি প্রয়োজনীয় শাখা।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। শিক্ষা বলতে ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে শুভ আচরণগুলির আয়ত্তীকরণ বোঝায়। আর মনোবিজ্ঞান হোল আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। শিক্ষার বিষয়বস্তু হচ্ছে কেমন করে নতুন পরিবেশে নতুন আচরণ করা যায় তা দেখা; এবং মনোবিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে সেই আচরণের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করা। মনোবিজ্ঞানী জাড্ শিক্ষা কথাটির ব্যাপক অর্থ নিয়ে বলেছেন, মানুষের আচরণ সর্বদাই পরিবর্তিত হচ্ছে; পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হচ্ছে বিকাশের নামান্তর। সুতরাং, শিক্ষামনোবিজ্ঞান হোল মনোবিজ্ঞানের সেই শাখা যা ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার বিকাশের ধারাকে অনুশীলন করে।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষামনোবিজ্ঞানের জন্ম হয়েছিল সাধারণ মনোবিজ্ঞানের শাখা হিসাবে; সাধারণ মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলিকে বাস্তবক্ষেত্রে ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখাতো শিক্ষামনোবিজ্ঞান—এটির কাজ ছিল অনেকটা কলাবিদ্যার মত (art)। এটি ছিল সাধারণ মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ ক্ষেত্র—শিক্ষামনোবিজ্ঞানের বইগুলিকে বলা হোত, সাধারণ মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলির বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ।

কিন্তু বর্তমানে শিক্ষামনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে বদলে গেছে; এটি সঙ্কীর্ণতা ছেড়ে অনেকখানি বিস্তৃত হয়েছে—এখন আর এটি কেবলমাত্র কলা নয়—এটি বিজ্ঞানও বটে। শিক্ষামনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানীদের মত যুক্তি দিয়ে সাধারণ মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলিকে দেখতে ও প্রশ্ন করতে আরম্ভ করেছে—শিক্ষা মনোবিজ্ঞান এখন প্রতিটি বিষয়কে পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও যাচাই করে তবে গ্রহণ করে।

নল, হয়ক্স ও অ্যাণ্ডারসান-এর মত আমেরিকান মনোবিজ্ঞানীরা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বিস্তৃতির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, শিক্ষামনোবিজ্ঞান মানুষের আচরণ কি ভাবে শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমাজ অনুমোদিত পথে চালিত

হয় ও পরিবর্তিত হয় তা দেখে; শুধু তাই নয়, কোন্ পদ্ধতিতে আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করলে আচরণগুলিকে ভালভাবে বুঝতে পারা যাবে তাও জানতে সাহায্য করে। শিক্ষামনোবিজ্ঞান বাস্তবিকই শুধু যে শিক্ষার্থীর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষান্ত থাকে তা নয়, সমস্ত শিক্ষার ক্ষেত্রটি সম্বন্ধে আলোকপাত করার চেষ্টা করে। শিক্ষার ক্ষেত্রের একদিকে আছে শিক্ষার্থী অপরদিকে আছেন শিক্ষক, যোগসূত্র রচনা করছে শিক্ষণীয় বিষয়। তাই অতি আধুনিক কালে শিক্ষামনোবিদ্যা কথাটির বদলে—'শিক্ষণ ও শিক্ষাদানের জন্য মনোবিদ্যা— (Psychology of Teaching & Learning) কথাটি ব্যবহারের অধিক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বস্তুতপক্ষে শিক্ষণ ও শিক্ষাদানকে সার্থক করে তোলার জন্য শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানকে গবেষণার উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হচ্ছে। এর স্বরূপ ও সম্প্রসারণ সবই নির্ভর করছে গবেষণার উপর। কেমন করে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায়; কোন্ পদ্ধতি কোন্ বিষয়ের ক্ষেত্রে অপরিহার্য; কোন্ পরিস্থিতিতে শিক্ষণ-প্রক্রিয়া সহজ, কি ভাবে অনেক বিষয় মনে রাখা যায়, ইত্যাদির প্রশ্নের সমাধানের জন্য শিক্ষামনোবিজ্ঞান আজও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষামনোবিজ্ঞানের পরিধি (Scope of Educational Psychology)।

শিক্ষামনোবিজ্ঞানের পরিধি বলতে বোঝায় এর আলোচ্য বিষয়বস্তু কি কি। শিক্ষা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সমস্ত রকম আচরণই হোল এর আলোচনার বিষয়বস্তু। কাজের সুবিধার জন্য পরিধিকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়—একটি আলোচনা করে মানুষের আদিম প্রকৃতি নিয়ে, অপরটি আলোচনা করে মানুষের শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে।

মানুষের আদিম প্রকৃতিও শিক্ষণের মধ্যে পড়ে—(১) মানবসত্তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ, (২) ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, (৩) বুদ্ধি ও অন্যান্য মানসিক শক্তি, শিক্ষণ প্রক্রিয়া, পরীক্ষা গ্রহণ ও পরিমাপ, আচরণের শরীর-তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা, ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে আমাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, শিশু মনোবিজ্ঞান, শিশুর প্রবৃত্তি ও তার সহগামী প্রক্ষোভ, কল্পনা, আবেগ, ইচ্ছা, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি শিক্ষামনোবিজ্ঞানের আওতায় আসে।

শিক্ষার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাই সামাজিক মনোবিজ্ঞান

যা এতদিন ছিল সবার কাছে অবহেলিত তা শিক্ষামনোবিজ্ঞানে স্থান পেয়েছে। শিক্ষাকাজ কোথায় চলবে, সামাজিক সমস্যাগুলি কি ভাবে শিক্ষার কাজে প্রভাব বিস্তার করে তা জানা একান্তভাবে আবশ্যক।

সুপরিচালনা—সুপরিচালনা শিক্ষার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। তাই এটিও আজ উপেক্ষণীয় নয়। শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে শিক্ষা-পরিচালনা সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার, আর এই ধারণা স্পষ্ট করতে সাহায্য করছে শিক্ষামনোবিজ্ঞান।

শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি (Methods of Educational Psychology)।

শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে এসেছে। শিক্ষামনোবিজ্ঞানকে এই উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করছে কে—এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এখানেই শিক্ষামনোবিজ্ঞানের পদ্ধতির আলোচনা প্রাসঙ্গিক হ'য়ে পড়ে।

মনোবিজ্ঞান একটি আলাদা বিজ্ঞান হিসাবে গড়ে উঠেছে বহু বছর আগে; সাধারণ বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু জড় পদার্থ কিন্তু মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হোল মানুষের মন। মানুষের মনকে বিচার করতে হলে তাকে ভিতর ও বাইরে থেকে দেখতে হবে। তাই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে মনোবিজ্ঞানের অনেকখানি সময় লেগেছে। ১৮১৯ সালে জার্মান মনোবিজ্ঞানী ভুণ্ড (Wundt) লিপজিগে প্রথম মনোবিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপন করে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ সুরু করেন।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতিকে প্রথমতঃ দুটো ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন—অন্তর্দর্শন ও বহির্দর্শন পদ্ধতি।

অন্তর্দর্শন পদ্ধতি (Introspection)—অন্তর্দর্শন হোল বাইরের জিনিষ পর্যবেক্ষণ না করে ভিতরের জিনিষ পর্যবেক্ষণ করা। যখন আমরা বলি খিদে পেয়েছে তখন আমরা কি করে বলি? অন্তর্দর্শনের সাহায্যে বলি। সেই রকম রাগ, দুঃখ, ভয়, আনন্দ হলে আমরা আমাদের মনে কি রকম অনুভূতি হয় তা অনুভব করে দেখতে পারি।

তবে এই পদ্ধতির অসুবিধাও প্রচুর। এটি ব্যক্তির নিজস্ব প্রভাব-দোষে দুষ্ট হতে পারে। অশিক্ষিত ব্যক্তি ও শিশুরা মনের খবর ঠিকমত দিতে

পারবে না। তাছাড়া যে মুহূর্তে অন্তর্দর্শন করা হয় তার পরে সেগুলির খবর সংগ্রহ করা হয়, এজন্য একে পুণর্ভাবন (Retrospection) বলা হয়। ঠিক অন্তর্দর্শন আর থাকে না। অন্তর্দর্শন করতে গিয়ে চেতনাগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা কঠিন। যেমন, রাগ হলে যদি কেউ অন্তর্দর্শন করে তবে রাগের চেতনাই লোপ পাবে।

বহির্দর্শন পদ্ধতির মধ্যে পড়ে পরীক্ষণ পদ্ধতি, জীবন ইতিহাস সংগ্রহ, ক্রমবিকাশ পদ্ধতি, চিকিৎসামূলক পদ্ধতি, পরিসংখ্যান পদ্ধতি ও অন্যান্য পদ্ধতি।

পরীক্ষণ পদ্ধতি (Experiment)—পরীক্ষণ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল। এই পদ্ধতিতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সর্ত সৃষ্টি করে একটা ঘটনাকে লক্ষ্য করা হয়—কোন্ সর্তটি ঘটনাটি ঘটার পক্ষে অপরিহার্য তা খুঁজে বার করা হয়।

জীবন ইতিহাস সংগ্রহ (Case Study)—কোন শিশু সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করতে হলে ও তার আচরণকে ভালভাবে জানতে হলে—আচরণটি কি ভাবে ঘটতে সুরু করল তা জানা দরকার। এজন্য জীবন ইতিহাস সংগ্রহ করলে শিশুর মনের গতি ও পরিণতি খানিকটা জানা যায়।

ক্রমবিকাশ পদ্ধতি (Genetic Method)—জন্মের পর থেকেই শিশুর জীবনে ধারাবাহিক ভাবে বিকাশের কাজ সুরু হয়। তার দেহ ও মন ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকে। জন্মের সময় শিশুর মধ্যে বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ ইত্যাদি সুপ্ত থাকে—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলির পরিবর্তন লক্ষ্য করার জন্য এই পদ্ধতি বিশেষ উপকারী।

চিকিৎসামূলক পদ্ধতি (Clinical Method)—মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির রোগের কারণ জানতে হলে রোগীকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে ও সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের কাছ থেকেও অনেক খবর জেনে নিয়ে তারপর তার মনের চিকিৎসা সুরু করতে হবে। ইয়ুং, অ্যাডলার ও ফ্রয়েড এই পদ্ধতির আবিষ্কার করে মনোবিজ্ঞানকে অনেকখানি বিজ্ঞানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য করেছেন।

রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মনের কথা জানার জন্য অবাধ অনুসঙ্গ পদ্ধতি (ফ্রয়েড) ও প্রতিফলন পদ্ধতিরও সাহায্য নেওয়া হয়।

পরিসংখ্যান পদ্ধতি (Statistical Method)—বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির

সঙ্গে সঙ্গে পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রয়োগ খুব বেশী হয়েছে। শিক্ষাশ্রয়ী পরিসংখ্যানের সাহায্যে সম্ভাব্যতার পরিমাণ ও গড় নির্ণয় সম্ভব হয়েছে।

অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক পদ্ধতি ও সাক্ষাৎকার পদ্ধতির ব্যবহার আজকাল খুব বেশী হচ্ছে। তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে উন্নততর প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও আচরণের সঙ্গে শিশুর ক্রমবিকাশ ও আচরণের তুলনা করে অনেক তথ্য জানা যায়। কোন মানুষের মনের খবর জানার উদ্দেশ্যে মুখোমুখী বসে কথাবার্তা বললে অনেক সময় অনেক অজানা জিনিস জানা যায়।

এইভাবে মানুষের মনকে জানার জন্য নানান পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। তবুও অনেক সময় অনেক জিনিস অজানা থেকে যায়। কারণ মানসিক প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য।

শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের উপযোগিতা—শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান এই নামটি থেকে বোঝা যাচ্ছে, মনোবিজ্ঞানের এই শাখাটি শিক্ষার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ট সম্পর্কে যুক্ত। আগে শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের যে বিশেষ অবদান আছে এটা স্বীকার করে নেওয়া হোত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রুশো যখন শিশুকে শিক্ষার কেন্দ্রে এনে তার অভিষেক অনুষ্ঠানের কথা বললেন তখন থেকেই শিশুকে জানার প্রয়োজন অনুভূত হোল। শিশুকে জানতে হলেই মনোবিজ্ঞানের সাহায্য অপরিহার্য। পরে পেষ্টালৎসী শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠা করে বললেন—'I have psychologised education'। এরপর ফ্রয়েবল, মণ্টেসারী প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্‌গণ মনোবিজ্ঞানকে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন শিশু, শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে শিক্ষামনোবিজ্ঞানের কতখানি উপযোগিতা রয়েছে।

বর্তমানকালে শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে শিশু--শিক্ষক শিশুর পাশে থেকে তাকে জ্ঞান আহরণ করতে সাহায্য করবেন। এজন্য শিক্ষকের বিষয় জ্ঞান নিশ্চয়ই প্রয়োজন, কিন্তু তার চেয়ে বড় প্রয়োজন শিশুকে একান্তভাবে জানা। শিশুদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ কি ভাবে ঘটে তা যদি শিক্ষকের জানা থাকে তবেই তিনি শিশুমনকে পাঠ্যবিষয়ে অনুরাগী ও আগ্রহী করে তুলতে পারবেন।

এই সমস্ত কারণে আজ শিক্ষামনোবিজ্ঞান প্রতিটি শিক্ষক শিক্ষণ পাঠ্যক্রমে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। শিক্ষামনোবিজ্ঞানের কাজকে আমরা

আর একটু ভাল করে বিশ্লেষণ করলেই দেখতে পাব এটি শিক্ষায় ক্ষেত্রে কেন এত অপরিহার্য।

প্রথমতঃ, শিক্ষামনোবিজ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রের মূল চারটি প্রশ্নের উত্তর দেয়; যেমন, (ক) কেন শিক্ষা দেওয়া হবে? (খ) কাকে শিক্ষা দেওয়া হবে? (গ) কোথায় শিক্ষা দেওয়া হবে? (ঘ) কেমন করে শিক্ষা দেওয়া হবে?

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষামনোবিজ্ঞান শিক্ষাকে নতুনভাবে নির্দিষ্ট করেছে। এখন শিক্ষা বলতে কেবলমাত্র জ্ঞানার্জনই বোঝায় না—একজন মানুষের সম্পূর্ণ বিকাশকে শিক্ষা বলা হয়; এই সম্পূর্ণ বিকাশ বলতে বোঝায় তার শারীরিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক, নৈতিক ও সামাজিক বিকাশ। শিক্ষার মধ্যে দিয়ে তার আত্মবিকাশ ঘটে।" শিক্ষা হোল—'Self development of a human being'।

তৃতীয়ত, শিক্ষামনোবিজ্ঞান শিক্ষার প্রায় সমস্ত দিকেই আলোকপাত করেছে, যেমন—

(ক) কম সময়ের মধ্যে শিক্ষাদান করে, শিক্ষাকে কি ভাবে ও কতখানি দীর্ঘস্থায়ী করা যায়;

(খ) শিক্ষার লক্ষ্যে কি ভাবে পৌছান যায়,

(গ) শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষার্থীর পার্থক্য;

(ঘ) কোন্ নতুন পদ্ধতিতে পাঠদান করলে শিক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ হয়,

(ঙ) কেমন করে শিক্ষার্থীর শিক্ষার মূল্যায়ন করা যায়;

(চ) মনোবিজ্ঞানসম্মত পরিমাপ পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা যায় কেমন করে;

(ছ) শিক্ষকের নিজের শিক্ষা দেওয়ার মত মানসিক সঙ্গতি আছে কিনা, ইত্যাদি।

এ ছাড়াও শিক্ষার প্রতিটি অলিগলির খবর আমরা পাই শিক্ষামনোবিজ্ঞানের প্রচেষ্টায়। আগে সমস্ত শিশুর বুদ্ধি ও ক্ষমতাকে এক রকম বলে ধরে নিয়ে শ্রেণী-পাঠনার ব্যবস্থা করা হোত। এখন বলা হয় প্রতিটি শিশুর বুদ্ধি, প্রবণতা ও ক্ষমতা আলাদা; তাই জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু, অতি-মেধাবী শিশু ও সাধারণ শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতি আলাদা হওয়া উচিত।

এরপর শিক্ষণের সূত্র ও নিয়মাবলী, ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ, বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ, প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ, স্মৃতি, বিস্মৃতি ও মনোযোগ, শিশুর দলীয়

মনোভাব, বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব, পরীক্ষা ও পরিমাপ পদ্ধতি, বৃত্তিমূলক নির্দেশনা, শাস্তি ও পুরস্কারের মূল্য, শিশুর সৃজন প্রতিভা, শিশুর বিভিন্ন বয়সের চাহিদা ইত্যাদির জ্ঞান শিক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। আর এই প্রয়োজন মেটাই আমরা শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ এখন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রক্ষোভ শিশু ও শিক্ষক উভয়কেই প্রভাবিত করে। আর প্রক্ষোভ সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করে শিক্ষামনোবিজ্ঞান। শিশু যখন জন্মায় তখন তার মূলধন থাকে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিগুলিই প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রতিটি কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। ম্যাকডুগাল সহজাত প্রবৃত্তি সম্বন্ধে বলেছেন—"···Instincts are prime mover of all human acitivities"······। এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলির স্বরূপ উদ্ঘাটন করে শিক্ষামনোবিজ্ঞান।

মানুষের মন অতি দুর্বোধ্য। মনের খুব সামান্য অংশের খবর আমরা রাখি, বাকি বেশীর ভাগ অংশ থাকে আমাদের অজানা। তাই আমাদের অনেক কাজের ব্যাখ্যা আমরা সহজে করতে পারি না। কিন্তু মনোবিজ্ঞান বলে মনকে চেতন, অবচেতন ও অচেতন এই তিনটি স্তরে ভাগ করে নিলে প্রতিটি কাজের ব্যাখ্যা মিলতে পারে।

সুপরিচালনার ব্যাপারেও শিক্ষামনোবিদ্যা শিক্ষককে নানাভাবে সাহায্য করে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বিদ্যালয়ে ও বিকাশের ধারায় তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। এই স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানই শিক্ষককে সুপরিচালনার কাজে এগিয়ে দেয়।

আধুনিক শিক্ষামনোবিদ্যার একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য। মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে পড়ে মানসিক অসুস্থতার কারণ, নিবারণের উপায় ইত্যাদি। এগুলি সম্পর্কে ধারণা থাকলে শিক্ষক সহজভাবে অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

এই সব আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে যে শিক্ষককে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হলে শিক্ষামনোবিজ্ঞানের জ্ঞান তার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। এই কথার অর্থ এই নয় যে শিক্ষামনোবিজ্ঞান শিক্ষকের সব রকম সমস্যার উত্তর তৈরী করে রাখবে। শিক্ষামনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হোল শিক্ষককে এমন জ্ঞান ও তথ্য সরবরাহ করা যার সাহায্যে শিক্ষক নিজেই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন ও নিজের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারবেন।

প্রশ্নাবলী

1. What is the modern outlook of Psychology? How can the knowledge of Psychology be profitably utilised in the field of Education? (1971 B. A. Hons.)

2. What is the subject matter of Psychology? Indicate the place of Psychology in Education. (1972 B. A. Hons.)

3. Discuss the nature and scope of Educational Psychology. Why is it included in every teacher education course? (1966 B. T.)

4. Consider how the study of Psychology can help a a teacher in his professional work. (1970 B. T.)

5. What is the subject matter of Phsychology? Consider the place of Psychology in Education. (1971 B. T.)

তৃতীয় অধ্যায়

জন্মগত চাহিদা (Innate Needs)

মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য হোল মানুষের জৈবিক ও মানসিক আচরণ অনুশীলন করা। মানুষের আচরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় সব সময় সে কিছু না কিছু করতে চায়; তার মধ্যে একটা কর্মপ্রেরণা (Inner urge) সব সময় থাকে। এই কর্মপ্রেরণা কোথা থেকে আসে? বিভিন্ন ব্যক্তি এই শক্তির বিভিন্ন নামকরণ করেছেন। দার্শনিক সোপেনহাওয়ার এই শক্তির নাম দিয়েছেন 'বেঁচে থাকার ইচ্ছা' (Will to live), বার্গস এর নাম দিয়েছেন 'বিশ্বের মৌল শক্তি' (Elan Vital); ফ্রয়েড বলেছেন এই শক্তির নাম 'আদিম' শক্তি (Libido) ইত্যাদি। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা নানান জনে নানান কথা বলে থাকেন। কেউ বলেন, এই শক্তির নাম চাহিদা (Need), কেউ বলেন চালকশক্তি (Drive), কেউ বলেন আকাজ্ক্ষা (Want), আবার কেউ বা বলেন প্রেষণা (Motive)। যিনি যাই নাম দিয়ে থাকুন, মানুষের প্রতিটি আচরণ

যে উদ্দেশ্যমুখী সে বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই আচরণ করতে বাধ্য করে কে? আধুনিক গবেষণা এর উত্তর দিয়েছে যে—এটি হোল মানুষের চাহিদা (Need)।

চাহিদা (Need) বলতে আমরা বুঝি কোন কিছুর অভাব। খিদে পেলে ভাবি খাদ্যের অভাব, বিপদে পড়লে বুঝি নিরাপত্তার অভাব। এই অভাববোধ থেকেই আমাদের মধ্যে চাহিদা জাগে। চাহিদার বস্তুটি পেলে কিন্তু আমাদের চাহিদা আর থাকে না।

চাহিদার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনোবিদ্‌রা বলেছেন, এর মধ্যে চারটি উপাদান থাকে—(১) ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা, (২) তার চাহিদা, (৩) চাহিদার উদ্দেশ্য আর (৪) বাধা। চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ যে আচরণ করে, তার আবার চারটি বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন, (১) তার আচরণ চাহিদার শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থাৎ চাহিদা তীব্র হলে আচরণও তীব্র হয়; (২) চাহিদা দীর্ঘস্থায়ী হলে বিরক্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি হয়; (৩) চাহিদার জন্যই ব্যক্তি উদ্দেশ্যমুখী আচরণ করে; (৪) লক্ষ্যে পৌঁছলে অস্বস্তিকর অবস্থার অবসান ঘটে।

মানুষের চাহিদাকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, প্রাথমিক চাহিদা—অর্থাৎ যেগুলো না হলেই চলে না, যেগুলো মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করে, আর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা—যেগুলো মানুষের সমাজজীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

পরে অবশ্য মনোবিজ্ঞানী ক্যারল, কুম্বস ও স্নিগ বলেছেন, চাহিদা হোল চার রকমের—

(১) দৈহিক নিরাপত্তার চাহিদা—প্রত্যেক প্রাণী নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পরিবেশের সঙ্গে সর্বদা সংগ্রাম করে চলেছে; এগুলোকে জৈবিক চাহিদাও বলা চলে; যেমন, অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের চাহিদা। এছাড়া আছে যৌন চাহিদা; যৌন চাহিদা কেবলমাত্র প্রাণীর আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করে তাই নয়: বংশরক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায়।

(২) প্রক্ষোভমূলক চাহিদা—প্রত্যেক মানুষ তার প্রতিবেশীর কাছ থেকে স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম, প্রীতি ইত্যাদি আশা করে। নিজেকে কোন না কোন দেশের অন্তর্ভুক্ত করে রাখতে চায়—তাতে সে নিরাপত্তা বোধ করে। এইসব না পেলে মানুষের মন যেন ঠিকপথে চলতে চায় না।

(৩) আয়ত্ত করার চাহিদা—মানুষ সব কিছুকে নিজের আয়ত্তে এনে জীবনে সফল হতে চায়। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকে মানুষ নিজের আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে কেন? এর পিছনে আছে আত্মনির্ভরতার চাহিদা, সফলতার চাহিদা, নতুনকে জানার চাহিদা আর প্রভুত্ব বিস্তারের চাহিদা। প্রত্যেকেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

(৪) আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা—আয়ত্ত করার পরই মানুষের কাছে আত্ম-প্রতিষ্ঠার চাহিদা বড় হয়ে দেখা দেয়। আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমে ক্ষমতার চাহিদা, সম্মানের চাহিদা, অনুমোদন ও সমর্থনের চাহিদা প্রয়োজন হয়।

শিক্ষা ও মানুষের চাহিদা—চাহিদা থেকে আচরণের জন্ম এ সম্বন্ধে আমরা জানলাম আর এই আচরণের পরিবর্তন করার চেষ্টা করে শিক্ষা। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে চাহিদা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। চাহিদা আচরণকে যে শক্তি জোগায় তা শিক্ষার ক্ষেত্রে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে শিক্ষার পথ খানিকটা সহজ হতে পারে।

সেইজন্য শিশুর স্বাভাবিক চাহিদাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা শিক্ষা সবসময় করছে। চাহিদা অনুসারে পাঠ্যক্রম, পদ্ধতি ও প্রয়োগ নির্ধারণে আজ প্রত্যেক শিক্ষাবিদ্'ক চেষ্টা করতে হবে।

শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলতে হলে শিশুর চাহিদার কথা জানতে হবে। চাহিদাগুলির অনুশীলন করা হলে তবেই উদ্দেশ্যে পৌছান সহজ হবে।

ব্যক্তিজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে চাহিদা সব সময় পরিবর্তিত হয়। শিক্ষার্থীদের কোন চাহিদা মিটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আবার নতুন চাহিদা অনুভূত হয়। সেক্ষেত্রে শিক্ষকের পাঠদান কৌশল হবে নতুন চাহিদা মেটাবার সবচেয়ে যোগ্য হাতিয়ার।

শিক্ষকের আর একটা কথা মনে রাখা দরকার যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল চাহিদা মেটান নয়, শিশুর মধ্যে নতুন নতুন চাহিদার সৃষ্টি করাও তাঁর দায়িত্ব। নতুন চাহিদা জন্মালেই তারা নতুন সমস্যা সমাধানে আগ্রহী হবে, আর সমস্যাগুলো বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে।

শিক্ষকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত শিশুর প্রক্ষোভমূলক চাহিদাগুলো মেটাবার দিকে লক্ষ্য রাখা। শিশুরা বিদ্যালয়ে এসে যাতে নিরাপত্তা বোধ করে, শিক্ষকের কাছ থেকে যথেষ্ট স্নেহ ভালবাসা পায় সেদিকে

খেয়াল রেখে শিক্ষক যদি পাঠ্যক্রমিক ও সহপাঠ্যক্রমিক কাজ পরিচালনা করেন তবে শিক্ষার ক্ষেত্র অনেক সহজ ও আনন্দময় হয়ে উঠতে পারে।

সহজাত প্রবৃত্তি (Instincts)

প্রত্যেক প্রাণীই বেঁচে থাকতে চায়; এই বেঁচে থাকার ইচ্ছাই তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য দায়ী। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে অ্যামিবা নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজ মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। বিবর্তনের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে 'বেঁচে থাকার ইচ্ছা'র (will to live) পক্ষে যে শারীরিক ও মানসিক গুণগুলি একান্ত প্রয়োজনীয় সেইগুলি কেবলমাত্র উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে।

'বেঁচে থাকার ইচ্ছা'কে সার্থক করে তুলতে হলে প্রত্যেক প্রাণীকে পরিবেশের সাথে সর্বদা সঙ্গতিবিধান করে চলতে হয়; আর এই সঙ্গতি-বিধানের প্রচেষ্টাকেই 'আচরণ' বলে। Herbert Spencer বলেছেন—"Life is the continuous adjustment of external relations."। প্রকৃতপক্ষে বাইরের কোন উদ্দীপকের সামনে কোন প্রাণী যখন সাড়া দেয় তখনই তাকে আমরা আচরণ বলি। উদ্দীপকের সাড়া দেওয়ার জন্যে প্রাণী কোন না কোন কাজ করে। দ্বিতীয়তঃ, কোন প্রাণী নিজের থেকে কোন আচরণ করে না—এই আচরণের জন্য একটি বাইরের উদ্দীপকের প্রয়োজন।* তৃতীয়তঃ, প্রাণীর আচরণ, উদ্দীপকের গঠন ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। চতুর্থতঃ, আচরণের স্তরবিন্যাস আছে—যে প্রাণী যত উন্নত তার আচরণও তত উন্নত। পঞ্চমতঃ, আচরণ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ জটিল হয়।

আচরণগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সব আচরণ একরকম নয়। আচরণগুলিকে দু ভাগে ভাগ করা যায়—অর্জিত বা শিক্ষাগত (Acquired or Learned) আর অনর্জিত বা সহজাত (Unlearned or Innate)।

সহজাত আচরণগুলিকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়—রিফ্লেক্স ও শরীর-তত্ত্বমূলক আচরণ ও প্রবৃত্তিমূলক আচরণ (instinctive behaviour)।

রিফ্লেক্স হোল সহজাত আচরণের সরল রূপ। এক এক সময় দেখা যায় কোন জৈবিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য আমাদের কোন কোন দেহযন্ত্র আমাদের

* Sandiford says "An Organism is no self-starting mechanism; its reactions are always started by same stimulus outside of itself."

প্রচেষ্টা ছাড়াই সক্রিয় হয়ে ওঠে। যেমন, চোখে বালি পড়ার সম্ভাবনা হলেই চোখ আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যায় ; নাকে ধুলো ঢুকলেই হাঁচি হয়, শ্বাসনালীতে খাবারের টুকরো গেলেই বিষম লাগে। হাই তোলা, বমি করা, ঢেকুর তোলা, হাসা, কাশা, কোন গ্রন্থির রস নিঃসরণ, যেমন জিভের লালা আসা, চোখের জল পড়া, ঘাম পড়া ইত্যাদিও রিফ্লেক্স জাতীয় আচরণ।

সহজাত আচরণ (Instinctive Action)।

কোনরকম শিক্ষা বা পূর্বসঙ্কল্প ছাড়া, কাজের ফলাফল সম্বন্ধে কোন ধারণা না নিয়ে কেবলমাত্র আত্মরক্ষা বা স্বজাতি রক্ষার জন্য ধারাবাহিকভাবে যে একাধিক কাজ করা হয় তাকেই সহজাত কাজ বলে। এই সহজাত কাজের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে ম্যাকডুগাল বলেছেন—মানুষের মনে এমন কতকগুলি প্রবণতা আছে যেগুলি জন্মসূত্রে পাওয়া। যেগুলি তার সমস্ত কাজকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। (Directly or indirectly the instincts are the prime mover of all human activity)। মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও এই আচরণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, এক রকমের বোলতা কোন ফড়িং-এর গায়ে হুল ফুটিয়ে তাকে অসাড় করে নিজের ঘরের মধ্যে টেনে এনে তার গায়ে ডিম পেড়ে ঘরের মুখ বন্ধ করে দেয়। যখন ডিম থেকে বাচ্চা ফোটে তখন তারা দেখে যে তাদের মুখের কাছেই খাদ্য সঞ্চিত আছে। কিন্তু মা বোলতা এই ধরণের কাজ করতে কাউকে দেখে নি তবে শিখল কেমন করে ? এখানেই বোঝা যাচ্ছে, সহজাত আচরণগুলি জৈবিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে চলে আর এটা কোন অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না।

বুদ্ধির সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তির খানিকটা সম্পর্ক থাকলেও তফাৎ আছে অনেকখানি। প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সহজাত প্রবৃত্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। শিকরেল পাখী অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি দিয়ে শিকারের উপস্থিতি বুঝতে পারে। সাধারণভাবে দেখা যায়, প্রাণীর আচরণ নিয়ন্ত্রণে বুদ্ধির চেয়ে সহজাত প্রবৃত্তির প্রভাব বেশী।

বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি দুটোই সহজাত—এগুলি নিয়েই ব্যক্তি জন্মায়। কিন্তু বুদ্ধি একটা মানসিক শক্তি আর প্রবৃত্তি হল একটা কর্ম-প্রবণতা। বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ বৈচিত্র্য খুঁজে পায় ; সহজাত প্রবৃত্তি খানিকটা যান্ত্রিক হয়ে পড়ে।

বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি দুইই প্রাণীকে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে সাহায্য করে। তবে ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে প্রবৃত্তি প্রাণীর আদিমতম হাতিয়ার ; মানবজীবনে বুদ্ধির আগমন ঘটেছে অনেক পরে।

ম্যাকডুগালের মতে সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে মানসিক উপাদান আছে, সহজাত ক্রিয়া যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয় না। সহজাত আচরণের মধ্যে কতকগুলি স্তর আছে। যেমন—

(১) কোন্ আচরণ জাগাতে হলে কোন্ বস্তু প্রথমে প্রত্যক্ষ করতে হবে অথবা মনোযোগ দিতে হবে। এটি হোল জ্ঞানমূলক স্তর (Cognitive stage)। যেমন, প্রথমে কোন ব্যক্তি দেখতে পেল যে একটা পাগলা কুকুর তার দিকে ছুটে আসছে।

(২) বস্তুটি দেখার পর একটি প্রক্ষোভের উন্মেষ ; এটি হোল অনুভূতি-মূলক স্তর (Affective stage)। যেমন, কুকুরটাকে ছুটে আসতে দেখে মনে ভয় জাগলো।

(৩) প্রক্ষোভ জাগার পরই কোন কাজ করার জন্য তীব্র উন্মাদনা অনুভব করা—এটি হোল প্রবৃত্তির প্রচেষ্টামূলক স্তর (Conative stage)। যেমন, ভয় জাগার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিটির মনে পালাবার তীব্র ইচ্ছা হোল।

(৪) যেটি এতক্ষণ প্রচেষ্টার স্তরে ছিল সেটি যখন বাস্তবে রূপ পেল তখনই প্রবৃত্তি আচরণমূলক সক্রিয় স্তরে (Active stage-এ) পরিণত হোল। যেমন, ব্যক্তিটি যখন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে সুরু করল তখন নিঃসন্দেহে বলা চলে এটি হোল সক্রিয় স্তর।

ম্যাকডুগালের মতে প্রত্যেক প্রবৃত্তির মধ্যে একটি বিশেষ প্রক্ষোভ থাকবেই। তাই তিনি যখন সহজাত প্রবৃত্তির তালিকা প্রস্তুত করেন তখন প্রবৃত্তির সঙ্গে একটি করে বিশেষ প্রক্ষোভেরও উল্লেখ করেছেন। তিনি মোট ১৪টি প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের কথা বলেছেন,—

	প্রবৃত্তি	প্রক্ষোভ
১।	ভয় (Fear)	পলায়ন (Escape)
২।	ক্রোধ (Anger)	যুযুৎসা (Combat)
৩।	বিরক্তি (Disgust)	ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা (Repulsion)
৪।	স্নেহ, মমতা (Tender feeling)	বাৎসল্য (Parental)

৫।	দুঃখবোধ (Distress)	অনুনয় (Appeal)
৬।	কাম (Lust)	যৌনপ্রবৃত্তি (Sex)
৭।	বিস্ময় (Wonder)	কৌতূহল (Curiosity)
৮।	ক্ষুধা (Gusto)	খাদ্যান্বেষণ (Foodseeking)
৯।	নিঃসঙ্গতা (Loneliness)	যৌথপ্রবৃত্তি (Gregariousness)
১০।	আত্মগরিমা (Superiority)	আত্মপ্রতিষ্ঠা (Self-Assertion)
১১।	হীনমন্যতা (Inferiority)	বশ্যতা (Submission)
১২।	অধিকারবোধ (Ownershep)	সঞ্চয় (Acquisition)
১৩।	সৃষ্টি (Creativeness)	সংগঠন বা নির্মাণ (Construction)
১৪।	আনন্দবোধ (Amusement)	হাস্য (Laughter)

পরবর্তীকালে আরও তিনটি সহজাত প্রবৃত্তি ম্যাকডুগাল যোগ করেছেন। সেগুলির নাম দিয়েছেন অপ্রধান সহজাত প্রবৃত্তি। যেমন—

১।	ক্লান্তিবোধ (Fatigue)	বিশ্রাম (Rest)
২।	দুঃখ বিমুখতা (Aversion to Pain)	আরাম (Ease)
৩।	ভ্রমণ স্পৃহা (Desire to travel)	আবিষ্কার (Exploration)

ম্যাকডুগালের মতে এইসব সহজাত প্রবৃত্তি প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। মনুষ্যেতর প্রাণীরা এই প্রবৃত্তিগুলির এতটুকু পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। কিন্তু প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে জ্ঞানমূলক উপাদান থাকার জন্য মানুষ অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার দ্বারা এগুলিকে নানাভাবে পরিবর্তন করতে পারে। মানুষের মধ্যে একসঙ্গে অনেকগুলি প্রবৃত্তি কাজ করে তখন সে একটা মিশ্র আবেগ ও উত্তেজনা অনুভব করে।

এখন প্রশ্ন হোল সহজাত প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য কি কি? এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল—

(১) সহজাত প্রবৃত্তি জন্মগত ও বংশানুক্রমিক। এগুলি শিক্ষার সাহায্যে অর্জন করা যায় না।

(২) এই প্রবৃত্তি জন্মগত হলেও জন্মের সময় থেকেই সব প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে না। যেমন, শিশুর স্তন্যপান প্রবৃত্তি জন্মের সময় থেকেই দেখা যায় কিন্তু যৌন প্রবৃত্তির প্রকাশ হয় অনেক পরে।

(৩) ম্যাকডুগালের মতে সহজাত প্রবৃত্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার উদ্দেশ্য। কোন প্রবৃত্তিমূলক আচরণ উদ্দেশ্যহীন নয়। পাখী বাসা তৈরী

করে শুধু নিজে থাকার জন্য নয়, তার বাচ্চাদের লালন পালনের গূঢ় উদ্দেশ্য এর পেছনে থাকে।

প্রবৃত্তিগুলি উদ্দেশ্যমূলক হলেও প্রত্যেক প্রাণী উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আগে থেকে খুব সচেতন থাকে না। এগুলি প্রাণীর জৈবিক প্রয়োজন, আত্মরক্ষা ও স্বজাতির রক্ষায় সাহায্য করে মাত্র।

(৪) প্রবৃত্তিমূলক আচরণগুলি শিক্ষাপ্রসূত না হলেও এগুলির মধ্যে দক্ষতার অভাব ঘটে না। মৌচাক লক্ষ্য করলে দেখা যায় মৌমাছি কেমন দক্ষ কারিগরের মত প্রতিটি ঘর নিখুঁত করে গড়ে।

(৫) সহজাত প্রবৃত্তি কোন বিশেষ প্রাণীর সম্পত্তি নয়—এটা সমগ্র জাতির সম্পদ।

(৬) সহজাত প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়ার সময় সমগ্র দেহযন্ত্রটি নিযুক্ত থাকে; এটা কোন অংশ বিশেষের প্রতিক্রিয়া নয়।

(৭) একটা কোন পরিস্থিতির সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই সহজাত প্রবৃত্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে।

(৮) সহজাত প্রবৃত্তি কর্মের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে। ম্যাগডুগালের মতে সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে প্রত্যক্ষণ, আবেগ ও কর্মপ্রবণতা থাকবেই।

(৯) প্রত্যেকটি প্রাণীর দৈহিক ও স্নায়বিক গঠনের সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তির বিশেষ যোগ আছে।

(১০) আবেগ ও সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। তবে সে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে।

(১১) প্রবৃত্তিগুলি সারাজীবন একইভাবে কার্যকরী থাকে না, আর থাকলেও তা অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে না। স্তন্যপান প্রবৃত্তি বড় হলে থাকে না।

(১২) প্রবৃত্তিজাত আচরণ এক এক প্রাণীর মধ্যে এক একরকম দেখা যায়। বাবুই পাখী বাসা তৈরী করে এক রকম ভাবে আর মৌমাছি মৌচাক তৈরী করে আর এক রকম ভাবে। কিন্তু দুজনেই বাসা তৈরী করছে।

ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তি সম্বন্ধে মতবাদ কিন্তু সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। কারণ ম্যাকডুগাল প্রবৃত্তিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করছেন। কিন্তু তবুও তাঁর প্রবৃত্তির মতবাদের দ্বারা মানুষের অনেক জটিল আচরণ ব্যাখ্যা করা যায় না, তাঁর মতবাদে প্রবৃত্তিকে একটি আলাদা কর্মপ্রবণতা বলা হয়েছে।

প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ সহগামী একথা ড্রেভার, জেমস্, গিন্সবার্গ ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানী স্বীকার করেন না। তাছাড়া প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির সাহায্যে মানুষের সব আচরণকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা বিজ্ঞানসম্মত নয়। এখানে প্রবৃত্তিকে অনেকটা যান্ত্রিক ও অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রবৃত্তির সবটাই যান্ত্রিক ও অপরিবর্তনীয় নয়। তাহলে তো শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রবৃত্তির কোন পরিবর্তন সাধন করা সম্ভবই হোত না। প্রকৃতপক্ষে প্রবৃত্তির কিছু পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধন করা যায়। প্রবৃত্তির সংখ্যা সম্বন্ধেও মনোবিজ্ঞানীরা একমত নন। আমাদের আচরণের পিছনে প্রবৃত্তিই একমাত্র কাজ করে একথাও আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন না। অনেকে সহজাত প্রবৃত্তির বদলে প্রেষণা (Motive)—যেমন অলপোর্ট বলেছেন—Drive, Need ইত্যাদি কথা ব্যবহারের এঁরা পক্ষপাতী।

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি—এখন আমরা দেখব মানুষের মধ্যে এই সহজাত প্রবৃত্তির কাজ কেমন। যাঁরা মনে করেন প্রবৃত্তি যান্ত্রিক ও অন্ধ তাঁরা মনে করেন মানুষের আচরণে প্রবৃত্তির প্রকাশ কম। কিন্তু জেমস বললেন, মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তির প্রকাশ সবচেয়ে বেশী এবং এই প্রবৃত্তিগুলির যুক্তি, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানী ওয়াটসান একথা স্বীকার করেন না। তিনি প্রবৃত্তির বদলে 'প্রবণতা' কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী, তিনি বলেন মানুষের মধ্যে অভ্যাস গঠনের প্রবণতা ছাড়া প্রবৃত্তি বলে কোন জিনিস নেই। এখানে দেখা যাচ্ছে প্রবৃত্তি কথাটার ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে গোলমাল বাধছে।

প্রকৃতপক্ষে প্রবৃত্তিমূলক আচরণ (Instinctive behaviour) ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া (Reflex action) যেমন আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তেমনি প্রবৃত্তি (Instinct) ও চাহিদার (Need) মধ্যেও একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রবৃত্তির সাহায্যে মানুষের সব আচরণ ব্যাখ্যা করা যায় না কিন্তু চাহিদার সাহায্যে সব আচরণ ব্যাখ্যা করা যায়। কাজেই প্রবৃত্তির চেয়ে চাহিদার ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক।

শিক্ষা ও সহজাত প্রবৃত্তি (Education & Instincts)।

প্রবৃত্তি নিয়ে মতভেদ থাকলেও প্রবৃত্তি ও শিক্ষার মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

আছে। এ সম্বন্ধে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা সবাই একমত। প্রবৃত্তি ও শিক্ষার সম্বন্ধ বুঝতে হলে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করতে হবে—(এক) শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব,(দুই) প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব।

বর্তমানে শিক্ষার উদ্দেশ্য হোল একটি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ; ফ্রয়েবেল, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, গান্ধীজীর শিক্ষার সংস্কারের মধ্যে দিয়ে এই কথাটি পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এই বিকাশ যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে প্রশ্ন উঠবে কার বিকাশ? এর উত্তর দিতে হলে একটা বিকাশধর্মী সত্তাকে স্বীকার করে নিতে হয়। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন এই বিকাশধর্মী সত্তা হোল প্রবৃত্তি। শিশু যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন তার মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তিগুলো থাকে—শিক্ষককে এই প্রবৃত্তিগুলো নিয়েই শিক্ষার কাজ সুরু করতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে অসংহত প্রবৃত্তিগুলোকে সুসংহত করা। এ প্রসঙ্গে মনোবিদ্‌ রস (Ross) তাঁর শিক্ষামনোবিজ্ঞান বইতে বলেছেন, বাড়ী তৈরীর জন্য যেমন ইট, মশলা ইত্যাদির প্রয়োজন তেমন চরিত্রগঠনের জন্য এই প্রবৃত্তিগুলোর প্রয়োজন। প্রবৃত্তিগুলোকে আমাদের চরিত্রের কাঁচামাল বলা চলে। জেমস বলেছেন—'It is the duty of every educator to detect the moment of instinctive readiness and to seige the wave of pupil's interest in each successive subject, before its ebb has come so that knowledge may be got and a habit of skill acquired.'—এখান থেকে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে প্রত্যেক শিক্ষককে বিষয়শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীর প্রবৃত্তিমূলক মানসিক প্রস্তুতির সময়টুকুকে খুঁজে বার করতে হবে, এবং শিশুর উৎসাহে ভাঁটা পড়ার আগে বিষয়গুলি পর পর এমন ভাবে পরিবেশন করতে হবে যাতে তারা কিছু জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব—এখন আমরা দেখব শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব কতখানি। প্রাচীন শিক্ষাদর্শনে শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব স্বীকার করা হোত না। তখন ধারণা ছিল যে প্রকৃতি হল মনুষ্যেতর প্রাণীর ধর্ম—মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তি অত্যন্ত নিন্দনীয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল প্রবৃত্তি নিরোধ করা। প্রবৃত্তিবাদীরা অবশ্য মানুষের জীবনে প্রবৃত্তির প্রভাব স্বীকার করেছেন। ম্যাকডুগালের মতবাদেও এই মতবাদের সমর্থন মেলে। তবে ম্যাকডুগাল বলেন, প্রবৃত্তি একা কাজ করে না; এর সঙ্গে থাকে প্রক্ষোভ।

এখানে আমরা দুটো চরম মত দেখতে পাচ্ছি—(এক), মানুষের জীবনে প্রবৃত্তি বলে কিছু নেই। (দুই), আবার মানুষ যা কিছু করে তা প্রবৃত্তির দ্বারাই করে। দুটো মতের মধ্যে আংশিক সত্যতা আছে কিন্তু কোন মতকেই পুরো সমর্থন করা যায় না।

শিক্ষার ব্যাপক অর্থ হল ব্যক্তিসত্ত্বার ক্রমবিকাশ। এই ব্যক্তিসত্ত্বার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ব্যক্তিসত্ত্বা বলতে আমরা কি বুঝি? ব্যক্তিসত্ত্বা হল বংশধারা ও পরিবেশ বা শিক্ষার সম্মিলিত ফল। শিশু যে সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মেছে তার একটা বড় অংশ হল সহজাত প্রবৃত্তি। জন্মের পরেই শিশু এই প্রবৃত্তির সাহায্যে পরিবেশের সাথে সঙ্গতিবিধান করে; প্রবৃত্তি সব মানুষের মধ্যে সমান কিন্তু পরিবেশের বৈষম্যের জন্য প্রবৃত্তি সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে পরিতৃপ্ত হয় না। ফলে ব্যক্তিসত্ত্বার উপর প্রবৃত্তির প্রভাবও বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়। কিন্তু তাই বলে ব্যক্তিত্বের উপর প্রবৃত্তির প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ একথা অস্বীকার করা যায় না; বিশেষ করে শিশুর প্রথম জীবনের অধিকাংশ কাজই প্রবৃত্তিজাত এবং তার ব্যক্তিত্বগঠনে প্রবৃত্তিগুলোই হোল শক্তিশালী উপকরণ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশগত চাহিদার আধিপত্য বাড়তে থাকে।

পরিবেশগত চাহিদা বাড়তে থাকলেও শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব কমে যায় না। শিক্ষা যদি প্রবৃত্তিমুখী না হয় তবে তা একান্তভাবে কৃত্রিম ও যান্ত্রিক হয়ে পড়বে এবং জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। প্রকৃতিবাদীরা শিক্ষাকে যখন স্বাভাবিক পথে পরিচালিত করতে বলেন তখন এই প্রবৃত্তিগুলোর উপরই গুরুত্ব দেন। কতকগুলো প্রবৃত্তিকে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে সার্থকভাবে কাজে লাগান যায়; যেমন, শিশুর আগ্রহ, মনোযোগ, কৌতূহল প্রবৃত্তি ইত্যাদি। যৌথ প্রবৃত্তির সাহায্যে শিশুর সামাজিকতাবোধ বাড়ান চলে। অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও পরিবেশের প্রভাবে শিশুর প্রবৃত্তিমূলক আচরণের পরিবর্তন ও পরিমার্জন সম্ভব।

শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাবকে আমরা মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করতে পারি। (১) শিক্ষা হওয়া উচিত প্রবৃত্তিমুখী, (২) শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলোকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে শিক্ষাকে সহজ ও কার্যকরী করা যায়, (৩) শিশুর মধ্যে কতকগুলি প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে তার মধ্যে বাঞ্ছিত গুণের সৃষ্টি করা সম্ভব। শিশুকে তাই যা কাজ দেওয়া হবে তা যেন তার

ক্ষমতার মধ্যে থাকে। শিক্ষার্থীর ক্ষমতার নিন্দা ও বিদ্রূপ করা উচিত নয়; নিন্দা, বিদ্রূপ শিশুর মনে বিরুদ্ধ প্রক্ষোভের সৃষ্টি করতে পারে; সে ক্ষেত্রে তার শিক্ষার কাজ ব্যাহত হবে।

প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব—শিক্ষায় সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর একটা বিশেষ স্থান আছে একথা আমরা আগেই জেনেছি। উইলিয়াম জেমস বলেছেন, শিক্ষার সাহায্যে সহজাত প্রবৃত্তির পরিবর্তন করা যায়—শুধু পরিবর্তন নয় কখনও কখনও বিলোপ সাধনও করা যায়। ম্যাগডুগালের মত প্রবৃত্তিবাদীরা এই চরম মত গ্রহণ না করলেও শিক্ষার সাহায্যে প্রবৃত্তির পরিবর্তন করা যায় একথা স্বীকার করেছেন।

এখন আমরা দেখব কেমন করে **শিক্ষক প্রবৃত্তিগুলোর পরিবর্তন সাধন করেন (Instinct and the teacher's responsibility)**।

১। **অবদমন** (Repression)—প্রাচীনকাল থেকে একটা ধারণা চলে আসছে যে শিশুরা নানা খারাপ গুণ নিয়ে জন্মায়। তাই শিক্ষা দিতে গিয়ে শিক্ষক এই স্বাভাবিক প্রবণতাগুলোকে চেপে দিয়ে শিশুর মধ্যে সামাজিক আদর্শ অনুযায়ী কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত করে দেবেন।

এখানে আমরা দেখছি অবদমন হোল প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের প্রথম উপায়। কিন্তু কোন প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশকে যদি জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে তা মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়, আসলে অবদমিত প্রবৃত্তিগুলো একেবারে নষ্ট হয়ে যায় না—ভিন্ন রূপ নিয়ে ব্যক্তির মনে দেখা দেয় এবং এতে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হয়। অনেক সময় শাস্তি-পুরস্কারের ভয় ও লোভ দেখিয়ে অনেক প্রবৃত্তিকে দমন করা হয় বটে কিন্তু এর ফল দীর্ঘস্থায়ী হয় না, উপরন্তু শিশুর মানসিক জটিলতার সৃষ্টি হয় ও ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ব্যাহত হয়।

২। **বিরেচন** (Cathersis)—অনেকে আবার অবদমনের ঠিক উল্টো মত পোষণ করেন। যেমন, ফ্রয়েড বলেন, প্রবৃত্তি অবদমনের ফলে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়; কাজেই প্রবৃত্তিগুলোকে সহজ ও বাঞ্ছনীয় পথে প্রকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত। প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশের দ্বারা মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার নাম দিয়েছেন অ্যাব্রিকসান (abreaction)।

এই পদ্ধতিটি মানসিক রোগ সারাবার জন্য অনেক সময় ব্যবহৃত হলেও সাধারণভাবে এটি প্রয়োগ করা চলে না। প্রবৃত্তিগুলোকে স্বাভাবিক পথে

প্রকাশ হতে দিলে ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে বিপর্যয় দেখা দেবে। যেমন যুযুৎসা বা যৌনপ্রবৃত্তি সব মানুষের মধ্যে আছে—এগুলো প্রকাশের অবাধ সুযোগ দিলে মানব সভ্যতা এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

৩। **উন্নীতকরণ** (Sublimation)—এই পদ্ধতি হোল অবদমন ও বিরেচন দুই চরম মতের সমন্বয়। এই পন্থায় প্রবৃত্তিকে প্রকাশের স্বাভাবিক ও অবাঞ্ছিত পথ থেকে সরিয়ে এনে বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করা যায়। ফ্রয়েড ও তাঁর অনুগামীরা এই পদ্ধতির নাম দিয়েছেন 'উদ্গমন'। তাঁরা বলেন কেবলমাত্র যৌনপ্রবৃত্তির উদ্গমন সম্ভব। পরবর্তীকালে শিক্ষাবিদ্‌রা এই পদ্ধতিকে শিক্ষার ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। যে শিশু যুযুৎসাপ্রবৃত্তির প্রভাবে সঙ্গীদের সাথে মারামারি করে, তাকে খেলাধূলা, বক্সিং লাঠিখেলা ইত্যাদি শেখার ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে। শিশুর মধ্যে সঞ্চয় প্রবৃত্তি থাকে, ফলে আমরা দেখি নানান টুকিটাকি জিনিস সে সংগ্রহ করে। শিক্ষক এই প্রবৃত্তিকে কাজে লাগাতে পারেন, শ্রেণীতে একটি প্রকৃতি কোণ অথবা বিদ্যালয়ে একটি মিউজিয়াম গড়ে তুলতে পারেন, যেখানে ছোটখাট জিনিসগুলো সুন্দর করে গুছিয়ে রাখলে শিক্ষামূলক অনেক জিনিস পাওয়া যায়। শিশুকে ডাকটিকিট, শিক্ষামূলক ছবি, মুদ্রা সংগ্রহ করতেও শিক্ষক উৎসাহিত করে তার প্রবৃত্তিকে বাঞ্ছিত পথে প্রকাশ করতে সাহায্য করতে পারেন।

৪। **অন্যান্য পন্থা**—অন্যান্য পন্থার মধ্যে পড়ে প্রবৃত্তিকে বহিঃপ্রকাশের সুযোগ না দেওয়া। তার ফলে দেখা যায় প্রবৃত্তিটা ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছে। এটা খানিকটা অবদমনের মত মনে হলেও এখানে প্রবৃত্তিকে ঠিক দমন করা হচ্ছে না—প্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে মাত্র।

পরিবেশ পরিবর্তন করলে অনেক সময় ভাল ফল পাওয়া যায়। এক একটা পরিবেশে এক একটি প্রবৃত্তি সক্রিয় হ'য়ে ওঠে। কাজেই সুযোগ বুঝে পরিবেশ পরিবর্তন করলে বা স্থির রাখলে প্রবৃত্তি প্রকাশের সুযোগ পায় না—এতে খানিকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

অনেক সময় বিপরীতধর্মী প্রবৃত্তিকে প্রকাশের সুযোগ দিয়ে অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তিকে শক্তিহীন করা যায়। যেমন কোন শিশুর মধ্যে বশ্যতা প্রবৃত্তির প্রকাশ থাকলে তার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তির বিকাশের সুযোগ করে দিতে পারেন শিক্ষক। শিশু মনের ঘৃণার ভাবকে দূর করতে হলে তার মনে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ভাব শিক্ষক জাগাবেন, তাহলে অনেক সময় খুব ভাল ফল পাওয়া যাবে।

এই সমস্ত পদ্ধতি শিক্ষকের জানা থাকলে তিনি প্রয়োজন মত সেগুলি প্রয়োগ করতে পারবেন। শিশুদের নির্মাণ প্রবৃত্তি, কৌতূহল প্রবৃত্তিকে কাজে লাগাতে হলে তাদের হাতে-কলমে কিছু করতে দিতে হবে ; এখানে শিক্ষককে কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষার কথা ভাবতে হবে। যৌনপ্রবৃত্তিকেও সৃজনাত্মক পথে পরিচালিত করতে পারলে শিক্ষার্থীর মঙ্গল হয়। তাই আদর্শ শিক্ষকের কর্তব্য হবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সহজাত প্রবণতাগুলোর অনুশীলন করানো (যা রুশো বলতে চেয়েছিলেন) এবং প্রত্যেক প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করে সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলো আদর্শ স্থাপন করা। এবং সেই আদর্শকে সামনে রেখে শিশুর প্রবণতাকে সেই পথে পরিচালিত করা। প্রবৃত্তিগুলোই হবে শিক্ষকের হাতিয়ার।

প্রবৃত্তি শিক্ষাযোগ্য কি না

প্রবৃত্তি হোল সহজাত আর শিক্ষা হোল অর্জিত। তাই এ প্রশ্ন সহজেই মনে জাগে যে শিক্ষার সাহায্যে কি প্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটানো যায়? মানুষের জীবনে প্রবৃত্তি অন্ধ যান্ত্রিকতা নয়, কাজেই নমনীয়। এখানেই শিক্ষার সুযোগ রয়েছে: তবে শিক্ষা চায় না প্রবৃত্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যাক ; আবার এও চায় না যে প্রবৃত্তি যেমন খুশী প্রকাশিত হোক। প্রবৃত্তিগুলোর প্রকাশের পথ শিক্ষাই স্থির করে দেয়। প্রবৃত্তি সহজাত হলেও তার সার্থক পরিণতি ঘটে শিক্ষার হাতে। প্রকৃতপক্ষে প্রবৃত্তি ও শিক্ষার মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

এখন আমরা দেখব প্রবৃত্তিগুলোকে শিক্ষা কেমন করে কাজে লাগায়। শিশু যখন শেখে তখন এই প্রবৃত্তিগুলোরই পরিমার্জনা করে—Learning is the modification of instincts.

প্রবৃত্তিগুলো শিশুকে জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করে। যেমন কৌতূহল প্রবৃত্তি তাকে জানতে সাহায্য করে। শিশুর জীবনের এক এক স্তরে এক এক রকম প্রবৃত্তি প্রকট হয়ে ওঠে। শিক্ষক সেগুলোর দিকে খেয়াল রেখে শিক্ষনীয় বিষয় স্থির করবেন। চরিত্র গঠনে এই প্রবৃত্তিগুলোই হবে কাঁচামাল। Ross বলেছেন—"The Educator must work with grain, not against it." কোন সমস্যার সমাধান করতে এই প্রবৃত্তিগুলো অনেকখানি সাহায্য করে। গঠনমূলক কাজে প্রবৃত্তিগুলোকে ভালভাবে কাজে লাগান যায়।

পাঠদান কালে আগ্রহ সৃষ্টি করার কাজেও এই প্রবৃত্তিগুলো খুব সাহায্য করতে পারে।

প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রক্ষোভের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে একথা মনে রেখে শিক্ষক প্রক্ষোভ জাগানর চেষ্টা করবেন। সংগীত, শিল্প ও সৌন্দর্যের প্রতি শিশুর প্রক্ষোভ জাগাবেন শিক্ষক; এ প্রসঙ্গে আমরা দার্শনিক প্লেটোর উক্তি স্মরণ করতে পারি। তিনি বলেছেন—"We require to be trained from our earliest youth to feel pleasure and pain at the right thing. True education is just that."

প্রশ্নাবলী

1. What is an instinct? How would you reconcile the innateness of instincts with educability of human beings.

(1963 B. A)

2. Write a short essay on 'the concept of Instinct'.

(1966 C. U. B. A.)

3. Discuss the nature of instincts. Mention two important instincts and consider how energy of such instincts may be utilised for learning. (1967 C. U. B. T.)

4. Describe the nature of instincts and indicate their educational significance. (1970 C. U. B. T.)

5. "The whole task of education is to sublimate the instincts."—Explain. (1971 C. U. B. T.)

6. What are instincts? Discuss their importance in the education of human beings. (1972 C. U. B. T.)

7. Write notes on :—

(a) Instinct and Reflex.

(b) Instincts and Needs. (C. U. B A.)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রক্ষোভ (Emotion)

মানুষের সহজাত জৈব মানসিক সত্তার একটা বৈশিষ্ট্য হোল বিশেষ বস্তুর সামনে মনের বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা। এই বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এক রকম মানসিক অনুভূতি, যাকে আমরা সাধারণভাবে প্রক্ষোভ বলি।

বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয় প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে। প্রত্যক্ষণের সাথে সাথে আমাদের মনে একটা অনুভূতিও হয়। বন্ধুকে পথে দেখে চিনতে পারলাম শুধু নয়, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও হোল। প্রক্ষোভও অনেকটা অনুভূতির মত, তবে প্রক্ষোভের প্রকাশ হয় দেহযন্ত্রের মাধ্যমে। তাই প্রক্ষোভ অনুভূতির মত নিষ্ক্রিয় নয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বলেন প্রক্ষোভ ব্যক্তির কর্মশক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং প্রক্ষোভ বলতে ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক শক্তিকে বিচলিত করে এমন স্বতঃস্ফূর্ত মানসিক অবস্থাকে বোঝায়। ম্যাকডুগাল বলেছেন প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত মানসিক অবস্থাই হোল প্রক্ষোভ। জেমসের মতে বস্তুর প্রত্যক্ষণ যে দৈহিক সংবেদন সৃষ্টি করে তাই হোল আবেগ।

প্রক্ষোভ বা আবেগের সংজ্ঞা।

আবেগ বা প্রক্ষোভ হোল এমন এক ধরণের জটিল অনুভূতি যার মূলে আছে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি যেগুলি বিশেষ বস্তু বা ধারণার সাহায্যে জাগরিত হয় ও দেহের অভ্যন্তরে পরিবর্তন সাধন করে, যার ফলে মানুষ নানা কাজে প্রবৃত্ত হয়।

প্রধান প্রধান আবেগ বলতে আমরা বুঝি রাগ, ভয়, হিংসা, ঘৃণা, বিস্ময়, দয়া, সহানুভূতি, নির্জনতা, সন্তুষ্টি, আনন্দ, দুঃখ, হীনমন্যতা ইত্যাদি।

সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব—(১) কোন ভাব বা ধারণার দ্বারা আবেগ সৃষ্টি হয়, (২) আবেগ হ'ল একটা জটিল অনুভূতি, (৩) আবেগ সৃষ্টি হলে দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি পরিবর্তন দেখা যায়, (৪) এই পরিবর্তনের ফলে কতকগুলি বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে, (৫) আবেগ আমাদের কাজে প্রবৃত্ত করে।

Arthur Gersield defines emotion as "a state of being moved and stirred up or aroused in one way or the other. It involves feeling and impulses and physiological reactions."

প্রক্ষোভ বা আবেগের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Emotion)

প্রক্ষোভ বা আবেগের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা তাকে অন্যান্য মানসিক অবস্থা থেকে আলাদা করে রেখেছে। প্রক্ষোভ অনুভূতি থেকে উদ্ভূত হলেও অনুভূতির সঙ্গে প্রক্ষোভের অনেক পার্থক্য আছে। অনুভূতির প্রকৃতি খুব মৃদু; এই অনুভূতিই যখন প্রবল আকারে প্রকাশ পায় তখন তাকে আমরা প্রক্ষোভ বা আবেগ বলি।

এই প্রক্ষোভ সৃষ্টি করার জন্য একটা উদ্দীপকের প্রয়োজন।

যদিও ম্যাগডুগাল বলেছেন, প্রক্ষোভ প্রবৃত্তির সঙ্গে জড়িত কিন্তু এদের সম্পর্ক সঠিকভাবে স্থির করা যায় না, কারণ একই প্রক্ষোভ বিভিন্ন ধরণের আচরণের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। যেমন ছাত্ররা পড়া না পারলে ভয় পায়, বাঘ দেখলে ভয় পায়, অন্ধকারের মধ্যে যেতে ভয় পায় ইত্যাদি।

প্রক্ষোভের দুটো দিক আছে—দৈহিক ও মানসিক দিক। যখন আমাদের রাগ হয় তখন জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ে, গলার স্বর উচ্চ হয়, হাত পা চঞ্চল হয় ইত্যাদি। এ সবের সঙ্গে সঙ্গে এ কয়রকম তীব্র অনুভূতি মনকে দোলা দেয়।

প্রক্ষোভের আর একটি বৈশিষ্ট্য হোল, মনের এই উত্তেজনা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। উত্তেজনা যেমন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় তেমনি কমেও ধীরে ধীরে; আমরা যেমন হঠাৎ রেগে যাই না আবার রাগের বস্তু অপসারণের পরই আমাদের রাগ কমে যায় না; অনেকক্ষণ এর রেশ থাকে। এই রেশটাকে অনেক সময় মুড (mood) বলা হয়।

আমাদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভমূলক কাজেরও পরিবর্তন হয়। যেমন শিশুর আনন্দ হলে সে তার সম্পূর্ণ দেহ দিয়ে তা প্রকাশ করে কিন্তু বড়দের বেলায় অতটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না।

প্রক্ষোভ ও প্রবৃত্তি ব্যক্তির মানসিক ইচ্ছার (desire) উপর নির্ভর করে। ড্রেভার বলেন আমাদের প্রবৃত্তি বাধা পেলেই প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

C. W. Vallentine holds that "when feelings become intense we have emotions."

Emotion, according to Woodworth is a "stirred up state of the organism" – in which there is an impulse or conscious attitude tending toward some definite activity.

প্রক্ষোভ আমাদের দৈহিক অবস্থার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। শরীর খারাপ থাকলে সামান্য কারণে রাগ হয়।

আবার কেউ কেউ বলেন প্রক্ষোভ কোন বিশেষ বস্তু বা অভিজ্ঞতার প্রতি আমাদের মানসিক অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ।

মনোবিজ্ঞানী স্টাউট (Stout) প্রক্ষোভের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—

(১) প্রক্ষোভের পরিধি অনেক ব্যাপক, (২) বিভিন্ন অবস্থা একই প্রক্ষোভ জাগায়, (৩) প্রক্ষোভ জাগরণের একটা কারণ থাকবেই, (৪) প্রক্ষোভ জাগরণের ফলে যে মেজাজ তৈরী হয় তা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়, (৫) প্রক্ষোভগুলি পরাশ্রয়ী, কারণ এটি সহজাত প্রবৃত্তি থেকে উদ্ভূত, (৬) তীব্র প্রক্ষোভের বেলায় দৈহিক সংবেদন (sensation) দেখা যায়, (৭) প্রক্ষোভ অনেক সময় অত্যন্ত আকাস্মিকভাবে আবির্ভূত হতে পারে, (৮) প্রক্ষোভ আমাদের বিচার শক্তি সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে—যেমন কেউ কেউ রাগে বা দুঃখে আত্মহত্যা করে ফেলে, কিন্তু মরার পূর্ব মুহূর্তে অনেকেই তীব্র অনুশোচনা বোধ করে। এর থেকে বোঝা যায় কিছুক্ষণের জন্য বিচার বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, (৯) প্রক্ষোভের অভিব্যক্তি সব বয়সেই দেখা যায়, (১০) প্রক্ষোভগুলি অনুবর্তন সাপেক্ষ (can be conditioned and de-conditioned)।

প্রক্ষোভ জাগে কেন?

এখন আমরা দেখব প্রক্ষোভ জাগে কেন? একটি প্রক্ষোভমূলক পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, একটি প্রক্ষোভ জাগার অনেক কারণ থাকতে পারে। প্রথম কারণ হিসাবে বলা যায় একটা উত্তেজনা। তবে পরিবেশ থেকে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় (যেমন খুব জোর শব্দ, খুব উজ্জ্বল আলো প্রভৃতি) তা ছোট শিশুদের প্রক্ষোভ জাগাতে বেশী সাহায্য করে। বড়দের বেলায় প্রক্ষোভের প্রকৃতি খানিকটা সামাজিক প্রকৃতির বলা চলে।

দ্বিতীয় কারণ হিসাবে বলা চলে—এই উত্তেজনা সম্বন্ধে সচেতনতা। তৃতীয় কারণ হোল গ্রন্থিজনিত উত্তেজনা, গ্রন্থিগুলো উত্তেজিত হয়ে প্রক্ষোভের মাত্রা ও অভিব্যক্তি বাড়িয়ে দেয়।

'Emotions differently described and explained by different psychologists, but all agree that it is a complex state of the organism, involving bodily charges of a widespread character, in breathing, pulse, gland secretion etc'. Dictionary of Psychology.

প্রক্ষোভের বিভিন্ন তত্ত্ব

প্রক্ষোভ সম্বন্ধে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন।

ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ তত্ত্ব (Mc Dougall's theory of Instinct and Emotion)—ম্যাকডুগাল বলেছেন প্রত্যেক সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে একটা করে প্রক্ষোভ থাকবেই এবং প্রক্ষোভটি জাগলে তবে প্রবৃত্তিটা কার্যকরী হবে।

জেম্‌স্‌-ল্যাং তত্ত্ব (James Lange Theory)—জেম্‌স্‌ ও ল্যাং বলেন প্রক্ষোভের তুটি দিক আছে—মানসিক ও দৈহিক। কিন্তু প্রক্ষোভ জাগার পর দৈহিক পরিবর্তন হয়, না দৈহিক পরিবর্তনের ফলে প্রক্ষোভ জাগে? এই তত্ত্ব অনুসারে বলা হয় আগে উদ্দীপকের প্রত্যক্ষণ তারপর শারীরিক প্রতিক্রিয়া, তারপর প্রক্ষোভের অনুভূতি। অর্থাৎ আমরা প্রথমে ভয়ের বস্তু দেখি, দেখে দৌড়ই, তারপর ভয় পাই।

এই মতবাদে দেখা যাচ্ছে দৈহিক প্রকাশ ছাড়া প্রক্ষোভ জাগে না; কিন্তু তাই বলে প্রক্ষোভ ও দৈহিক প্রকাশ অভিন্ন নয়। বাইরের কোন উদ্দীপক ছাড়া প্রক্ষোভ জাগে না একথাও এই তত্ত্বে বলা হয়েছে। কিন্তু একথা সব সময় ঠিক হয় না।

ক্যাননা বার্ডের থ্যালামিক তত্ত্ব (Cannon Bard's Thalamic Theory)--এই তত্ত্বে বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উত্তেজনা প্রথমে মস্তিষ্কে ও পরে হাইপো থ্যালামাস কেন্দ্রে যায়; এখানে উত্তেজনাটা তুভাগ হয়ে যায়—এক ভাগ আবার মস্তিষ্কে ফিরে গিয়ে প্রক্ষোভের প্রকৃতি ও মাত্রা নির্ধারণ করে অর্থাৎ রাগ, আনন্দ, তুঃখ, ভয় ইত্যাদির কোনটি কতখানি হবে তা ঠিক করে দেয়। আর এক ভাগ নেমে আসে অটোনমিক স্নায়ুতন্ত্রে ও সেখান থেকে চলে যায় মাংসপেশী ও গ্রন্থি প্রভৃতিতে—এর ফলে শারীরিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এই উত্তেজনা স্নায়ুপথ দিয়ে আবার মস্তিষ্কে পৌঁছলে যে প্রক্ষোভ আগে থেকে নির্দিষ্ট ছিল তা আরও বেড়ে যায়।

প্রক্ষোভের উৎপত্তি ও বিকাশ।

শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভ কখন থেকে আরম্ভ হয় ও কিভাবে তার বিকাশ হয় তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই। প্রক্ষোভ প্রথমে কটা থাকে ও কি ভাবে থাকে তা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে জন্মের সময়

শিশু কতকগুলি প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মায় এবং এই প্রক্ষোভ ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়—এ সম্বন্ধে সকলে একমত।

প্রক্ষোভের দুটো দিক—দৈহিক ও মানসিক দিক স্বীকার করা হয়েছিল। কিন্তু আচরণবাদী ওয়াটসন (Watson) প্রক্ষোভের মানসিক দিকটা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন প্রক্ষোভ হোল দৈহিক উত্তেজনা জনিত একটা পরিবর্তন। তাঁর মতে শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভ তিনটি—রাগ, ভয় ও ভালবাসা বা আনন্দ। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত কাজে বাধা দিলেই রাগ হয়; খুব জোরে শব্দ করলে অথবা শিশুকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিলে ভয় হয়, শিশুকে মোটামুটি শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য দিলে ও আদর করলে তার আনন্দ হয়।

শিশুর দৈহিক অভিব্যক্তি দেখে বুঝতে হয় তার মধ্যে কোন প্রক্ষোভটি জেগেছে। যেমন নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করা, হাত পা গুটিয়ে নেওয়া, মুখ ফ্যাকাশে হওয়া ইত্যাদি দেখলে বোঝা যায় শিশুর ভয় হয়েছে। শিশু যখন কাঁদে, হাতে পা ছোড়ে তখন বুঝতে হবে রাগ হয়েছে। আবার শিশু যখন হাসে, কোলে আসার জন্য হাত বাড়ায় তখন আমরা বলি শিশুর আনন্দ হয়েছে।

মনোবিজ্ঞানী শারম্যান আবার ওয়াটসনের এই মতবাদ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন উদ্দীপকের প্রকৃতি না জানা থাকলে কোনটা ভয়, কোনটা রাগ, কোনটা আনন্দ ঠিক চেনা যায় না।

ব্রিজেসের মতে শিশুর একটি মৌলিক প্রক্ষোভ আছে—এর নাম দিয়েছেন সাধারণ উত্তেজনা। তিনি বলেন—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভগুলি বিশেষায়িত হয়। শিশুর তিন মাস বয়স পর্যন্ত সাধারণ উত্তেজনা থাকে। তিন মাস বয়সে দুটি ভিন্নপ্রকৃতির প্রক্ষোভ দেখা যায়—আনন্দ ও অস্বাচ্ছন্দ্য। চার মাস বয়সে অস্বাচ্ছন্দ্য থেকে রাগ জন্মায়, পাঁচ মাসে বিরক্তি জন্মায়, ছয় মাসে ভয় জন্মায়, সাত মাস বয়সে আনন্দ থেকে উচ্ছ্বাস জন্মায়।

শিশুর প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্য

শিশুর প্রক্ষোভের মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

(১) স্থায়িত্ব কম—শিশুদের আবেগের বহিঃপ্রকাশ খুব বেশী, কাজেই এই আবেগ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না।

(২) মাত্রাবোধের অভাব—ছোটখাট ব্যাপারে শিশুর খুব রাগ হয় আবার সামান্য কারণে হয়তো প্রচুর আনন্দ হয়।

(৩) পুনরাবৃত্তি—শিশুর মনে প্রক্ষোভের ঘন ঘন বদল হয়, এই রাগ, এই আনন্দ, এই হাসি, এই কান্না।

(৪) দ্বৈততা—শিশুর প্রক্ষোভের দুই চরম অভিব্যক্তি পাশাপাশি দেখা যায়। কোন কারণে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল আবার সঙ্গে সঙ্গে কোন হাসির কথা হলে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

এগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ছোটবেলায় প্রক্ষোভ এক রকম থাকে। বয়সে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলির পরিবর্তন হ'তে থাকে ও ক্রমে অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট হ'য়ে অন্যরকম হ'য়ে ওঠে। তবে এই পরিবর্তনের পথে কয়েকটি প্রভাব বিশেষভাবে সহায়তা করে। যেমন—

(১) বৃদ্ধি ও বিকাশের প্রভাব, (২) শিখনের প্রভাব, (৩) বয়সের প্রভাব, (৪) প্রাক্ষোভিক অভিব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ, (৫) প্রাক্ষোভিক অভিব্যক্তিতে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগ, (৬) আগ্রহের স্বরূপ পরিবর্তনের প্রভাব, (৭) ভাষা জ্ঞানের প্রভাব ইত্যাদি।

শিক্ষা ও প্রক্ষোভ

এখন আমরা দেখব শিক্ষা কি ভাবে প্রাক্ষোভিক বিকাশে সাহায্য করতে পারে। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আরও একটা প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে প্রক্ষোভগুলিকে শিক্ষার আওতায় আনব কেন?

প্রথমতঃ, প্রক্ষোভগুলিকে শিক্ষার সাহায্যে সংযত না করলে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, প্রক্ষোভের নগ্নরূপ সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে।

প্রক্ষোভকে তাহলে শিক্ষা কি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে? প্রক্ষোভ তো সহজাত প্রবৃত্তি থেকে উদ্ভূত; কাজেই সহজাত প্রবৃত্তির মতই হবে এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। প্রক্ষোভের ভিন্ন প্রকাশ (Redirection), উন্নীতকরণ (Sublimation), বিরেচন (Cathersis), অবদমন (Repression), নিরুদ্ধকরণ (Inhibition), কোন মানসিক বৃত্তি (Mental Occupation) ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষা প্রক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবে।

প্রক্ষোভগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করলে যেমন সুফল পাওয়া যায়, আবার তেমনি

নিয়ন্ত্রণের অভাবে একটি শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকরও হয়ে উঠতে পারে।

প্রক্ষোভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে কি কি জিনিষ তা যদি জানা থাকে তবেই শিক্ষক প্রক্ষোভকে শিক্ষার ক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন। অন্তরায় সৃষ্টিকারী কারণগুলো হোল—শিশুর উপর তার বংশগতির প্রভাব, প্রক্ষোভঘটিত নিরাপত্তার অভাব, অর্থনৈতিক বৈষম্য, শৃঙ্খলা সম্বন্ধে অতি প্রাচীন ও নিপীড়নমূলক ধারণা, পাঠদানের ক্রটিপূর্ণ পদ্ধতি, অতিরিক্ত ভয়, শিক্ষকের ক্রটিপূর্ণ আচরণ, বিদ্যালয়ের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সমাজের অবাঞ্ছিত পরিবেশ, শিশুর পিতামাতার দারিদ্র্য, বিদ্যালয়ে সহপাঠক্রমিক কাজের অভাব, ও কুসঙ্গের প্রভাব ইত্যাদি।

এই কারণগুলির সবটাই হয়তো শিক্ষক একা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। তবুও বিদ্যালয়ের আওতায় ও তাঁর সাধ্যের মধ্যে যে কারণগুলি আছে সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে শিক্ষকের কার্পণ্য করা উচিত নয়।

শিক্ষকের প্রথম কাজ হবে তাঁর নিজের প্রক্ষোভগুলিকে সংযত করা। শিশুদের প্রক্ষোভগুলিকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝতে চেষ্টা করবেন শিক্ষক। সামান্য কথায় শিক্ষকের খুব রেগে গেলে চলবে না, তাঁর প্রাক্ষোভিক আচরণের সমতা থাকা একান্ত দরকার। এই আচরণগুলি তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে আদর্শ হিসাবে রাখবেন। শৃঙ্খলা রক্ষা করতে গিয়ে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কিছু অবলম্বন করবেন না।

শিশুর প্রক্ষোভগুলিকে সমাজ অনুমোদিত বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করতে গিয়ে শিক্ষক শিশুর পরিবার ও পরিবেশের খবর নেবেন।

প্রক্ষোভগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে শিক্ষককে শিশুর বিশেষ কতকগুলি গুণের বিকাশের দিকে নজর রাখতে হবে, যেমন—আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা, সামাজিকতা ইত্যাদি। এই গুণগুলির যথাযথ বিকাশ না হলেই প্রাক্ষোভিক আচরণগুলিকে ঠিক পথে পরিচালিত করা যায় না।

প্রক্ষোভকে উপযুক্তভাবে পরিচালনা করতে হলে শিক্ষককে প্রথমে শিশুকে ভালবাসতে হবে। স্নেহ-প্রীতির বন্ধন এখানে বিশেষ কার্যকরী। শিশুরা শিক্ষকের পাণ্ডিত্য বোঝে না—যে শিক্ষক শিশুদের ভালবাসেন, তাঁর পাঠদানের বিষয়টি, তাঁর পাঠদানের পদ্ধতি সবই তাদের ভাল লাগে। এই শিক্ষকের সব কিছুই শিশুরা অনুকরণ করতে চায়।

কাজেই শিক্ষককেও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। তিনি তাঁর আদর্শ ; প্রাক্ষোভিক আচরণ দিয়ে কচি মনগুলোকে জয় করতে পারবেন ও প্রাক্ষোভিক বিকাশের একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরী করতে পারবেন।

এই সব দিক থেকে বিচার-বিবেচনা করে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রক্ষোভ হচ্ছে শিক্ষার একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। কতকগুলি বিশেষ প্রক্ষোভ আছে যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে ক্ষতিকর মনে হয়, কিন্তু সেগুলিকেও ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে শিক্ষার ক্ষেত্রে সেগুলি প্রচুর সহায়ক হতে পারে। যেমন ধরা যাক, রাগ।

রাগ হলেই মনের মধ্যে একটা ঘৃণা, হিংসা, প্রতিশোধ স্পৃহা জাগে, এর ফলে শারীরিক দিক থেকেও ক্ষতি হয়, ক্ষুধা মন্দ হয়, রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি। কিন্তু এই প্রক্ষোভটিকে কাজে লাগালে অনেক সুফল পাওয়া যায়। যেমন—

(১) শিশুকে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে না রেখে খানিকটা স্বাধীনভাবে যদি থাকতে দেওয়া হয়।

(২) তার উপর যদি কাজের বেশী বোঝা চাপান না হয়।

(৩) শিশুটি কি করতে ইচ্ছা করে, তার ইচ্ছার উপর খানিকটা গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(৪) তার যাতে রাগ হয়েছে—সেই ব্যাপারটা নিয়ে শিশুটির সাথে আলোচনা করা হয়।

(৫) শিশুর ক্ষমতা অনুযায়ী যদি তাকে কাজ দেওয়া হয়।

(৫) অকৃতকার্যতার হতাশা যে শিশুর থাকে তাকে সর্বদা যদি উৎসাহ দেওয়া হয়।

(৭) শিশুর অবাঞ্ছিত ইচ্ছাগুলির প্রতি যদি গুরুত্ব না দেওয়া হয়—তবে শিশুর রাগ প্রক্ষোভটি জাগার সম্ভাবনা কম থাকে। রাগের সাহায্যে শিশু অনেক ভালো কাজও করে ফেলতে পারে, নিজের অনেক ত্রুটি রেগে গিয়ে সংশোধন করে নিতে পারে।

ভয় একটি বিশেষ প্রক্ষোভ যাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে সহজে কাজে লাগান যায়। ভয় পেলে কি কি লক্ষণ দেখা যায়? মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে যায়, জিব শুকিয়ে যায়, মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে, শরীর কাঁপতে থাকে ইত্যাদি।

ভয় পেয়ে মানুষ আত্মসংরক্ষণ করতে শেখে, কিন্তু বার বার ভয় পেয়ে

স্নায়ুর অসুখও হতে পারে। ভয় প্রক্ষোভটিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে কেমন করে প্রয়োগ করবে? (১) শিশুর মধ্যে সাহস, ধৈর্য্য, সংকল্প ইত্যাদি গুণ বিকাশের দিকে নজর রাখলে সহজে সে ভয় পাবে না। (২) কাল্পনিক ভয়ের বস্তু সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা দিতে হবে। (৩) শিশুর মানসিক বিকৃতি (complex) গুলো দূর করে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করলে শিশুকে ভয়ের হাত থেকে বাঁচান যেতে পারে।

ভালবাসা আর একটি প্রক্ষোভ যাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগান যায়। ভালবাসা পায় যে শিশু সে সব সময় হাসিখুশি থাকে, অল্পে সন্তুষ্ট হয়, মনে তার শান্তি থাকে। (১) এমন ভালবাসার পরিবেশ শিক্ষক তৈরী করবেন যাতে করে শিশু তার ভালবাসা ঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারবে। (২) শিশুর ভালবাসা প্রক্ষোভটিকে সৃজনমূলক কাজেও নিয়োগ করা যেতে পারে। তাতে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধিরও সহায়ক হবে।

এইভাবে আরও কোন কোন প্রক্ষোভকে শিক্ষক কাজে লাগাবেন সে সম্বন্ধে তিনি চিন্তা করলে নিজেই নানা উপায় উদ্ভাবন করতে পারবেন।

প্রশ্নাবলী

1. Examine the chief characteristics of Emotion. Show by an example how emotions are conditioned easily.
(C. U. 1971. B. A. H.) (C. U. B. T. 1972)

2. Examine the characteristics of Emotion. Suggest some measures of guiding a child in his emotional difficulty.
(C. U. 1967 B. A.)

3. Write short notes on—Emotions. (C. U. B. T. 1966)

4. Discuss the place of instincts and emotions in the education of a child. (C. U. B. T. 1965)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মনোভাব

মনোভাবের সংজ্ঞা

কোন বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্র করে যে প্রক্ষোভমূলক স্থায়ী প্রবণতা গড়ে ওঠে তাকেই আমরা মনোভাব আখ্যা দিয়ে থাকি। তবে মনোবিজ্ঞানীরা এই প্রবণতাকে নিষ্ক্রিয় মনে না করে এক বিশেষ ধরণের প্রবণতা বলতে চান; এই প্রবণতাটি আমাদের প্রাক্ষোভিক অভিজ্ঞতার সাহায্যে সৃষ্টি হয়। মনোবিদ্ কোলেসনিক বলেন—কোন বিশেষ বস্তু বা ধারণাকে কেন্দ্র করে মানসিক অনুভূতিযুক্ত প্রতিক্রিয়া করার যে মানসিক প্রস্তুতি সেটাই হোল মনোভাব।* জন্মের সময় এই প্রবণতা থাকে না—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই মনোভাব বিকশিত হয়। তাই একে অনেক মনোবিজ্ঞানী অর্জিত গুণ বলতে চান। মনোবিজ্ঞানী অলপোর্ট (Allport) মনোভাব সম্বন্ধে বলেছেন, মনোভাব হোল সেই অর্জিত জৈব-মানসিক প্রস্তুতি যা ব্যক্তির বস্তুমুখী প্রতিক্রিয়ার শক্তি জোগায় বা তার গতি নির্দিষ্ট করে। এই সংজ্ঞা থেকে বোঝা যাচ্ছে এটা একটা জৈব-মানসিক প্রস্তুতি—আর এই প্রস্তুতি ব্যক্তিকে তার বৌদ্ধিক ও সামাজিক কাজে প্রেরণা জোগায়।

মনোভাবের প্রকৃতি।

সাধারণভাবে আমরা অনুরাগ (interest) ও মনোভাব (attitude) আলাদা করতে পারি না। কারণ দুটোই বস্তুকেন্দ্রিক, অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত, জৈব-মানসিক প্রক্রিয়া যা আমাদের কাজেই প্রেরণা জোগায়।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানীদের সন্ধানী দৃষ্টি অনুরাগ ও মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বার করেছেন। মনোবিজ্ঞানী স্ট্যানলী গ্রে বলেছেন—অনুরাগ কোন ব্যক্তির ইচ্ছার, পছন্দ ও অভাবের সঙ্গে জড়িত; কিন্তু মনোভাব সমগ্র পরিস্থিতি সম্বন্ধে ধারণা করে ও মূল্যায়ন করে।**

---

* "An attitude is an emotionally toned pre-disposition to react in a certain way towards a person, an object an idea or a situation."—

Kolesnik : Educational Psychology.

** "Interest is closely associated with one's desires, likes and wants, attitudes refers to one's appraisal of evaluation of an idea or situation."

Stanly Gray.

প্রকৃতপক্ষে অনুরাগ ও মনোভাব যদিও পরস্পর নির্ভরশীল নয় তবুও উভয়েই শিখনের বিষয়বস্তু নির্বাচনে সাহায্য করে।

মনোভাবের প্রকৃতির মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন—গতি, তীব্রতা, বিস্তৃতি এবং স্থায়িত্ব। গতি বলতে বোঝায় কোন জিনিষের প্রতি এই মনোভাব ভালর দিকে না মন্দের দিকে। যেমন, বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী শিশুদের ভাল লাগছে না মন্দ লাগছে। তীব্রতা বলতে বোঝায় এই মনোভাব কতখানি গভীর—বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া কেমন। যেমন, পাঠ্যসূচী হয়তো কারও ভাল লাগছে না; এই ভালো না লাগাটা কতখানি? সে কি ভাল না লাগা সত্ত্বেও পড়াশুনা চালিয়ে যাবে না বন্ধ করবে—তা নির্ভর করবে তার মনোভাবের তীব্রতার উপর। মনোভাবের বিস্তৃতি দেখা যায় যখন একটি জিনিষের প্রতি মনোভাব সমজাতীয় জিনিষের প্রতি বিস্তারলাভ করে। ধরা যাক, কোন একজন শিক্ষকের প্রতি কোন শিশুর বিরূপ মনোভাব হোল। এই মনোভাবের ফলে শিশুটির যদি সমস্ত শিক্ষকের প্রতি মনোভাব বিরূপ হয় তাহলে বোঝা যাবে মনোভাব বিস্তার লাভ করল। সব শেষে বিচার করে দেখতে হবে এই মনোভাব কতক্ষণ স্থায়ী হবে।

মনোভাবের বিকাশ।

একেবারে জন্মের সময় শিশুর মনোভাব বলে বিশেষ কিছু থাকে না। সাধারণত আনন্দ বেদনার মধ্যে তার মনোভাব সীমাবদ্ধ থাকে। পরে শিশুর মনোভাব পরিবেশের সাথে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। চিন্তাশক্তির বিকাশের সাথে সাথে শিশুর মনোভাবের পরিবর্তন হ'তে থাকে। অভিজ্ঞতাও মনোভাব পরিবর্তনে অনেকখানি সাহায্য করে।

শিক্ষা ও মনোভাব।

মনোভাব অভিজ্ঞতার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে, আর শিক্ষা হোল অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন প্রক্রিয়া; সুতরাং শিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিশুর মনোভাব গড়ে তোলা যায়। অভিজ্ঞতাও মনোভাবকে প্রভাবিত করে; শিক্ষার্থী যাতে ঠিকভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে সেদিকে বিশেষ যত্নবান হবেন শিক্ষক। বিদ্যালয়ে শিশুর কোন জিনিষের প্রতি যদি কোন কারণে বিরূপ মনোভাব গড়ে ওঠে তবে তা অনেকদিন স্থায়ী হয়। তাই শিক্ষক প্রতিটি জিনিষ শিশুদের

সামনে এমনভাবে বিশ্লেষণ করে উপস্থিত করবেন যাতে তারা সমস্ত জিনিষটার সামগ্রিক ছবি দেখতে পায় ও যথাযথ মনোভাব গঠন করে।

শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয়ের প্রতি আকর্ষণমূলক মনোভাব গঠন করতে পারলে শিখনের খুব সুবিধা হয়; তা যদি না হয় তবে শিখন ব্যাহত হতে বাধ্য। বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের মাধ্যমে যদি শিশুর প্রাথমিক চাহিদাগুলি মেটান যায় তবে শিক্ষার প্রতি শিশুর ভাল মনোভাব গড়ে উঠবে—তাতে আর সন্দেহ কি? তাছাড়া শিক্ষা পরিস্থিতিতে শিক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা যাতে আনন্দদায়ক হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশ করতে হলে তার সামাজিক বিকাশ অবশ্যই এর মধ্যে পড়ে। এই সামাজিক বিকাশের ব্যবস্থা করতে হ'লে সামাজিক মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু সামাজিক মনোভাব কেমন করে গড়ে উঠবে? সামাজিক রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠান ও সমাজের মানুষের প্রতি যথাযথ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলে তবে সামাজিক মনোভাব আস্তে আস্তে গড়ে উঠবে আর এই সামাজিক মনোভাবই হবে শিশুর সামাজিক বিকাশের প্রধান সহায়ক।

তাছাড়া শিক্ষার সাহায্যে শিশুর মনোভাবের পরিবর্তন অবশ্য করণীয়। এর জন্যে শিক্ষককে কতকগুলি নীতি অবলম্বন করতে হবে। যেমন,

(১) শিশুর মনোভাব পরিবর্তন করার আগে শিক্ষক বুঝতে চেষ্টা করবেন যে শিশুর মনোভাবের তীব্রতা কতখানি। মনোভাব খুব তীব্র হলে পরিবর্তন প্রায় অসম্ভব হ'য়ে পড়ে।

(২) যে শিক্ষকের প্রতি শিশুর বিরূপ মনোভাব নেই, তিনিই কেবল শিশুর মনোভাব পরিবর্তন করতে সমর্থ হবেন।

(৩) মনোভাব পরিবর্তনের জন্য শিক্ষক যুক্তি তর্কের অবতারণা করতে পারেন আবার প্রাক্ষোভিক আবেদনও করতে পারেন।

(৪) মনোভাবের পরিবর্তনের পথে কেবলমাত্র উপদেশ কার্যকরী হবে না। বিভিন্ন কাজে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করে মনোভাব পরিবর্তনে সাহায্য করতে পারেন শিক্ষক।

(৫) বিশেষ মনোভাবকে পরিবর্তিত করতে হলে শিক্ষক পরিবর্তিত মনোভাবের উপযোগিতা সম্বন্ধে শিশুদের ধারণা দেবেন।

(৬) অনেক সময় শিশুর সঙ্গীসাথীর দল বদল করেও এ বিষয়ে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

(৭) কোন জিনিষের প্রতি শিক্ষকের নিজের বিরূপ মনোভাব থাকলে তিনি কিন্তু শিশুর মনোভাব ভাল করতে পারবেন না। কাজেই তাঁর নিজের মনোভাবকে ভাল করে বুঝে তবেই শিক্ষক শিশুর মনোভাব পরিবর্তনের কাজে নামবেন।

প্রশ্নাবলী

1. Define attitude. Discuss the importance of attitude in the education of the children.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
অভ্যাস

অভ্যাসের স্বরূপ

আমরা তো জীবনের অনেক কাজ করে চলেছি। কিন্তু আমাদের সব কাজের ধরণ কি এক রকম ? না—আমরা কোন কোন কাজ করি প্রবৃত্তির বশে অতি সহজে, আবার কোন কোন কাজ করার জন্য আমাদের বেশ চেষ্টা করতে হয়। এই চেষ্টা করার জন্য প্রথম প্রথম আমাদের যতটা শক্তিক্ষয় করতে হয়, পরে কিন্তু ততটা হয় না, কাজটা অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে যায়। এর কারণ কি ? এর কারণ অভ্যাস। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অভ্যাস হোল একটি উদ্দীপকের সামনে সাড়া দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া যা বারবার করার ফলে অভ্যাসে পরিণত হয়। কোন কাজ একবার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে—এর জন্য কোন বিচারবুদ্ধি মনোযোগের দরকার হয় না—এটি স্বয়ংক্রিয় হ'য়ে ওঠে। অভ্যাসজাত প্রতিটি কাজ অর্জিত। কিন্তু কোন কাজ অভ্যাসে পরিণত হলে যেন মনে হয় স্বতস্ফূর্ত কাজ। যেমন হাঁটা, সাঁতার কাটা, টাইপকরা, দৌড়ান ইত্যাদি।

অভ্যাস গঠনের প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে নানারকম যন্ত্রপাতির সাথে মানুষকেও সমান তালে চলতে হবে। তাই তার কাজের গতিও বাড়াতে হবে অথচ যন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার কাজটি নিখুঁত হওয়াও প্রয়োজন। অভ্যাস গঠন করতে হ'লে কোন ভাল কাজ নিয়মিত অভ্যাস করা উচিত। মন্দ কাজ অভ্যাস করলে আমাদের নানা রকম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন, রোজ ভোরে ওঠা অভ্যাস করলে ভাল হয়, কিন্তু চুরি করা অভ্যাস করলে ব্যক্তিগত ও সমাজগত ক্ষতি অর্থাৎ দুদিক থেকে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই বলা হয়—"Habit is our best friend and worst enemy." অনেকে মনে করেন মানুষ মাত্রেই অভ্যাসের দাস। আমাদের অনেক কাজই আবেগমূলক। বুদ্ধিমূলক কাজকে আমরা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলি।[1]

অভ্যাসের সংজ্ঞা

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী অভ্যাস সম্বন্ধে নানারকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন, থর্ণডাইক বলেছেন 'অভিজ্ঞতা অনুশীলন বা শিখনের ফলে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে আয়ত্ত প্রতিক্রিয়াই হোল অভ্যাস। মনোবিজ্ঞানী মাগের বলেছেন একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়াকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন করার কৌশলই হোল অভ্যাস। অলপোর্ট বলেন—'অভ্যাস হোল এক ধরণের সঙ্গতিপূর্ণ অনুবর্তিত প্রক্রিয়া যার পরিধি বেশ বিস্তৃত অথচ একই ধরণের উদ্দীপকের সামনে এক রকম আচরণ করতে আমাদের বাধ্য করে'।

অভ্যাসের বৈশিষ্ট্য

এবার আমরা দেখব অভ্যাসের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি কি।

অভ্যাসের প্রকৃতি থেকে আমরা এটুকু জেনেছি যে অভ্যাস একটি ঐচ্ছিক কর্ম ও বার বার অনুশীলনের ফলে প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এটি গঠিত হয়। অভ্যাসজাত আচরণকে অন্যান্য আচরণ থেকে

1 Personality is clothed in habits. Habits are the very garments of the soul. Automatic response to specific situations, acquired normally as a result of repetition and hearning, strictly applicable only to motor responses, but, often applied more widely to habits of thoughts.

Dictionary of Psychology.

আলাদা করা যায়। কিসের সাহায্যে আমরা আলাদা করতে পারি? নিশ্চয়ই অভ্যাসের মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি এই পৃথকী-করণে সাহায্য করে। এখন দেখব সেই বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি।

অভ্যাসের প্রকৃতি থেকে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে দেখান যায়। যেমন অভ্যাস (১) পুনঃপুন অনুশীলনের ফলে অর্জিত গুণ, (২) এটি একটি যান্ত্রিক ও স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া, (৩) একই পরিবেশে এটি সংঘটিত হয়, (৪) মনঃসমীক্ষকদল এর সাথে আর একটি গুণ যোগ করে বলেন, অভ্যাস হোল আবেগ সঞ্জাত। প্রত্যেক অভ্যাসের পশ্চাতে কোন-না-কোন আবেগ থাকে! মনঃসমীক্ষক দল বলেন—'There is no such thing as pure habit, unalloyed with emotion. Behind and beneath every habit, is an emotion.'

এছাড়া অভ্যাসের আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন—

(১) সমতা (Uniformity)—অভ্যাসমূলক আচরণের পুনরাবৃত্তি আমরা একইভাবে করি; এর মধ্যে পরিবর্তনশীলতা নেই বলে পরিবেশের সাথে অভিযোজন করতে অভ্যাস সাহায্য করে না। ইচ্ছামূলক কাজ আমরা নানা ভাবে করার সুযোগ পাই। কিন্তু অভ্যাসমূলক কাজের মধ্যে একটা সমতা লক্ষ্য করা যায়—একই পরিবেশে একই ভাবে এটি সংঘটিত হয়।

(২) সম্পাদনের ক্ষিপ্রতা (Promptness of execution)—অভ্যাস-মূলক কাজের জন্য আমাদের বিশেষ চিন্তা ভাবনা করতে হয় না। কোন কাজ একবার অভ্যাস হয়ে গেলে খুব তাড়াতাড়ি এটি করা যায়। কাজটি যত অভ্যাস হতে থাকবে, কাজের দ্রুততা তত বাড়বে।

(৩) সঠিক কর্মসম্পাদন (Accuracy of performance)—অভ্যাস-মূলক কাজ যে কেবল তাড়াতাড়ি করা যায় তাই নয়, অনেক সময় কোন কাজ তাড়াতাড়ি করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু অভ্যাস যদি দৃঢ়মূল হয় তবে তাড়াতাড়িও কাজটি করা যায়, অথচ নির্ভুলভাবে করা যায়।

(৪) মনোযোগ নিরপেক্ষ (Independence of attention)—

Habit is "a tendency of an organism to behave in the same way as it has behaved before."—James

'Habit is well learned performance' - Woodworth.

Tichner defines habit as 'a tendency of a thing to be or not to be now what it was or did on some previous occasion.'

অভ্যাসজনিত কাজটি সম্পাদনের জন্য প্রথম প্রথম আমাদের মনোযোগ দিতে হয় বটে কিন্তু পরে আর তার প্রয়োজন হয় না, বরং মনোযোগ দিলে কাজটি ব্যাহত হয়, কারণ কাজের ক্ষিপ্রতা কমে যায়। এটিকে স্বয়ংক্রিয় বলা চলে। এই স্বয়ংক্রিয়তার (automatisation) ফলে কাজটি শুধু যে ক্ষিপ্র ও নির্ভুল হয় তাই নয়, এর একটা ব্যবহারিক দিকও থাকে।*

(৫) প্রবণতা (Propensity)—আমাদের যখন কোন কাজ অভ্যাস হয়ে যায় তখন সেই কাজটি অন্য কাউকে করতে দেখলে আমাদের মনেও সেই কাজটি করার জন্য প্রবল ইচ্ছা জাগে। কোন পানখোর অন্য কাউকে পান খেতে দেখলে নিজের পান খাওয়ার ইচ্ছাকে আর দমন করতে পারে না।**

(৬) আয়াস ও স্বাচ্ছন্দ্য (Ease and Facility)—ঐচ্ছিক বা সমস্যা-মূলক কাজ করার সময় আমাদের দেহমন কিছুক্ষণ পরে অবসন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু কাজটি অভ্যাসজনিত হলে আমরা বেশ স্বচ্ছন্দে ও অল্প কষ্টে কাজটি করে ফেলতে পারি। যেমন কয়লাখনির কাজ খুব কষ্টকর কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেলে বেশ সহজেই এটি করা যায়।

(৭) প্রতিরোধ (Resistance)—কোন একটি কাজের অভ্যাস একবার হয়ে গেলে সেটি সহজে ত্যাগ করা যায় না, কাজেই অভ্যাস গঠন করার সময় খুব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। সু অভ্যাস যেমন উপকারী, কু অভ্যাস তেমনই ক্ষতিকর। অনেকে খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করার সময় একটা একটা করে মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলে। কিন্তু এটিতে মাথায় টাক পড়ার উপক্রম হলে এটি থেকে সে বিরত থাকতে চায়—কিন্তু দেখা যায় কাজে তেমন মন বসছে না। এই সব কারণে অভ্যাস গঠনের সময় সতর্কতার এত প্রয়োজন।

অভ্যাসের সুবিধা

কিন্তু কোন কাজ অভ্যাসে পরিণত হলে আমাদের কি কি সুবিধা হয়?

(১) অভ্যাস শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপচয় বন্ধ করে,

(২) অভ্যাস গঠনের ফলে ক্লান্তি কমে যায়,

(৩) আচরণ সহজ সরল হয়,

* "Automatisation is essential not only for speed and accuracy but for the functional use of the skill." Lawther, J. D.

** (1) "We are prone to do what we are used to do"—Stout.

(2) "Habits may be compared to well worn-out channels along which our vital energy flows when released."— Gault & Howard.

(৪) অভ্যাসের ফলে আচরণটি নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হয়।

(৫) উন্নততর মানসিক ক্রিয়া যেমন বুদ্ধি, মনোযোগ ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না; কাজেই এগুলি মুক্ত থাকে।

(৬) কতকগুলি ভাল অভ্যাস গঠন করতে পারলে সুচরিত্র গঠনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়।

অভ্যাসের কতকগুলি অসুবিধার দিকও আছে। যেমন—

(১) অভ্যাসজাত আচরণ খানিকটা যান্ত্রিক, এর মধ্যে পরিবর্তন বা বৈচিত্র্য না থাকায় কোন নূতনত্বের আস্বাদ পাওয়া যায় না।

(২) এটি বুদ্ধিজাত আচরণের বিপরীতধর্মী আচরণ।

(৩) অভ্যাস একবার গঠিত হলে সহজে তা ত্যাগ করা যায় না।

(৪) অভ্যাস অনুভূতি খানিকটা নষ্ট করে দেয়।

(৫) অভ্যাস মানুষকে রক্ষণশীল হতে সাহায্য করে।

(৬) অভ্যাস অনেক সময় মানসিক উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে।

অভ্যাস, প্রবৃত্তি ও প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Habits, Instincts and Reflex Action)।

এখন আমরা দেখব যে অভ্যাস, প্রবৃত্তি ও প্রতিবর্ত ক্রিয়া অনেকটা এক রকম দেখতে হলেও এরা একেবারে এক কি না।

অভ্যাসের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা জেনেছি যে এটি এক প্রকার অর্জিত অনৈচ্ছিক কর্ম। কিন্তু প্রবৃত্তি ও প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উৎস আমাদের জন্মগত সূত্রে পাওয়া—তাই এরা অনর্জিত অনৈচ্ছিক কর্ম। অভ্যাস বার বার অনুশীলনের দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়। এটি শিক্ষা ও চর্চার ফল। প্রবৃত্তি ও প্রতিবর্ত ক্রিয়া একান্তভাবে জন্মগত।

মনোবিদ্ অলপোর্ট বলেন অভ্যাস কতকগুলি প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সমন্বয়ে গঠিত। কিন্তু তবুও আমরা বলব যে দুটি কাজের উৎস আলাদা। তাছাড়া প্রবৃত্তি ও প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাণীর সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অভ্যাস একই শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেক প্রাণীর একান্ত নিজস্ব ব্যাপার।

অভ্যাসের প্রকারভেদ

অভ্যাস কত রকমের হয় সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সাধারণতঃ অভ্যাসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়—দৈহিক, মানসিক ও আবেগ জনিত অভ্যাস।

তবে কোন একটি অভ্যাসকে অবিমিশ্র অবস্থায় পাওয়া যায় না, যেটিকে আমরা নিছক দৈহিক অভ্যাস বলি, তার পিছনেও মানসিক শক্তির কাজ থাকে। যেমন, হাতের লেখা দৈহিক অভ্যাস হলেও ভাল হাতের লেখা করতে হলে কিছু মানসিক ক্রিয়ার প্রয়োজন।

ব্যক্তির চিন্তা করার অভ্যাস, সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে চিন্তার প্রয়োগ অভ্যাস ইত্যাদিকে মানসিক অভ্যাস আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

আবার কোন বস্তু বা পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ ধরণের আবেগমূলক প্রবণতার সৃষ্টি হয়; বার বার এই কাজ করার ফলে এটি অভ্যাসে পরিণত হয়, একেই আমরা বলি আবেগজনিত অভ্যাস।

এখন প্রশ্ন হোল ভাল অভ্যাস কেমন করে গঠন করা যায়? শিক্ষা ক্ষেত্রে এই অভ্যাসের গুরুত্বই বা কতখানি?

শিক্ষা ও অভ্যাস

আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে দেখা যায় ব্যক্তি ও সমাজ এক সূত্রে বিধৃত হয়ে গেছে। ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশ হলে সমাজেরও বিকাশ হতে বাধ্য। তাই শিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিশুর কতকগুলি সু অভ্যাস গঠন করাই হবে আমাদের প্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য। শিশুর দেহ-মন নমনীয়—এই সময় সু অভ্যাস গঠন করতে পারলে এগুলি তার জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং অভ্যাস গঠনও এই সময় সহজ হবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও কতকগুলি অভ্যাসের একান্ত প্রয়োজন আছে। কোন কিছু শেখার অর্থই হোল কতকগুলি কৌশল আয়ত্ত করা,—কিন্তু কেবলমাত্র কৌশল আয়ত্ত করলেই কাজ শেষ হয়ে যায় না। এগুলি বার বার করে অভ্যাস করে ফেলতে হয়; তবেই কাজটা অনেক সহজ ও কম সময়সাপেক্ষ হয়।

যেমন, কোন ভাষা শিখতে হলে প্রথমে ভাষাটি বলার অভ্যাস করতে হয়, ভাষা বোঝার অভ্যাস করতে হয়, ভাষা পড়ার অভ্যাস ও শেষে ভাষাটি শেখার অভ্যাস করতে হয়—এতগুলি কৌশল আয়ত্ত করলে ও ক্রমাগত এগুলি অভ্যাস করলে তবেই ভাষা শেখা যায়।

আজকাল শিক্ষাকেন্দ্রে যে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় তেমন অগ্রগতি নেই

তার কারণ কি? শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তা করার অভ্যাস, কোন বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার অভ্যাস, পাঠের অভ্যাস ইত্যাদি ঠিকমত গড়ে উঠছে না বলে শিক্ষার কাজ প্রতিপদে ব্যাহত হচ্ছে। কাজেই শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সুগম করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন কতকগুলি সু অভ্যাস গঠন করা।

আবার আমরা যেহেতু সমাজের মধ্যে বাস করি—সমাজের মানুষের কতকগুলি দাবী আমাদের মেনে নিতে হয়—এর জন্যও সু অভ্যাস গঠন করা বিশেষ কার্যকরী। যেমন পরমতসহিষ্ণুতা, সাধারণ সৌজন্যবোধ, সহযোগিতা ইত্যাদির অভ্যাস গঠন করা প্রয়োজন এবং এগুলি শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে অর্জন করতে হয়, কারণ এগুলি দীর্ঘ সময়প্রসূত প্রক্রিয়া।

এইসব দিক থেকে বিচার করে দেখা যায় শিক্ষা ও অভ্যাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অভ্যাসকে বলা হয়—এটা এক ধরণের শিখন প্রক্রিয়া। বাস্তবিক শিখন প্রক্রিয়া শিক্ষাক্ষেত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। অনেকে অভ্যাসকে শিখন প্রসূত বলে বর্ণনা করেছেন। তাই অভ্যাস গঠনের আলোচনা শিক্ষাক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

অভ্যাস গঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব

এখন আলোচনা করে দেখা যাক অভ্যাস গঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব কতখানি.

শিক্ষার মধ্যে দিয়ে যদি অভ্যাস গঠন করতে হয় তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় অভ্যাস গঠনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব শিক্ষকের। অভ্যাস বলতে অবশ্য সু অভ্যাস, কুঅভ্যাস দুই-ই বোঝায়। কাজেই শিক্ষকের দুরকম দায়িত্ব এখানে এসে যাবে। (১) একদিকে শিক্ষককে শিশুর সু অভ্যাস গঠন করতে হবে। (২) অন্যদিকে আবার তাঁকে শিশুর কু অভ্যাসগুলি দূর করতে হবে। একটিতে শিশুর ব্যক্তিত্ব নির্ভর করবে তার সু অভ্যাস গঠনের উপর ও অন্যটিতে কু-অভ্যাস বর্জনের উপর। দুটিই এখানে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

সু অভ্যাস কাকে বলে

আগেই আমরা জেনেছি সু অভ্যাস গঠনের সব চেয়ে ভাল সময় হোল শৈশবকাল, কারণ তখন দেহমন থাকে কোমল ও নমনীয়। এখন প্রশ্ন হোল সু অভ্যাস বলতে আমরা কি বুঝি?

প্রথমতঃ, কতকগুলি দৈহিক সু অভ্যাস আলোচনা করা যেতে পারে

যেগুলি গঠিত হলে শিখন সহজ হয়। যেমন প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে ওঠা, স্বাস্থ্যপ্রদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ব্যায়ামের অভ্যাস, পড়তে বসার অভ্যাস ইত্যাদি।

আবার কতকগুলি মানসিক অভ্যাস গঠন করলে শিক্ষার কাজ ত্বরান্বিত হয়। যেমন মনোযোগের অভ্যাস, পড়ার অভ্যাস, ভালভাবে লেখার অভ্যাস ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে কতকগুলি অবেগজনিত অভ্যাস গঠনের কথাও চিন্তা করতে হয়। যেমন পরোপকারের অভ্যাস, সহযোগিতার অভ্যাস, শিক্ষকের প্রতি ও অন্যান্যদের প্রতি সৌজন্যবোধের অভ্যাস ইত্যাদি।

সু অভ্যাস গঠনের নিয়ম

এইবার দেখা যাক সু অভ্যাস গঠন করতে হলে শিক্ষকের কি করা উচিত। কোন কাজের পিছনে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য না থাকলে কাজটি এলোমেলো হ'য়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই কোন অভ্যাস গঠন করার আগে শিক্ষকের দেখা উচিত—

(১) অভ্যাসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিজে অবহিত হওয়া ও ছাত্রদের অবহিত করান। অভ্যাসটির উপযোগিতা সম্বন্ধেও শিক্ষক ছাত্রদের ঠিকমত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

(২) শিশুর বয়স কম থাকতে থাকতে অভ্যাস গঠনের সুযোগ নেবেন শিক্ষক।

(৩) কোন ভাল অভ্যাস গঠন করতে হলে দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রয়োজন, তা না হলে ছাত্রদের হচ্ছে-হবে মনোভাব থাকলে অভ্যাস গঠনে বিঘ্ন হতে পারে ও অনেক বেশী সময় লেগে যেতে পারে। তাই ছাত্রদের মধ্যে যাতে দৃঢ় সঙ্কল্প জাগে তার চেষ্টা করবেন শিক্ষক।

(৪) অভ্যাস গঠন করতে গিয়ে হাতের কাছে প্রথমে যে সুযোগ আসে সেটাই গ্রহণ করতে হয়।

(৫) অভ্যাস গঠনকালে কোন ব্যতিক্রম করা চলবে না। অভ্যাসের কাজটি মাঝে মাঝে বাদ দিলে অভ্যাস গঠন করতে দেরী হবে।

(৬) কোন কাজকে অভ্যাসে পরিণত করতে গেলে সক্রিয় হ'তে হবে ও বার বার অনুশীলন করতে হবে।

(৭) কোন ভাল অভ্যাসের জন্য পুরস্কারের বা ফলভোগের ব্যবস্থা করলে এ কাজে শিশুদের উৎসাহ বাড়ে।

(৮) শিশুর সু অভ্যাস গঠনের আগে শিক্ষকের ও শিশুর পিতামাতার সু অভ্যাস থাকা চাই। তা না হলে শিশুর সু অভ্যাস গঠন করা কঠিন কাজ হ'য়ে পড়ে।

ধরা যাক, একটি শিশুর ভালভাবে বই পড়ার অভ্যাস গঠন করতে হবে। এর জন্য কি কি করা উচিত? প্রথমে শিশুকে ভাল ভাবে পড়ার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিতে হবে। তাকে প্রতিদিন পড়তে বসাতে হবে, উচ্চারণ শুদ্ধ করে দিতে হবে। শুদ্ধ উচ্চারিত ভাল পড়া বার বার শোনাতে হবে। ধীরে ধীরে পড়ার গতি বাড়াতে হবে। পড়ার জন্য নানান ধরনের বইপত্র, পত্রিকা ইত্যাদি রাখতে হবে। ভাল পড়তে পারলে অন্ততপক্ষে মৌখিক প্রশংসা দেওয়া উচিত।

কু অভ্যাস দূরীকরণে শিক্ষকের দায়িত্ব

এতক্ষণ আমরা সু অভ্যাস গঠনের নানা পদ্ধতির ও প্রক্রিয়ার কথা জানলাম। এবার আমরা দেখব কু অভ্যাস কেমন করে দূর করা যায়। কু অভ্যাস দূর করা একটি কঠিন কাজ। কারণ আমরা আগেই জেনেছি যে অভ্যাস একবার গঠিত হ'লে সহজে তা দূর করা যায় না। তাছাড়া কু অভ্যাসের প্রতি মানুষের গভীর স্পৃহা থাকে। সে ক্ষেত্রে কু অভ্যাস ত্যাগ করা কঠিনতর হ'য়ে দেখা দেয়।

শিশু যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন বাড়ী থেকে সে কতকগুলি অভ্যাস গঠন করেই আসে। শিশুর গৃহ পরিবেশের উপর শিক্ষকের প্রভাব আর কতটুকু?

এ ক্ষেত্রে শিশুর অভ্যাস সম্বন্ধে শিক্ষককে খুব বেশী সচেতন হ'তে হবে। প্রথমে বুঝতে হবে ও বোঝাতে হবে কোনগুলি শিশুর সু অভ্যাস ও কু অভ্যাস।

শিক্ষক শিশুর কু অভ্যাস দূর করতে গিয়ে এমন আচরণ করবেন না, যাতে শিশুর ব্যক্তিত্বের ক্ষতি হয়। শিক্ষক প্রয়োজনবোধে, শিশুর কু অভ্যাস দূরীকরণে শিশু-মনোবিজ্ঞানীর সাহায্য নেবেন।

কু অভ্যাস দূর করতে গিয়ে শিক্ষক শিশুকে কোন অবস্থায় তিরস্কার করবেন না।

শিশুর কু অভ্যাসের কারণগুলি শিক্ষক খুঁজে বার করার চেষ্টা করবেন। কারণগুলি জানা থাকলে সেগুলি দূর করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

কারণ জানার পর কু অভ্যাসের কুফল সম্বন্ধে শিক্ষক শিশুকে অবহিত করবেন। যেমন অনেকে জিবে হাত লাগিয়ে তারপর বই এর পাতা উন্টায়। এতে প্রথমে যে পাতা উন্টাচ্ছে বার বার মুখে হাত দেওয়ার দরুণ তার মুখের মধ্যে ময়লা যাচ্ছে আর তার কোন রোগ থাকলে তা বইয়ের পাতায় লেগে আরও পাঁচজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। কাজেই এটি একটি অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস। এটা শিশুকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

সু অভ্যাস গঠনের সময় যেমন দৃঢ় মনোভাব প্রয়োজন, কু অভ্যাস দূর করার সময়ও তেমনি মনোভাব দৃঢ় থাকা উচিত। একটু শৈথিল্য দেখা দিলে কিন্তু কু অভ্যাস সহজে ছাড়ান যাবে না। কাজেই সে দিকেও শিক্ষক সতর্ক থাকবেন।

সবশেষে বলা যায় শিক্ষকের ও শিশুর পিতামাতার যেন কু অভ্যাস না থাকে। যদি থাকে তবে তা শিশুর জীবনে ছায়া ফেলবেই। শিশু অবচেতন মনে সেই কু অভ্যাসগুলি গ্রহণ করবে।

আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে কু অভ্যাসের বিপরীত অভ্যাস গঠন করেও শিশুকে সাহায্য করা যায়।

কু অভ্যাস দূর করার জন্য ক্লান্তিকর পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। কাজটি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলে কাজটি করতে বিরক্তি আসবে। Dunlap 'The' লিখতে 'hte' লিখতেন। একদিন তিনি ৫০০ বার 'hte' লিখলেন পরে দেখলেন আর ভুল হচ্ছে না।

কু অভ্যাস যাদের আছে তাদের আত্মসমালোচনা করতে বলা যেতে পারে। অবশ্য একটু বড় না হলে শিশু এটা ঠিকমত করতে পারবে না। বড় হলে যখনই বুঝবে এটা খারাপ, তখনই সে অভ্যাসটি ত্যাগ করবে।

পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে কু অভ্যাস দূর করা যায়। সঙ্গদোষে কেউ যদি গালাগাল শেখে তবে অন্যত্র শিশুকে সরিয়ে দিলে সুফল পাওয়া যায়।

সামাজিক উদ্দীপকের সাহায্যে কু অভ্যাস অনেক সময় দূর করা যায়। সমাজের আর পাঁচজন এই অভ্যাসকে ভাল বলছে না এটা শিশুকে বোঝাতে হবে।

এসবের জন্যই শিশুর দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন। কু অভ্যাস

অনেক দিন অনুশীলন না করলে, বা খারাপ ফল পেলে শিশু এই অভ্যাস থেকে বিরত থাকে।

শিক্ষক মৌখিকভাবে আবেদন করবেন যাতে শিশু অভ্যাসটি ত্যাগ করে। শিক্ষক শিশুকে এ বিষয়ে ঠিকভাবে পরিচালিত করবেন (proper guidance)।

কাজেই দেখা যাচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থাকে আদর্শ করতে হলে শিখনকে কাজে লাগাতে হলে অভ্যাস অনেকখানি সাহায্য করে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে অভ্যাসের অবদান সম্বন্ধে প্রত্যেক শিক্ষকের সম্যক্ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

প্রশ্নাবলী

1. State the laws of habit formation. Show how a bad habit can be eradicated. (C. U. B. A. H. 1972)

2. What are the conditions of habit formation? How can you develop the reading habit in pupils?

(C. U. B. A. 1963)

3. What are habits? How are they distinguished from instincts? State the laws of habit formation.

(C. U. B. A. 1965)

4. Bring out the uses and abuses of habit formation. What useful habits should be formed in School Children?

(C. U. B. A. 1967)

প্রথম পরিচ্ছেদ
সেন্টিমেণ্ট

আমরা সেন্টিমেণ্ট কথাটিকে অনেক সময় খুব হাল্কাভাবে ব্যবহার করি ; কিন্তু মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কথাটির তাৎপর্য অনেক ব্যাপক। সেন্টিমেণ্ট কথাটির দ্বারা ব্যক্তির মানসিক প্রবণতা বোঝায়। আবেগের সঙ্গে সেন্টিমেণ্ট ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত—কিন্তু আবেগ থেকে সেন্টিমেণ্টের ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক। মনোবিজ্ঞানী শ্যাণ্ড বলেছেন—বিশেষ কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে আমাদের প্রক্ষোভমূলক আচরণগুলো যে মানসিক সংগঠন সৃষ্টি করে তাই হোল সেন্টিমেণ্ট।*

মানুষ কতকগুলো সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং এই প্রবৃত্তির সাহায্যেই সে নতুন নতুন পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা করে, নতুন পরিবেশে প্রবৃত্তিরও পরিবতন হয়। পরিবেশের সাথে সংহতি বিধানের সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিশেষ প্রক্ষোভগুলো বিশেষ বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে নিয়ন্ত্রিত হয় ও উন্নত হয়। এই যে প্রক্ষোভ-মূলক প্রবণতা একেই সাধারণ অর্থে বলা হয় সেন্টিমেণ্ট। ম্যাগডুগাল বলেছেন—কোন বস্তু-নির্ভর অভিজ্ঞতার সাহায্যে কোনো বস্তুর প্রতি, ব্যক্তির যে মানসিক প্রবণতা তাকেই বলা হয় সেন্টিমেণ্ট। (Sentiment involves an individual tendency to experience certain emotions and desires in relation to some particular object).

সেন্টিমেণ্টের স্বরূপ ও প্রকৃতি

সেন্টিমেণ্টের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে হলে অন্যান্য মানসিক প্রবণতাগুলির সাথে এর কোথায় মিল ও কোথায় পার্থক্য তা জানা প্রয়োজন, যেমন ধরা যাক, প্রক্ষোভের সঙ্গে সেন্টিমেণ্টের সম্বন্ধ কেমন। প্রক্ষোভ হোল অভিজ্ঞতামূলক কাজ কিন্তু সেন্টিমেণ্ট হোল অভিজ্ঞতামূলক সংগঠন ;

---

*Shand defines sentiment as "an organised system of emotional tendencies centered about some objects...."

According to Ross—"It is an acquired organisation of dispositions in the mental structure."

"When emotions are organised round about things, persons and ideas, sentiments are formed."

অভিজ্ঞতার পরিবর্তন হয় কিন্তু সংগঠনের পরিবর্তন হয় না। ম্যাকডুগাল বলেছেন প্রবৃত্তিমূলক কাজ (instinctive behaviour) ও প্রবৃত্তির (instinct) মধ্যে যে সম্পর্ক প্রক্ষোভ ও সেন্টিণ্টের মধ্যে সেই সম্পর্ক বিদ্যমান। মনোবিজ্ঞানী ভ্যালেণ্টাইন সেন্টিমেণ্টকে "স্থায়ী সংগঠন" বলার পক্ষপাতী।

প্রবৃত্তির সঙ্গেও সেন্টিমেণ্টের খানিকটা সাদৃশ্য থাকলেও আমরা জানি প্রবৃত্তি হোল সহজাত মানসিক প্রবণতা।

সেন্টিমেণ্টকে আরও ভালভাবে জানতে হলে সেন্টিমেণ্ট ও কমপ্লেক্স-এর একটা সম্পর্কের কথা জানা প্রয়োজন। কমপ্লেক্স ও সেন্টিমেণ্টকে মানসিক সংগঠনের দিক থেকে অনেকটা এক মনে হয়,—কারণ উভয়েই কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। দুটির মধ্যে আপাত সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্যও প্রচুর আছে। কামপ্লেক্স হোল অবচেতন মনের সংগঠন; সুতরাং কমপ্লেক্স অবচেতন মনের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তি তার সম্পর্কে সচেতন থেকে কিছু করে না, কিন্তু সেন্টিমেণ্ট ব্যক্তির সচেতন মনের উপাদান। সেইজন্য ব্যক্তি তার ত্রুটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকে। ফ্রয়েডপন্থীরা বলেন কমপ্লেক্স একরকম মানসিক অসুস্থতার সৃষ্টি করে কিন্তু সেন্টিমেণ্ট মানসিক বিকাশে সাহায্য করে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি সেন্টিমেণ্টকে কেন্দ্র করে এক ধরনের অভ্যাস-মূলক আচরণ ব্যক্তির মধ্যে গড়ে ওঠে। এই অভ্যাস গড়ে না উঠলে সেন্টিমেণ্ট যেন ক্রমে তার সক্রিয়তা হারিয়ে ফেলে ও পরে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

সেন্টিমেণ্ট সব সময় যে মূর্ত জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তা নয়,—বিমূর্ত ধারণাকে কেন্দ্র করেও সেন্টিমেণ্ট গড়ে উঠতে পারে। তবে প্রথমে কোন এক বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্র করে, তারপর কোন এক শ্রেণীর বস্তুকে কেন্দ্র করে ও সব শেষে বিমূর্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে ও বিকাশ লাভ করে।

সেন্টিমেণ্টের বিকাশ

কিন্তু সেন্টিমেণ্ট কেমন করে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে? প্রথমে কোন জিনিষকে ভাল করে দেখতে হবে, কারণ সেই জিনিষ সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। এর পরের স্তরে আছে ভাবমূলক অনুভূতি। তাই প্রথম স্তরকে

বলা হয় প্রত্যক্ষণমূলক, দ্বিতীয় স্তরকে বলা চিন্তনমূলক ও তৃতীয় স্তরটি হোল ভাবমূলক স্তর।

প্রথমে শিশু যখন জন্মায় তখন নানান জিনিষ দেখে সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এ সময় সহজাত প্রবৃত্তি খুব সক্রিয় থাকে এবং এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলি পরস্পর বিরোধী, বিক্ষিপ্ত ও অসংহত অবস্থায় থাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বিক্ষিপ্ত বিরোধী প্রক্ষোভগুলো একত্রিত হ'তে থাকে।

পরবর্তী স্তরে শিশুর চিন্তন প্রক্রিয়ার বিকাশ হয়। মনোবিজ্ঞানী ড্রেভার বলেন এই সময় থেকে সেন্টিমেণ্ট স্রুরু হয়, মন এখানে প্রত্যক্ষণের স্তর থেকে চিন্তনের স্তরে উন্নীত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে সেন্টিমেণ্টের জন্ম হয়। এই স্তরে এলোমেলো সহজাত প্রবৃত্তিগুলি সংঘবদ্ধ ও সুসংহত হয়, এর ফলে মনের মধ্যে একটা ঐক্যের সৃষ্টি হয়। প্রথম স্তরে মায়ের উপস্থিতি ও খাদ্য গ্রহণের আগ্রহকে কেন্দ্র করে শিশুর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অনুভূতিগুলি এই স্তরে অভ্যাসের দ্বারা মায়ের প্রতি ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়। মাকে কেন্দ্র করে চিন্তনের মাধ্যমে শিশুর সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে। মায়ের দুঃখে শিশুর দুঃখ হয়, মায়ের আনন্দে তারও আনন্দ হয়।

ভাবমূলক স্তরে সেন্টিমেণ্টগুলো সাধারণতঃ বিমূর্ত ধারণাকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে ওঠে। যেমন সততা, ন্যায় বিচার, সত্যবাদিতা ইত্যাদিকে ঘিরে সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে। শিশুর সেন্টিমেণ্ট প্রথমে কোন ব্যক্তিকে অনুকরণ করে গড়ে ওঠে, পরে সেই ব্যক্তির গুণকে কেন্দ্র করে সেন্টিমেণ্ট বিকশিত হয়। এই ধরনের নৈতিক সেন্টিমেণ্ট শিশুর চারিত্রিক গুণ বিকাশে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যক্তি জীবনে সেন্টিমেণ্টের প্রকাশ বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভাবে হয়। সেন্টিমেণ্ট গঠনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে সাহায্য করে।

শিক্ষা ও সেন্টিমেণ্ট

এখন আমরা দেখব শিক্ষার ক্ষেত্রে সেন্টিমেণ্টকে কি ভাবে কাজে লাগান যায়। সেন্টিমেণ্টের আলোচনা প্রসঙ্গে ম্যাকডুগাল বলেছেন আত্মবোধের সেন্টিমেণ্ট আমাদের জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যের সঙ্গে মেলামেশার ফলে যখন শিশুর আত্মচেতনা জাগে তখন থেকেই

আত্মবোধের জন্ম হয়। এই আত্মবোধ থেকে আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মমর্যাদা আসে। ম্যাকডুগাল মনে করেন আত্মচেতনাবোধ দুভাবে কাজ করে—আত্মপ্রতিষ্ঠা ও বশ্যতার মধ্যে দিয়ে শিশুর ব্যক্তিসত্তার ভারসাম্য বজায় রাখে ও আত্মবোধের সেন্টিমেণ্টকে প্রতিষ্ঠা করে। যাদের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার সেন্টিমেণ্ট প্রবল থাকে তাদের সেন্টিমেণ্টকে আমরা গর্ব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বলে থাকি। আর যাদের মধ্যে বশ্যতার সেন্টিমেণ্ট অধিক মাত্রায় বর্তমান থাকে তাদের সেন্টিমেণ্টকে বলি হীনমন্যতার সেন্টিমেণ্ট।

তবে আমাদের মনে হয় কোন ব্যক্তির সেন্টিমেণ্ট গঠন প্রক্রিয়া আরও জটিল। ম্যাকডুগালের সঙ্গে আমরা একমত, যখন তিনি বলেন সেন্টিমেণ্ট মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণে ও মানব জীবন বিকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করে। শিক্ষার উদ্দেশ্যই তো ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ও ব্যক্তির কল্যাণের মধ্যে দিয়ে সামাজিক মঙ্গল করা। ব্যক্তির উন্নতি ও সামাজিক মঙ্গল করতে হোলে এমন এক সত্তাকে জাগাতে হবে যা এই দুইয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করে চলবে; এই সমতারক্ষাকারী সত্তাই হোল অহং বা আত্মবোধের সেন্টিমেণ্ট।

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শিশুর মধ্যে এই আত্মবোধের সেন্টিমেণ্টকে ঠিক ভাবে জাগ্রত করা। তবে এই আত্মবোধের সেন্টিমেণ্ট অনেক পরে শিশুর মধ্যে গড়ে ওঠে। তার আগে শিশুর মধ্যে যে যে স্তর আসে সেগুলোকে সাহায্য করা শিক্ষার প্রথম কর্তব্য হওয়া উচিত।

শিশু যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন বিদ্যালয়ের কতকগুলি বস্তুকে কেন্দ্র করে তার সেন্টিমেণ্ট যাতে গড়ে উঠতে পারে তার চেষ্টা করতে হবে। যেমন পাঠ্য-পুস্তকের প্রতি, শিক্ষকের প্রতি, বন্ধুদের প্রতি শিশুর সেন্টিমেণ্ট গড়ে তুলতে পারলে শিক্ষার পথ অনেকটা সুগম হয়। এই স্তরে মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে শিশুর সেন্টিমেণ্ট গড়ে তুলতে হবে।

এর পরের স্তরে শিক্ষক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বস্তুকে বিশ্লেষণ করে এমনভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করবেন যাতে বিভিন্ন বস্তুর সাধারণ গুণ সম্পর্কে তারা ধারণা করতে পারে। এখানে কেবল পাঠ্যপুস্তক বা শিক্ষককে কেন্দ্র করে সেন্টিমেণ্ট গড়ে উঠলে চলবে না—বিদ্যালয়ের প্রতিটা জিনিষের উপর, বিদ্যালয়ের কাজকর্মের উপরও শিশুর সেন্টিমেণ্ট গড়ে তুলতে হবে। এই ভাবে সেন্টিমেণ্ট গড়ে তুলতে পারলে শিশুরা প্রতি কাজে আগ্রহ বোধ করবে ও আনন্দ পাবে—এতে শিক্ষকের পক্ষে পাঠদান করাও বিশেষ সুবিধাজনক হবে।

সব শেষে শিশুর আত্মবোধের স্তরে শিক্ষককে খুব সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। শিশু যাতে আত্মসচেতন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আবার বিমূর্ত বিষয় সম্পর্কে চিন্তন ক্ষমতার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে নৈতিক ও সামাজিক সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে তার দিকেও বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। এই স্তরে নানান ঐতিহাসিক চরিত্র, মহাপুরুষের জীবনী ও শিক্ষকের নিজের জীবনাদর্শ ছাত্রছাত্রীদের সেন্টিমেণ্ট গড়ে তোলার পক্ষে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে। শিক্ষকের নিজের যদি সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি, ধর্মের প্রতি, স্বদেশের প্রতি সেন্টিমেণ্ট থাকে তবে তিনি সহজেই তা বিদ্যার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারবেন।

প্রশ্নাবলী

1. Explain the nature and growth of sentiment. Discuss the view that sentiments are the main constituents of character.

(N. B. U. B. T. '65)

2. What is a sentiment? How is the master sentiment formed? Bring out its importance in the life of a person.

(C. U. B. A. H. '71)

3. Write short notes on 'Sentiment'.

(C. U. B. T., 1965, 70)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মনঃপ্রকৃতি (Temperament)

প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির থেকে আলাদা—কিন্তু কিসের সাহায্যে প্রত্যেকে ব্যক্তি তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে? ব্যক্তির মনোভাব, সেন্টিমেন্ট, প্রক্ষোভমূলক প্রবণতা ইত্যাদি তাকে এ কাজে সাহায্য করে। ব্যক্তি-জীবনের উপর সমাজ-জীবনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তির নিজস্ব সেন্টিমেন্ট মনোভাব ও প্রক্ষোভমূলক প্রবণতা গড়ে ওঠে। এই প্রবণতাগুলো সাধারণভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে একটা স্থায়ী আসন করে নেয়। প্রক্ষোভমূলক প্রবণতার এই যে স্থায়ীরূপ—এটি ব্যক্তির আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়; শুধু প্রকাশই পায় না, প্রক্ষোভমূলক আচরণের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যও লক্ষ্য করা যায়। মানুষের প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যকেই বলা হয় মনঃপ্রকৃতি, মেজাজ বা Temperament. যেমন কোন মানুষ সব জিনিষই সহানুভূতির চোখে দেখে, আবার কেউ হয়তো সব জিনিষ ঘৃণার চোখে দেখে,—এগুলি ব্যক্তির মেজাজের উপরই নির্ভর করে।

মনঃপ্রকৃতির গঠন

এখন প্রশ্ন হোল এই মনঃপ্রকৃতি কেমন করে গঠিত হয়? মনঃপ্রকৃতির গঠন সম্বন্ধে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন মত পোষণ করেন। মনোবিজ্ঞানী থুলেশ (Thouless) বলেন প্রাক্ষোভিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষের মেজাজ সৃষ্টি হয়। মনোবিদ্ অলপোর্ট (Allport) আর একটু পরিষ্কার করে বলেন—মনঃপ্রকৃতি আমাদের দৈহিক গঠনের ওপরে অনেকখানি নির্ভরশীল। আমাদের শরীরে অনেকগুলি রসক্ষরা গ্রন্থি আছে; এই রসক্ষরা গ্রন্থির ও অন্যান্য দৈহিক সংগঠনের কাজের সমতার জন্যই ব্যক্তির প্রক্ষোভমূলক প্রক্রিয়ার স্থায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ সংগঠন গড়ে ওঠে; এইটাই হোল ব্যক্তির মেজাজ বা Temperament।*

---

* "Temperament refers to the characteristic phenomena of an individual's emotional nature, including his susceptibility to emotional stimulus, his customary strength and speed of response, the quality of his prevailing mood; these phenomena being regarded as dependent upon constitutional makeup and therefore largely heredity in origin"...Allport.

অলপোর্টের সংজ্ঞা থেকে মনঃপ্রকৃতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। যেমন এটি প্রক্ষোভমূলক আচরণের একটি বিশেষ প্রকৃতি; এর একটা স্থায়ী রূপ আছে; এটি দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।

এখন আমরা দেখব মনঃপ্রকৃতি কত রকমের হ'তে পারে।

মনঃপ্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে জন্মগত, এ ধারণা সবটা ঠিক একথা বলা যায় না। মনঃপ্রকৃতি যদি আচরণের প্রকৃতি হয় তবে এর ওপর বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব নিশ্চয়ই থাকবে। প্রাচীন দার্শনিকরা যদিও মনে করতেন যে মনঃপ্রকৃতি দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল, তবুও মনঃপ্রকৃতির সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক আছে একথা তাঁরা অস্বীকার করেন নি। প্রাচীন চিন্তাবিদ্দের ধারণা অনুসারে আমাদের মনঃপ্রকৃতি দেহের হিউমারের ওপর নির্ভরশীল। এই মত অনুসারে আমাদের দেহে চার রকমের হিউমার থেকে কয়েক রকমের মনঃপ্রকৃতি সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক উপাদান—বাতাস, মাটি, আগুন ও জল ইত্যাদি যথাক্রমে স্যাঙ্গুইন, মেলাঙ্কলিক, কোলেরিক ও ফ্লেগম্যাটিক ইত্যাদি মেজাজ তৈরী করে।

শিক্ষা ও মনঃপ্রকৃতি

শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব হোল যথাযথ মনঃপ্রকৃতি গঠনে শিশুদের সাহায্য করা। শিশুর প্রক্ষোভমূলক আচরণকে ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে শিক্ষার কাজ অনেক সহজ হয়।

বর্তমানে আমেরিকান শিক্ষাবিদ্গণ মনঃপ্রকৃতির ওপরে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে বলেন—ব্যক্তিসত্তা বিকাশের জন্য ব্যক্তির নিজস্ব যে অবস্থা তাই হোল মনঃপ্রকৃতি। আবার বৃটিশ মনোবিজ্ঞানীরা অনেকে ব্যক্তিসত্তা ও মনঃপ্রকৃতি একই জিনিষ বলে বিবেচনা করেছেন।

এখানে দুটোই চরম মত দেখা যাচ্ছে। কেবলমাত্র মনঃপ্রকৃতি যেমন ব্যক্তিসত্তা বিকাশের মূলকথা নয়, তেমনি আবার মনঃপ্রকৃতি ও ব্যক্তিসত্তা একেবারে এক জিনিষ নয়। তবে ব্যক্তিসত্তাকে বাদ দিয়ে যেমন মনঃপ্রকৃতির কথা ভাবা যায় না, তেমনি মনঃপ্রকৃতিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিসত্তার কথাও চিন্তা করা প্রায় অসম্ভব হ'য়ে পড়ে।

আমরা শিক্ষার সাহায্যে একটি শিশুর ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশ করতে যদি চাই তবে তার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে জড়িত মনঃপ্রকৃতির কথাও নিশ্চয়ই আমাদের চিন্তা করতে হবে। শিক্ষার সাহায্যে মনঃপ্রকৃতির সমাজ

অনুমোদিত পথে কতটুকু পরিবর্তন সাধন করা যায় তাও ভেবে দেখতে হবে। তবে মনঃপ্রকৃতির যে অংশটি জন্মগত তার ওপর বিশেষ কিছু করার নেই; কিন্তু পরিবেশকে শিক্ষা নিশ্চয়ই প্রভাবিত করতে পারে; শিক্ষার সাহায্যে মনঃপ্রকৃতির বিস্তৃতি বাড়ান যেতে পারে। ব্যক্তির সাথে সমাজের সার্থক পরিচয় ঘটিয়ে দিতে পারে শিক্ষা—এর ফলে শিক্ষার্থীর আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তন হবে ও মনঃপ্রকৃতি ঠিকভাবে গড়ে উঠবে।

প্রশ্নাবলী

1. Define Temperament and distinguish it from Personality.

2. Discuss the influence of Temperament on the behaviour of the individual.

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চরিত্র (Character)

'চরিত্র' কথাটিকে আমরা যখন তখন ব্যবহার করে থাকি—কিন্তু এটা যে কি তা বলতে বললে সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকরা চরিত্র বলতে বিশেষ ব্যক্তির বিবরণকে বুঝতেন। কিন্তু বিশেষ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকে ঠিক চরিত্র বলা যায় না। চরিত্র কেবলমাত্র গুণের বিবরণ হতে পারে না; চরিত্র কথাটির গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর চরিত্র সম্বন্ধে কি ধারণা তার সঙ্গে আমাদের পরিচিত হতে হবে।

চরিত্রের স্বরূপ

এখন আমরা দেখব চরিত্র কি? চরিত্রের স্বরূপ বলতে আমরা কি বুঝি?

"Character is personality evaluated and personality is character devaluated." - Allport : A psychological Interpretation.

"Character is the sum-total of man's instinctive Tendencies. It is the sum-total of acquired dispositions, a mental structure which is lasting, enduring and ever influencing conduct." --Mc Dougall.

চরিত্র হোল ব্যক্তিসত্তার মত একটি মৌলিক ধারণা, কাজেই চরিত্রের সংজ্ঞা নির্ণয় করা একটি দুরূহ কাজ। তাই বর্ণনার সাহায্যে একে বুঝতে হবে। খুব সাধারণ কথায় চরিত্র কথাটি "যৌন শুচিতা" অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের ভাষায় চরিত্র কথাটি অনেক ব্যাপক। কোন লোককে যখন চরিত্রবান বলা হয় তখন ধরে নেওয়া হয় তার মধ্যে কতকগুলো সদ্‌গুণ আছে; আবার যখন চরিত্রহীন বলা হয় তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে সদ্‌গুণের অভাব ঘটেছে। কিন্তু মনোবিজ্ঞান বলে চরিত্রহীন বলে কোন কথা থাকতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তিরই চরিত্র বলে একটা জিনিষ থাকবে—তা সে ভালই হোক আর মন্দই হোক। নৈতিক দিক বিচার করলে চরিত্র বলতে সচ্চরিত্রকেই বোঝায়।

অনেক মনোবিজ্ঞানী অবশ্য চরিত্রের আলাদা অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান না। তাঁরা বলেন চরিত্র ও ব্যক্তিসত্তা অভিন্ন, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে মনোবিদ্ অলপোর্ট বলেছেন, দুটি একই জিনিষ—দুই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলে দুটি পৃথক জিনিষ বলে প্রতিভাত হয়। ব্যক্তির মধ্যে কেবলমাত্র গুণগুলির বৈশিষ্ট্যের উপর যখন গুরুত্ব দেওয়া হয় তখন বলা হয় ব্যক্তিত্ব আর এই গুণগুলিতে যখন কোন মূল্য আরোপ করা হয় তখন এটি হ'য়ে যায় চরিত্র।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের পৃথক পৃথক তাৎপর্য আরোপ করেছেন। অনেকে মনে করেন 'চরিত্র' ব্যক্তিসত্তার এক বিশেষ পর্যায়; কাজেই চরিত্র হোল ব্যক্তিসত্তার একটি অংশ মাত্র। ফার্ণল্ড বলেন 'ব্যক্তিসত্তা হোল বুদ্ধি ও চরিত্রের সমন্বয়'। মনোবিদ্ কান বলেন—ব্যক্তিসত্তা চরিত্র, মনঃপ্রকৃতি ও বুদ্ধি দ্বারা গঠিত। কিন্তু ব্যক্তিসত্তা কতকগুলি গুণের যোগফল হোতে পারে না।

উড্‌ওয়ার্থ চরিত্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন—'চরিত্র হোল ব্যক্তিত্বের সেই সব আচরণ যাকে সমাজের মান অনুযায়ী ন্যায়, অন্যায় বলা যায়।' নৈতিক মানের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিত্বকে যখন যাচাই করা হয় তখন তাকে চরিত্র বলা হয়। অনেক সময় চরিত্রকে ধর্মীয় বা লৌকিক আদর্শের মাপকাঠিতে আমরা বিচার করি। জন অ্যাডাম্‌স বলেছেন—"Personality is the moral estimate of the individual, an evaluation." চরিত্র কথাটি নৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।

"Character is the result of habits of thoughts, emotion and will. It is the permanent bent of mind consti'uted by settled habits of will."......

সুচরিত্রের স্বরূপ (Nature of Good Character)

ব্যক্তিসত্তার নৈতিক মূল্যায়নেই চরিত্র কথাটির সার্থকথা ; চরিত্রের আলাদা কোনো সত্তা নেই। ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগুলিকে যখন ব্যক্তিত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয় তখন এটা ভাল কি মন্দ তা আমরা বিচার করি না ; কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে বিচার করতে গেলেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি ভাল কি মন্দ এই প্রশ্নটি বড় হ'য়ে দেখা দেয়।

প্রকৃতপক্ষে চরিত্র একটি আপেক্ষিক শব্দ, যে সব মানের সাহায্যে চরিত্র বিচার করা হয় তা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ; প্রত্যেক সমাজের কিন্তু নিজস্ব কতকগুলো আদর্শ আছে। ব্যক্তিত্বের যে বৈশিষ্ট্যগুলি সেই আদর্শের বিচারে অনুমোদিত সেগুলিকেই সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয় ; আর যে বৈশিষ্ট্যগুলি সমাজের অনুমোদনলাভ করে না সেগুলোকেই আমরা বলি অবাঞ্ছিত। চরিত্র বিচারের মানদণ্ড বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন হলেও সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি মোটামুটি সব সমাজেই একরকম।*

ব্যক্তির চরিত্রের মূল্যায়নের জন্য সাধারণত তিন রকমের আদর্শ ব্যবহার করা হয়। (১) ব্যক্তির নিজস্ব কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যের আদর্শ (২) সমাজের কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যের আদর্শ ও (৩) নৈতিক আদর্শ।

(১) ব্যক্তির নিজস্ব কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্য—প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে নিজের মঙ্গলসাধনের জন্য যে সব বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলিকে সুচরিত্রের পরিচায়ক বলে ধরে নিই। যেমন ব্যক্তির নিজের জীবনের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তির আত্মতুষ্টি ইত্যাদি ব্যক্তিজীবনে একান্তভাবে সবাই কামনা করে। তবে ব্যক্তির নিজস্ব উন্নতির আকাঙ্ক্ষা তখনই সুচরিত্রের লক্ষণ বলে বিবেচিত হবে যখন সমাজের আর দশজনের উন্নতি ব্যাহত না করে নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যাবে ; এক কথায় অন্যের অকল্যাণ না করে নিজস্ব কল্যাণের পথে চালিত হবে। মানসিক স্থৈর্য, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, প্রাক্ষোভিক সাম্য, সংযত আচরণ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি সুচরিত্রের লক্ষণ। এগুলিও ব্যক্তির জীবনে সাফল্য ও আত্মতৃপ্তি এনে দেয়, আবার বিপরীতভাবে বলা যায় দুর্বলচিত্ততা, মানসিক চাপল্য, সঙ্কল্পহীনতা, প্রাক্ষোভিক অসাম্য ইত্যাদি বৈশিষ্টগুলি দুর্বল চরিত্রের লক্ষণ। সুচরিত্রের লক্ষণগুলির মধ্যে আত্মতৃপ্তি একটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য। আত্মতৃপ্তি

---

*"Habits are the foundation of character. Good habits build good character. Conduct is the outer expression of character."………

ছাড়া স্বচরিত্র হতে পারে না। যে সব ব্যক্তি সব কিছু পেয়েও অতৃপ্ত, তাকে স্বচরিত্রের অধিকারী বলা যায় না।

(২) সামাজিক কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্য—প্রত্যেক মানুষ সমাজের মধ্যে বাস করে। কাজেই ব্যক্তির নিজস্ব মঙ্গল, সামাজিক মঙ্গলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সমাজের মধ্যে বাস করতে করতে যৌথজীবনের উপযোগী কতকগুলি সামাজিক সংস্কার ব্যক্তির মধ্যে আপনা থেকেই এসে যায়, যেমন বন্ধুপ্রীতি, স্বার্থত্যাগ, সহানুভূতি, সহযোগিতা ইত্যাদি। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যক্তির মধ্যে থাকলে তার নিজস্ব কল্যাণ হবে ও সঙ্গে সঙ্গে সমাজীবনও সম্পূর্ণ ও সুন্দর হয়ে উঠবে।

(৩) নৈতিক আদর্শের দিক—প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে নিজস্ব কল্যাণসাধক ও সামাজিক কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও এমন কতকগুলি গুণ থাকে যেগুলিকেও স্বচরিত্রের লক্ষণ বলে ধরা হয়। এইগুলিই হোল ব্যক্তিচরিত্রের নৈতিক বৈশিষ্ট্য; যেমন সাধুতা, দয়া, মায়া, কৃতজ্ঞতা, সত্যবাদিতা ইত্যাদি। এই বৈশিষ্ট্যগুলি অনেক সময় ব্যক্তিস্বার্থের বিরোধী হয় কিন্তু তবুও এদের নৈতিক মূল্য বিচার করে এগুলিকে স্বচরিত্রের লক্ষণ বলে বিবেচনা করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে আমরা স্বচরিত্রের অধিকারী বলব তাঁকে যাঁর মধ্যে এই তিন রকমের গুণই কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব ছাড়াই বর্তমান থাকে। অন্তর্দ্বন্দ্ব হওয়া স্বাভাবিক, কারণ তিন রকম গুণের উদ্দেশ্য তিনরকম। কাজেই এই ত্রিমুখী গুণগুলির যিনি যথাযথভাবে সমন্বয় সাধন করতে পারেন, এবং সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে নিজের প্রাক্ষোভিক সমতা বজায় রাখতে পারেন তিনি নিঃসন্দেহে স্বচরিত্রের অধিকারী।

চরিত্রের বিকাশ (Development of Character)

মনোবিজ্ঞানী অলপোর্ট বলেছেন, চরিত্র হোল Personality evaluated —অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তার মূল্যায়িত রূপই হোল চরিত্র। সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে চরিত্রের বিকাশ ব্যক্তিসত্তা বিকাশের নামান্তর।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? চরিত্রের একটা সামাজিক দিক আছে। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন চরিত্র বিকাশের মূলে আছে ব্যক্তির সমাজচেতনা। জন্মের পর থেকেই ব্যক্তিসত্তার বিকাশ শুরু হয়। কিন্তু চরিত্রের বিকাশ তখনই শুরু হতে পারে না, যতদিন না সমাজচেতনার বিকাশ হয়, ততদিন

চরিত্রের বিকাশ সম্ভব নয়। শিশুর সামাজিক ও নৈতিকবোধের উপর চরিত্রের বিকাশ নির্ভর করে।

কোন বয়সে শিশুর মধ্যে এই সমাজচেতনা ও নীতিবোধ জাগ্রত হয় তা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অবশ্য মতভেদ আছে। এক বছর বয়স পর্যন্ত শিশু আত্মকেন্দ্রিক থাকে। দেড় বছর বয়স থেকে শিশু অন্যান্য ব্যক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়। নিঃসন্দেহে বলা যায় এই সময় থেকেই শিশুর সমাজচেতনা জাগ্রত হয় ও চরিত্রের বিকাশও এখন থেকে সুরু হয়।

ম্যাকডুগাল চরিত্র বিকাশের যেভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে তিনি প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি সেন্টিমেণ্টকে ব্যক্তিত্বের একক (uuit) হিসাবে ধরেছেন। তাঁর মতে চরিত্র, প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের বিকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি চরিত্রের বিকাশকে মোটামুটি চারটি স্তরে ভাগ করেছেন।

(১) চরিত্র বিকাশের প্রথম স্তরে শিশুর আচরণ কেবল প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয় এবং পিছনে আনন্দ ও বেদনার অনুভূতি প্রেরণা হিসাবে কাজ করে। যে সব আচরণ আনন্দদায়ক সেগুলি শিশু পুনরাবৃত্তি করে, বেদনাদায়ক আচরণ তারা বর্জন করে।

(২) দ্বিতীয় স্তরে শিশুর সামাজিকতাবোধ জাগে, কাজেই শিশুর আচরণকে সমাজ পরিবেশ প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। এই স্তরে শাস্তি, পুরস্কার শিশুর আচরণকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই সময় মা, বাবা, ঘর, বাড়ী ইত্যাদিকে ঘিরে শিশুর সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে।

(৩) তৃতীয় স্তরে শিশুর বিচার বুদ্ধি জাগ্রত হয়। সব জিনিষকে শিশু বিচার বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে শেখে, চিন্তা ভাবনা ক'রে কাজ করে। এই সময় বিভিন্ন ধরণের সামাজিক অনুশাসন, নিন্দা, প্রশংসা শিশুর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিমূর্ত ধারণা সম্বন্ধে সেন্টিমেণ্ট এই সময় গড়ে ওঠে। যেমন ন্যায়-বিচার, সৌন্দর্যবোধ, সততা ইত্যাদি। এই সেন্টিমেণ্টগুলোকে ম্যাকডুগাল নাম দিয়েছেন নৈতিক সেন্টিমেণ্ট। এগুলির দ্বারা শিশুর উচিত অনুচিত বোধ জন্মায়। নৈতিক সেন্টিমেণ্টের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ম্যাকডুগাল বলেছেন—"Moral sentiments are real and important constituents of character."

(৪) চতুর্থ স্তরে ব্যক্তি নিজের জীবনের আদর্শ স্থির করে নেয়।

অহংসত্তাকে কেন্দ্র করে কতকগুলি প্রবণতা গড়ে ওঠে;—এই প্রবণতাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারলে চারিত্রিক বিকাশ সম্পূর্ণ হয়। এর পরে বিভিন্ন বস্তুকে অহংসত্তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি বিচার করতে শেখে। এই স্তরকে তাই অহংসত্তার বিস্তৃতির স্তর বলা হয়। আত্ম-চেতনার বিস্তৃতি চরিত্র গঠনের একটি বিশেষ অঙ্গ। এই সময় ব্যক্তির ভালবাসা নিজের ছেলেমেয়েদের ছাড়িয়ে সমস্ত মানবশিশুর প্রতি ধাবিত হয়। চরিত্রগঠনের আর একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হোল অহংসত্তার নৈর্ব্যক্তিকতা। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে যাচাই করার ক্ষমতা গড়ে তোলা দরকার। আত্মবোধের চরম অভিব্যক্তি হোল একক জীবনাদর্শ। আত্মবোধ যখন কোন আদর্শকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তখনই বলা হয় চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছে।

শিক্ষা ও চরিত্র (Education and Character)

শিক্ষাক্ষেত্রে চরিত্রের গুরুত্বের কথা মোটামুটি সব শিক্ষাবিদ্ স্বীকার করেছেন; কেউ কেউ আবার বলেছেন শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত চরিত্র গঠন। শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য যে শিক্ষার্থীর চারিত্রিক বিকাশ সাধন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই।

শিক্ষার উন্নতিকল্পে ভারতে যতগুলি শিক্ষা কমিশান গঠিত হয়েছে, বিশেষতঃ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরের শিক্ষা কমিশানগুলি, শিক্ষাক্ষেত্রে চারিত্রিক দৃঢ়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ব্যক্তিসত্তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে আমরা সুচরিত্রের লক্ষণ বলে ধরে নিয়েছি। সুচরিত্র বলতে আমরা বুঝি ব্যক্তির নিজস্ব মঙ্গলের দিক, সমাজের মঙ্গলের দিক ও নৈতিক দিক। এই তিন প্রকার বৈশিষ্ট্যই অভিজ্ঞতার ফলে গড়ে ওঠে। শিক্ষার্থী যাতে বিদ্যালয়ে এই বৈশিষ্ট্যগুলি গড়ে তোলার উপযোগী অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে তার সমস্ত রকমের আয়োজন করতে হবে বিদ্যালয়কে। ব্যক্তিগত দিক থেকে প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা, ধৈর্য, প্রাক্ষোভিক সমতা ইত্যাদির অধিকারী হ'তে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের যদি কাজের সুযোগ করে দেওয়া হয়, তাদের কাজে যদি স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে আত্মকল্যাণমূলক গুণগুলি সহজে বিকশিত হোতে পারে। তাছাড়া দলগত ভাবে কাজ করতে দিলে শিশুদের মধ্যে সামাজিক বৈশিষ্ট্য—বন্ধুত্ব, বিশ্বস্ততা, সহযোগিতা, বন্ধুপ্রীতি, ভদ্রতা ইত্যাদি গুণ ধীরে ধীরে বিকশিত

হয়ে উঠবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক গুণগুলি জাগিয়ে তোলা অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজ। নৈতিক গুণগুলির আভ্যন্তরীণ মূল্য আছে কিন্তু এগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখান শক্ত। শিশুদের জিজ্ঞাসু মনের মত উত্তর অনেক সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন 'সদা সত্য কথা বলিবে'—কথাটি শোনামাত্রই শিশুরা প্রশ্ন করবে—কেন সত্য কথা বলব? সত্য কথা বলে আমার কি লাভ হবে, ইত্যাদি। নৈতিক গুণগুলি শিশু আপনা থেকেই অর্জন করতে পারে যদি শিশু যাকে ভালবাসে তার মধ্যে এই গুণগুলি থাকে ও আচরণে তা প্রকাশ পায়। শিশু যখন বাড়ীতে থাকে তখন মা বাবাকে সে ভালবাসে ও তাঁদের নানা আচরণ অনুকরণ করে, কিন্তু সে যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন শিক্ষককে তারা মা বাবার আসনে বসায় ও তাঁদের আচরণও অনুকরণ করে। কাজেই মা, বাবা, আত্মীয়স্বজন ও বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষক ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে নৈতিক গুণগুলি থাকলে শিশু সহজে তার দ্বারা প্রভাবিত হবে।

এখন দেখা যাক, সুচরিত্র গড়তে হলে বিদ্যালয়ে কিভাবে তা সম্ভব।

(১) নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ—শিশুর মধ্যে সদ্‌গুণের বিকাশ করতে হোলে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে চারিত্রিক বিকাশ ঠিক পথে এগিয়ে চলবে।

(২) উপযুক্ত পাঠক্রম—পুঁথি-নির্ভর, পরীক্ষাসর্বস্ব পাঠক্রমের মধ্যে চারিত্রিক শিক্ষার বিশেষ কোন সুযোগ থাকে না। তাই কর্মকেন্দ্রিক ও মনস্তত্ত্ব নির্ভর পাঠক্রম প্রবর্তন করা উচিত, তার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিকভাবে চারিত্রিক বিকাশ হবে।

(৩) সদাচরণ—আগেই বলেছি শিশুমন অনুকরণধর্মী। চোখের সামনে আদর্শ মানুষ থাকলে, সৎ আচরণ দেখলে শিশু অনুকরণের মাধ্যমে সুচরিত্রের অনেক বৈশিষ্ট্য নিজের অজ্ঞাতসারেই আয়ত্ত করে ফেলবে।

(৪) জীবনচরিত পাঠ—যে সমস্ত ব্যক্তি স্বনামধন্য, নিজের ক্ষেত্রে যশস্বী-দার্শনিক, কবি, দেশপ্রেমিক, সমাজ সংস্কারক ইত্যাদির জীবনী থেকে বিভিন্ন অংশ পাঠ করে শোনালে এই সব ব্যক্তির জীবনের সাথে শিশুর পরিচয় ঘটবে ও তাঁদের চরিত্রের প্রভাব পরোক্ষভাবে শিশুর জীবনে এসে পড়বে।

(৫) বাস্তব শিক্ষা—শিশুমন বাস্তব জিনিষকে আশ্রয় করে সব কিছু শিখতে চায়। নীরস পুঁথির বোঝা তাদের মনে কৌতুহল জাগায় না।

চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখান যায় সেইগুলি দেখাবার চেষ্টা করবেন শিক্ষক।

(৬) সমাজ-চেতনা সৃষ্টি—শিশুর সুচরিত্র গঠন করতে হ'লে নিজের ছাড়া আরও দশজনের কথা ভাবতে শেখাতে হবে। সমাজে নানান রকম লোকের বাস। তাদের প্রত্যেকের ভালমন্দের সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটাতে হবে।

(৭) অন্তর্জাত শৃঙ্খলা—শৃঙ্খলা মানেই হোল অন্তর্জাত। শৃঙ্খলা যদি বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় তবে তা শৃঙ্খলা হবে না, হয়ে যাবে শাসন। শিশুকে নিজের থেকে নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি শিখতে হবে তবেই শৃঙ্খলা তার নিজের ভিতর থেকে জাগবে।

(৮) সহপাঠক্রমের উপর গুরুত্ব দান—আজকাল পাঠক্রম ছাড়াও আরও অনেক বিষয় বিদ্যালয়ের আওতার মধ্যে এসে গেছে। যেমন খেলাধূলা, গানবাজনা, চারুশিল্প, কারুশিল্প, ইত্যাদির ফলে শিক্ষার্থীকে অনেকের সাথে মিশতে হয়, অনেক জিনিষ জানতে হয়, ভাবের আদান-প্রদান করতে হয়। এর ফলেও তার চারিত্রিক বিকাশ ঠিক পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ থাকে।

(৯) গৃহপরিবেশ—চরিত্র গঠনে গৃহপরিবেশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশু বিদ্যালয়ের চেয়ে গৃহপরিবেশেই বেশী সময় কাটায়, তাই শিক্ষক শিশুর গৃহপরিবেশের সাথে পরিচিত হবেন ও সম্ভব হ'লে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করবেন। মা, বাবাকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন। শিক্ষক তাঁর সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু সম্ভব তার মধ্যে দিয়েই শিশুর চরিত্র বিকাশে উৎসাহী হবেন।

প্রশ্নাবলী

1. Define character. How can the home and school help in developing character ?

(C. U. B. A. H. 1972)

2. What are personality & character. How can home & school help in developing character ? (C. U. B. T. 1966)

3. Define character. How would you organise the school environment for the formation of character of your pupils ?

(C. U. B. T. 1972)

4. Elucidate the meaning of the term Personality. And indicate the relation between personality and character.

(C. U. B. A. H 1971)

অষ্টম পরিচ্ছেদ
ব্যক্তিত্ব (Personality)

সাধারণভাবে বলা হয় যে ব্যক্তিত্ব সব ব্যক্তির থাকে না। অল্প কয়েকজন সৌভাগ্যবান মানুষ ব্যক্তিত্বের জোরেই জীবনে সাফল্য ও সম্মান অর্জন করেন। আর যারা ব্যক্তিত্বের মত মূল্যবান সম্পদ থেকে বঞ্চিত হন তারা চিরকাল দুঃখ, দুর্দশার মধ্যে দিয়ে দিন কাটান।

এইরকম ধারণা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও মনোবিজ্ঞান একথা স্বীকার না ; মনোবিজ্ঞান বলে প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তিসত্তার অধিকারী তা সে যেমনই হোক—অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তা দুর্বলই হোক, সবলই হোক, স্ব গবিক হোক, অস্বাভাবিক হোক, সামাজিক হোক, অসামাজিক • হোক, ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তিমাত্রেরই বৈশিষ্ট্য ; তবে এটা নানাভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে।

ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা।

'ব্যক্তিত্ব' বলতে সাধারণভাবে কোন ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় বোঝায়। ব্যক্তিত্বের এক কথায় সংজ্ঞা নির্ণয় খুব দুরূহ কাজ ; • তাই অনেকে নেতি নেতি করে ব্যক্তিত্বকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেন ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র ব্যক্তির কথাবার্তা, চালচলন, ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি, ব্যক্তির চরিত্র ইত্যাদি বোঝায় না। ব্যক্তিত্ব অতিরিক্ত কিছু।

ব্যক্তিত্ব কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হোল personality ; এই কথাটি

ল্যাটিন 'persona' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ হোল মুখোস। প্রাচীনকালে অভিনেতারা যে মুখোস পরে অভিনয় করত তাকে persona বলা হোত। সুতরাং persona কথাটি কোন ব্যক্তির মিথ্যা আবরণকেই বোঝাত—পরে ধীরে ধীরে এই শব্দটির দ্বারা অভিনেতাদের গুণ বোঝাতে লাগল যা বর্তমানে আরও ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে।

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। উডওয়ার্থ বলেছেন—"ব্যক্তিত্ব আচরণের সামগ্রিক পদ্ধতি"। কিন্তু ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ঐক্যসূত্রটি উডওয়ার্থ ব্যাখ্যা করেননি। ওয়াটসানের উদ্দীপক জীবদেহের উপর ক্রিয়া করার ফলে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়—সেই প্রতিক্রিয়ার সমষ্টিই হোল ব্যক্তিত্ব। এই সংজ্ঞায় ব্যক্তির মানসিক ও উদ্দেশ্য-মূলক দিককে অস্বীকার করা হয়েছে। গ্যারেট বলেন "ব্যক্তিত্ব কতকগুলি সহজাত বৃত্তির ক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয়।" এখানে দেখা যাচ্ছে প্রায় সব সংজ্ঞাগুলিই অসম্পূর্ণ—কারণ ব্যক্তির সম্পূর্ণ দিকের প্রতি কোন সংজ্ঞাতে আলোকপাত করা হয়নি। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী অলপোর্ট তাঁর ব্যক্তিসত্তার উপর লেখা বইটি প্রায় ৫০টি সংজ্ঞার উল্লেখ করেছেন যেগুলির মধ্যে প্রচুর বৈষম্য ও বৈচিত্র্য রয়েছে। অলপোর্ট এই বৈষম্যগুলিকে দূর করে ব্যক্তিত্বের একটি ব্যাপক সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, সংজ্ঞাটি হোল—"Personality is the dynamic organisation within the individual of those psycho-physical system that determine his unique adjustment to his environment." অর্থাৎ ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে তার যে অনন্য সঙ্গতিবিধান সেই সঙ্গতিবিধানকে নির্ধারণ করে যে সব জৈবমানসিক সত্তা, ব্যক্তির মধ্যে সেই সত্তাগুলির প্রগতিশীল সংগঠনের নামই ব্যক্তিসত্তা।

ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য।

অলপোর্টের এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে আমরা ব্যক্তিসত্তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। যেমন—

KEMPT : "Personality is the habitual mode of adjustment which the organism effects between its own ego-centric drives and the exigencies of the environment,"

MORTON PRINCE : "Personality is the sumtotal of all the biological innate dispositions, impulses, tendencies, appetites and instincts of the individual and the acquired dispositions and tendencies,"

WOODWORTH : "Personality can be broadly defined as the total quality of an individual's behaviour."

(১) ব্যক্তিসত্তা একটি পরিবর্তনশীল সংগঠন ; সংগঠন বলতে বোঝায়—এটি কতকগুলি উপাদানের যোগফল নয়, উপাদানগুলির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফল। যখন এই সংগঠন ঠিক ভাবে গড়ে ওঠে না তখনই অস্বাভাবিক ব্যক্তিসত্তা দেখা যায়।

(২) ব্যক্তিসত্তার উৎপাদনগুলিকে জৈব মানসিক সংগঠন বলা হয়েছে। জৈব মানসিক বলতে আমরা বুঝতে পারছি যে এটি দেহ ও মন উভয়ের যৌথ প্রক্রিয়ার ফল।

(৩) ব্যক্তিসত্তা বলতে ব্যক্তির আচরণ না বুঝিয়ে আচরণের পিছনে যে সত্তা আছে তাকেই বোঝায়।

(৪) ব্যক্তি যে তার পারিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে তার গুণ, সময়, স্থান ইত্যাদি তাকে অর্থাৎ অন্যের থেকে স্পষ্টতই আলাদা।

(৫) আত্মসচেতনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হোল ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি।

(৬) ব্যক্তিত্ব সদাপরিবর্তনশীল হলেও এর মধ্যে এমন একটি স্থায়িত্ব আছে যা কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে একটা স্থায়ী ধারণা দেয়।

(৭) ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করে সামাজিক পরিবেশে। কাজেই ব্যক্তির আচার, ব্যবহার, কৃষ্টি, ভাবধারা ইত্যাদি সমাজের উপাদানের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়।

ব্যক্তিত্বের উপাদান

এখন আমরা দেখব ব্যক্তিত্বের উপাদান কি কি। ব্যক্তিত্বের উপাদান গুলিকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়—প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত। প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে পড়ে বংশগতি—অর্থাৎ জন্মসূত্রে পাওয়া কতকগুলি বৈশিষ্ট্য, দেহ ও রসক্ষরা গ্রন্থির ক্রিয়া। আর পরিবেশের মধ্যে আছে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের কতকগুলি উপাদান। প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে বোঝায় জল, বাতাস, মাটি, গাছপালা, নদীনালা ইত্যাদি ও সামাজিক পরিবেশ বলতে বোঝায় গৃহ, বিদ্যালয়, সমাজ, ক্লাব, মন্দির, মসজিদ, লাইব্রেরী, সিনেমা ইত্যাদি।

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ (Personality Traits)

কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় তার আচরণের মধ্যে দিয়ে ; এই আচরণকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা ব্যক্তির কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে থাকি। এই বৈশিষ্ট্যগুলিই হোল ব্যক্তির

সংলক্ষণ; যেমন সামাজিকতা, পরিশ্রমশীলতা, দয়া, মায়া ইত্যাদি। এই সংলক্ষণের দুটি দিক আছে—একটি মানসিক, অন্যটি আচরণমূলক। যেমন ভদ্রতা বলতে বুঝি একটা মার্জিত রুচিসম্পন্ন মনোভাব ও শিষ্ট সভ্য আচরণ। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এই সংলক্ষণ কম বেশী পরিমাণে বিদ্যমান। সংলক্ষণগুলি ব্যক্তির জন্মগত প্রবণতা ও পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার ফল। এই সংলক্ষণগুলি মোটামুটিভাবে স্থায়ী।

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের স্থায়িত্বের উপর নির্ভর ক'রে মনোবিজ্ঞানী ক্যাটেল সংলক্ষণগুলিকে দু ভাগে ভাগ করতে চান। (১) বাহ্যিক সংলক্ষণ (Surface traits) (২) আভ্যন্তরীণ সংলক্ষণ (Source traits)। বাহ্যিক সংলক্ষণের মধ্যে পড়ে সাহসিকতা, সামাজিকতা ইত্যাদি যেগুলি ব্যক্তির কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। আর আভ্যন্তরীণ সংলক্ষণ যেমন নিরপত্তা ইত্যাদি ব্যক্তির মনের গভীরে থাকে এবং আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলি সংখ্যায় ঠিক কত তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। সংলক্ষণের সংখ্যা ৫ থেকে ২০০ পর্যন্ত হ'তে পারে। তবে অলপোর্ট ব্যক্তিত্বের প্রধান পাঁচটি সংলক্ষণের উল্লেখ করেছেন। (১) বুদ্ধি (২) সক্রিয়তা (mobility) মনঃপ্রকৃতি (Temperament) (৪) আত্মপ্রকাশ (Self expression) ও সামাজিকতা (Sociality)।

সংলক্ষণগুলি বেশ দুর্বোধ্য, ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব এগুলিতে খুব স্পষ্ট দেখা যায়; এগুলি পরিমাপ করা খুব সহজ নয়; কারণ পরিমাপ করার চেষ্টা করলে ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে হয়। তাছাড়া মানুষের আচরণ খুব জটিল। একই আচরণের পিছনে নানা রকম সংলক্ষণ থাকতে পারে। তাই এগুলি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা বেশ কঠিন কাজ।

ব্যক্তিত্বের রকমফের (Type of Personality)

এখন দেখা যাক ব্যক্তিত্ব কত রকমের হ'তে পারে। মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং (Jung) বলেন ব্যক্তিত্ব তিন রকমের—অন্তর্মুখী, বহির্মুখী ও উভয়মুখী। Spranger বলেন ব্যক্তিত্বকে মোটামুটি তাত্ত্বিক, হিসেবী, সৌন্দর্যবোধসম্পন্ন, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধার্মিক এই কয় ভাগে ভাগ করা যায়। Kretschemer-এর মত হোল ব্যক্তিত্ব দৈহিক গঠনের ওপর নির্ভর করে—যেমন অ্যাথলেটিক (যার সবল পেশীযুক্ত শরীর), এসথেনিক (লম্বা ও রোগা

পাতলা) আর পিগমিক (বেঁটে, মোটা)। সেলডন ও ষ্টিভেন্স দৈহিক গঠনের দিক থেকে ব্যক্তিত্বকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—(১) এণ্ডোফর্ম (পেট মোটা নরম দেহ) (২) মেসোফর্ম (শক্ত পেশী, কাঁধ চওড়া) ও এক্টোফর্ম (রোগা ও দুর্বল)। মানসিক দিক থেকেও এরা তিন ভাগে বিভক্ত—(১) ভিসেরোটনিক (আরামপ্রিয়, ভোজনবিলাসী) (২) সোমাটোটনিক (অধ্যবসায়ী, প্রভুত্ব ও উত্তেজনা পচ্ছন্দ করে) (৩) সরিব্রোটানিক (অসামাজিক, আত্মসংযমী আত্মবিশ্বাসহীন)।

ফ্রয়েড মানুষের যৌনশক্তি বিকাশের ধারা অনুযায়ী ব্যক্তিত্বের শ্রেণীবিভাগ করেছেন (১) মৌখিক রতি-প্রবণ—এর মধ্যে আছে নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় টাইপ। (২) পায়ুরতি প্রবণ (৩) উপস্থ প্রবণ ইত্যাদি।

ব্যক্তিসত্তার বিকাশ (Development of Personality)

শিশু যখন জন্মায় তার মধ্যে তখন ব্যক্তিসত্তা বলে কিছু থাকে না। শিশুর মধ্যে থাকে বৃদ্ধি প্রচেষ্টা ও বৃদ্ধি প্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রকৃতিদত্ত নানা উপচার। তার দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক ও নৈতিক দিকগুলি সম্ভাবনা আকারে তার মধ্যে সুপ্ত থাকে।

কিন্তু শিশু জন্মের পর থেকেই পরিবেশের প্রভাবে শক্তিশালী ও ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। একদিকে শিশুর বহুমুখা বৃদ্ধি প্রচেষ্টা ও অন্যা ক পরিবেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এই দুইয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে শিশুর ব্যক্তিসত্তা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে ব্যক্তিসত্তা জন্মসূত্রে পাওয়া যায় না—এটি বিকাশ নির্ভর। অলপোর্ট বলেছেন এই বিকাশের ধারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত, এই বিকাশের পথেই মানুষ পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। ব্যক্তিত্ব কোন স্থির মানসিক গুণও নয়, এটি সদা পরিবর্তনশীল, পরিবর্ধনশীল ও বিকাশমান। ব্যক্তিসত্তা বিকাশমান হলেও এই বিকাশ একটা নির্দিষ্ট মূলসূত্রকে কেন্দ্র করে বিকাশলাভ করে। সাধারণতঃ আমাদের সামগ্রিক জীবন বিকাশে যে প্রক্রিয়া সাহায্য করে, ব্যক্তিসত্তা বিকাশেও সেই প্রক্রিয়াগুলি সক্রিয় থাকে।

ব্যক্তিসত্তার ধারা বিশ্লেষণ করে মনোবিজ্ঞানী অলপোর্ট ১৪টি কৌশলের কথা বলেছেন। এগুলির মধ্যে বিশেষ কতকগুলি কৌশলের কথা আমরা আলোচনা করব।

(১) **বিভেদীকরণ** (differentiation)—ব্যক্তিসত্তা বিকাশের প্রাথমিক প্রক্রিয়া হোল বিভেদীকরণ। শিশু যখন জন্মায় তখন বিভিন্ন প্রাকৃতিক উদ্দীপকের সামনে আলাদা আলাদা প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা তার থাকে না। যেমন শিশু ভয় পেলে কাঁদে, খিদে পেলে কাঁদে, ঘুম পেলে কাঁদে ইত্যাদি। এক কথায় শিশু সব রকমের অসুবিধা কান্নার সাহায্যে প্রকাশ করে। শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রক্রিয়াগুলি ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হোতে থাকে, সেই সঙ্গে তার আচরণও অনেকখানি সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হয়। সে তখন বিশেষ উদ্দীপকের সামনে বিশেষভাবে সাড়া দিতে পারে। এই প্রক্রিয়াটিকেই বিভেদীকরণ নাম দেওয়া হয়েছে।

সমন্বয়ন (Integration)—ব্যক্তিসত্তা সংগঠনের আর একটি প্রক্রিয়া হ'ল সমন্বয়ন। শিশু যে সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়, সেগুলি পরিবেশের সংস্পর্শে এসে সংগঠনরূপে গড়ে ওঠে, প্রথমে এই সংগঠনগুলো বিশৃঙ্খল ও সামঞ্জস্যহীন থাকে। শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখা যায়। এর ফলে ব্যক্তিসত্তা একটা বিশেষ দিকে বিকাশলাভ করে। অলপোর্ট বলেছেন ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ করতে হলে সমন্বয়ন প্রক্রিয়ার একান্ত প্রয়োজন। সমন্বয়ন প্রক্রিয়া কতকগুলি স্তর পার হয়ে তবে সৃষ্টি হয়।

প্রথমে শিশু অভিজ্ঞতা অর্জন করে অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ার (Conditioned reflex) সাহায্যে। শিশু জীবনধারণের জন্য প্রাথমিক আচরণগুলি শেখে নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে। এইগুলিই হ'ল শিশুর প্রথম শেখা। এই সময় শিশু কতকগুলি আচরণ কৌশল শেখে। এই প্রথম শিশু স্বাভাবিক উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া বন্ধনকে শিথিল করে কৃত্রিম উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিতে শেখে। অনুবর্তনের সাহায্যে শিশুর সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা ও পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর একটা সংযুক্তি ঘটে; ফলে সমন্বয়ন হয়।

দ্বিতীয় স্তরে, অভ্যাস সমন্বয়নে অনেকখানি সাহায্য করে। অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়াগুলি প্রথমে অসংহত অবস্থায় থাকে, পরে যখন অসংহত প্রতিক্রিয়াগুলি সংহত ও সুসংবদ্ধ হয় তখন এটা অভ্যাসে পরিণত হয়। অর্থাৎ একই পরিস্থিতিতে একইভাবে কোন ব্যক্তি প্রতিক্রিয়া করলেই আমরা বলি অভ্যাস।

তৃতীয় স্তরে, এই অভ্যাসগুলি নিজেদের মধ্যে সংযোজিত হয়ে আরও উন্নত সমন্বয়নের সৃষ্টি করে। এই সমন্বয়নের ফলে আচরণের মধ্যে স্থায়িত্ব ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সমন্বয়নের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল নানারকম মানসিক সংগঠন

যেমন—সেন্টিমেণ্ট, মনোভাব, কমপ্লেক্স ইত্যাদি। মানসিক সংগঠন গড়ে উঠলে ব্যক্তির আচরণের মধ্যেও শৃঙ্খলা ও সংহতি আসে। এগুলি ব্যক্তিসত্তার বিকাশে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে এবং এই গুলিকেই ব্যক্তিসত্তার একক বলে ধরে নেওয়া যায়।

চতুর্থ স্তরে, বলা যায় ব্যক্তির আচরণের সংহতির ফলে তার জীবনে বিভিন্ন অহংসত্তার বিকাশ হয়। এই অহংসত্তা আবার বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়; ফলে অহংবোধের মধ্যে তখনও সামঞ্জস্য থাকে না।

পঞ্চম স্তরে, বিচ্ছিন্ন অহংসত্তাগুলো সমন্বয়নের মাধ্যমে একক অহংসত্তায় পরিণত হয়। এখন শিশুর সবরকম প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকে। তাছাড়া পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে শিশুর মধ্যে যত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল সবগুলিই এখন সুসংহত ও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। সমন্বয়নের এই স্তরেই ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশ হয়।

সমন্বয়ন প্রক্রিয়া ব্যক্তিত্ব গঠনের পক্ষে একান্ত উপযোগী হলেও এটি একমাত্র প্রক্রিয়া নয়। এ ছাড়া আরও ২।৩ রকম প্রক্রিয়া ব্যক্তিসত্তা বিকাশের পক্ষে সহায়ক। যেমন—

পরিণমন (Maturation)—পরিণমন কাকে বলে? পরিবেশের প্রভাব ছাড়াই ব্যক্তির আচরণধারা পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় পরিণমন। বিভেদীকরণ ও সমন্বয়নের সাহায্যে এই পরিণমন গড়ে ওঠে।

বক্তিসত্তা বিকাশের জন্য বিশুদ্ধ পরিণমন খুব সহায়ক হয়। পরিণমনের সাহায্যে ব্যক্তির মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনা থাকে সেগুলির বহিঃপ্রকাশ হয়; এই সম্ভাবনাগুলোকে পরিবেশের সাথে অভিযোজনে কি ভাবে প্রয়োগ করবে তার উপর নির্ভর করবে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ।

শিখন (Learning)—শিখনের মাধ্যমেও ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হয়। শিখন প্রক্রিয়ার সব নিয়মই ব্যক্তিসত্তা বিকাশের পক্ষে সহায়ক। অনুবর্তন (Conditioning), প্রচেষ্টা ও ভুল (Trial & Error), অনুকরণ (Imitation) প্রভৃতি শিখনের সব নিয়মই ব্যক্তিসত্তা বিকাশে সাহায্য করে।

ব্যক্তিসত্তা বিকাশের ধারা এত বিস্তৃত যে তাকে কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে বাঁধা যায় না। কোন বিশেষ ব্যক্তির জীবনে কোন বিকাশের ধারা কার্যকরী হবে তা ব্যক্তির স্বকীয়তার ওপর নির্ভর করে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনেক ধারা আছে বলে, কোন বিকাশের ধারাকে পরিপক্ব বিকাশ

বলা যাবে তা নির্ণয় করা খুব কঠিন কাজ। তবুও অলপোর্টের মত মনোবিজ্ঞানীরা স্থির করেছেন যে সাধারণত নীচের লক্ষণ থাকলে সেই ব্যক্তিত্বকে একটি পরিণত ব্যক্তিত্ব আখ্যা দেওয়া যাবে। যেমন—

কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি অর্জিত অনুরাগের সৃষ্টি হয় তবে তাকে পরিপক্ক ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলা যায়। যে কোন মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য যিনি নিজের কাজের মধ্যে ডুবে যেতে পারেন, যিনি লক্ষ্যে পৌছানর জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারেন তাকে পরিপক্ক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বলা হয়; এর অর্থ এই নয় যে সেই ব্যক্তি আত্মকেন্দ্রিক হবেন। ব্যক্তির এই একাগ্রতা যদি সামাজিক কোন বস্তুকে কেন্দ্র করে সমাজনুমোদিত পথে বিকশিত হয় তবেই ব্যক্তিসত্তার ঠিক ঠিক বিকাশ হয়েছে বলা হবে। এখানে শিশু আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত হ'য়ে সমাজের কোন বস্তুর উদ্দেশ্যে নিজের অহং সত্তাকে বিস্তারিত করে বলে এই স্তরের নাম অহংসত্তার বিস্তৃতি বলা হয়।

ব্যক্তিসত্তার পরিপক্কতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হোল অহংসত্তার নৈর্ব্যক্তিকতা। যে ব্যক্তি নিজেদের চাহিদাকে নিজের ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে তিনিই পরিপক্ক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন।

একক জীবনদর্শন যাঁর গড়ে উঠেছে তিনি পরিপক্ক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন। এই জীবনদর্শনের দ্বারা তিনি তাঁর জীবনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতার তাৎপর্য ভালভাবে বুঝতে পারেন ও তাঁর প্রবণতা, অভিজ্ঞতা ও আচরণের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যবিধান করতে পারেন। জীবনের এই অবস্থাকেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের চরম স্তর বলা যায়।

ব্যক্তিত্বের আয়তন

এখন আমরা দেখব ব্যক্তিত্বের আয়তন বলতে আমরা কি বুঝি। মনোবিজ্ঞানী আইজেঙ্ক (Eysenck) ব্যক্তিত্বের আয়তন বর্ণনা করতে গিয়ে ব্যক্তিত্বের স্বরূপের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন ব্যক্তিত্বের তিনটি উপাদান বা আয়তন আছে। যেমন—(১) অন্তর্মুখীতা—বহির্মুখীতা (Introversion—Extroversion) (২) মনোবিকার প্রবণতা (Neuroticism) (৩) উন্মত্ত প্রবণতা (Psychoticism)।

আইজেঙ্কের মতে প্রত্যেক ব্যক্তি এই তিনটি আয়তনের মধ্যে কোনটি না কোনটির মধ্যে পড়ে। কোন ব্যক্তি একটি আয়তনে পড়ার অর্থ হোল—সেই

আয়তনের গুণগুলি তার মধ্যে বেশী আছে—অন্য আয়তনের গুণগুলি কিছু কম মাত্রায় আছে। তবে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এই ত্রিমাত্রিক বিবরণকে বিজ্ঞানসম্মত মনে করেন না।

ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ (Measurement of Personality)

ব্যক্তিত্বকে ঠিক ভাবে জানার জন্য বহু প্রাচীনকাল থেকেই চেষ্টা চলে আসছে। ব্যক্তির দৈহিক গঠন ও বাহ্যিক আচরণ দেখে, তার সম্বন্ধে অন্যের ধারণা সংগ্রহ করে, জীবনের প্রতি ব্যক্তির চিন্তা, বিশ্বাস, ভাবধারা লক্ষ্য করে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব জানার পদ্ধতি অনেক আগে থেকেই চলছে। কিন্তু বর্তমানে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার পদ্ধতি সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও অনেক মনোবিজ্ঞানী সামগ্রিক পদ্ধতির কথা বলেছেন—যেখানে ব্যক্তিকে সামগ্রিকভাবে দেখার কথা বলা হয়। সমালোচকরা অবশ্য বলেন এই পদ্ধতি অনেকটা ব্যক্তিনির্ভর (subjective); তাই এঁরা ব্যক্তিনিরপেক্ষ (objective) পদ্ধতি অনুসরণের পক্ষপাতী।

ব্যক্তির পরিমাপের জন্য যে যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় সে সম্বন্ধে এখন আমরা আলোচনা করব। যেমন—

(১) সাক্ষাৎকার (Interview)—কোন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার ব্যক্তির পরিমাপ করার চেষ্টা অনেকদিন আগে থেকে চলছে। এই সাক্ষাৎকার চার রকমের হ'তে পারে। Unstandardised interview—যখন দুই ব্যক্তির মধ্যে সাধারণভাবে কথাবার্তা হয়। Standardised Interview—যখন কোন ব্যক্তিকে সাক্ষাৎকারী ব্যক্তির কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। Stress Interview—সাক্ষাৎকারের সময় কোন ব্যক্তিকে উত্তেজিত করে দেখা হয়, উত্তেজনার মুহূর্তে সে নিজেকে কতখানি সংযত রাখতে পারে। Exhaustive Interview—একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে দীর্ঘদিন ধরে কোন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে জানার চেষ্টা ইত্যাদি।

সাক্ষাৎকারের কোনো নির্দিষ্ট নীতি না থাকায় এই পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকারীর ব্যক্তিগত মনোভাব এসে পড়তে পারে। কাজেই এই পদ্ধতির সাহায্যে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা কম।

(২) **জীবন ইতিহাস অনুসরণ পদ্ধতি** (Case History Method)—এই পদ্ধতি অনুসারে ব্যক্তির শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবনকালের বিভিন্ন আচরণ অভিজ্ঞতা, বংশগত বৈশিষ্ট্য, গৃহ পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে কার্যকরী।

(৩) **রেটিং স্কেল** (Rating Scale)—এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির কোন একটি গুণের সঠিক পরিমাণ জানার চেষ্টা করা হয়। কোন ব্যক্তির দুই বিপরীত গুণকে একটি রেখার দুই প্রান্তে রেখে রেখাটিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। যেমন—
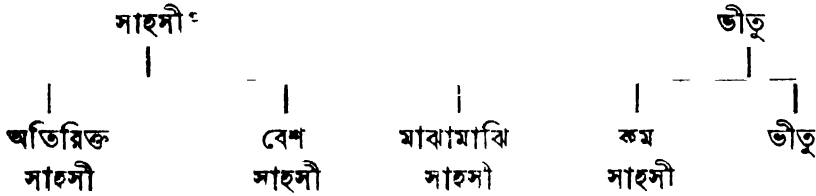
এই পদ্ধতিতেও পরীক্ষকের নিজের ধারণা পরীক্ষাকাজকে প্রভাবিত করতে পারে।

(৪) **প্রশ্নতালিকা পদ্ধতি** (Questionnaire Method)—এই পদ্ধতি অনুসারে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব মাপার জন্য তাকে কতকগুলি প্রশ্নের তালিকা দেওয়া হয় যার পাশে তিনি হ্যাঁ বা না বসাবেন। যেমন—

(ক) আপনি কি সব লোকের সঙ্গে কথা বলা পছন্দ করেন? হ্যাঁ বা না।

(খ) অপরিচিত লোকদের মাঝে আপনি কি বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন? হ্যাঁ বা না।

(গ) সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া আপনি কি পছন্দ করেন? হ্যাঁ বা না।

এই পদ্ধতির বিশেষ কতকগুলি সুবিধা আছে। যেমন—(১) পরীক্ষাটি পরীক্ষকের ব্যক্তিগত ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। (২) প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির তুলনা করা যায়। (৩) প্রশ্নগুলি যদি আদর্শীকৃত বা (Standardised) হয় তবে এই পদ্ধতি নিশ্চয়ই নির্ভরযোগ্য হবে এটা বলা যায়। তবে এই পদ্ধতির অসুবিধা হোল যে এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির সংলক্ষণ জানা গেলেও সংলক্ষণের প্রকৃতি ঠিক জানা যায় না।

(৫) **অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি এবং স্বপ্ন বিশ্লেষণ** (Free Association Method & Dream Analysis)—কোন ব্যক্তির অবচেতন মনের রহস্য যদি জানতে হয় তবে এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী। পরীক্ষক প্রথমে নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে এমনভাবে কথাবার্তা বলবেন যাতে তিনি বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারেন, তারপর তাঁকে খুব আরাম দেবেন যাতে তিনি তাঁর মনের গোপন বাসনা, কামনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিঃসঙ্কোচে বলে যেতে পারেন।

মনঃসমীক্ষক অনেক সময় কোন ব্যক্তির স্বপ্ন বিশ্লেষণ করেও বক্তির যেসব নির্জ্ঞান প্রেষণা থাকে তা জানতে পাবেন।

(৬) **কৃতি অভীক্ষা বা আচরণ অভীক্ষা** (Performance Test or Behaviour Test)—এই পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কাজ দিয়ে তার মধ্যে দিয়ে তার আচরণ লক্ষ্য করা হয়। এই ধরণের অভীক্ষা শিশুদের পক্ষে খুব কার্যকরী।

(৭) **প্রতিফলন অভীক্ষা** (Projective Test)—এই পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তির সামনে একটি উদ্দীপক রেখে তাকে প্রতিক্রিয়া করতে বলা হয়; এই প্রতিক্রিয়া থেকেই ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করা হয়। কারণ প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয়। এই পদ্ধতি নানা রকমের হোতে পারে যেমন :—

(ক) **রশাক ইঙ্কব্লট অভীক্ষা** (Rorschach Inkblot Projective Test)—এই পদ্ধতিতে যাকে পরীক্ষা করা হবে তাকে কতকগুলি কালির ছাপ দেখাতে হবে, তারপর তাকে তার অর্থ বলতে বলা হবে এই অর্থ থেকেই ব্যক্তির মানসিক সংগঠন কি রকম তা জানা যাবে।

(খ) **কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ অভীক্ষা পদ্ধতি** (Thematic Apperception Test or T. A. T.)—এই পদ্ধতি অনুযায়ী পরীক্ষণ পাত্রের (ব্যক্তির) সামনে কিছু রেখে তার ব্যাখ্যা করতে বলা হয়। পরীক্ষণ পাত্র ছবিটি দেখে যে কাহিনী বলবেন তাতে তার আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, মানসিক দ্বন্দ্ব ইত্যাদি প্রকাশ পাবেণ

(গ) **শব্দানুষঙ্গপদ্ধতি** (Word Association Test)—এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিত্বসূচক কতকগুলি শব্দ উদ্দীপক হিসাবে একটার পর একটা পরীক্ষণ পাত্রের কাছে উপস্থিত করা হয়। শব্দটি শোনামাত্রই পরীক্ষণ পাত্রের প্রথমে যে শব্দটি মনে আসে তা বলতে বলা হয়। উদ্দীপক শোনা ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কতখানি সময় লাগে তাও লক্ষ্য করতে হয়। এরপর উত্তরগুলি ও

সময় অঙ্কের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে ব্যক্তির নির্জ্ঞান মনের অনেক খবর জানতে হয়।

(ঘ) **পরিস্থিতি পদ্ধতি** (Situation Test)—এই অভীক্ষায় দেখা হয় কোন ব্যক্তি, বিশেষ পরিস্থিতিতে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে কি ভাবে আচরণ করে। যেমন সততা আছে কিনা জানার জন্য বিশেষ একটা পরিস্থিতিতে শিশুদের এমনভাবে আচরণ করতে দিতে হবে যাতে তারা ঠকাতে সুযোগ পায়; তারপরও সে যদি না ঠকায় তবে বুঝতে হবে সে সৎ।

(ঙ) **সমাজমিতিমূলক পদ্ধতি** (Sociometric Methods)—আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তির নিজের স্থান নির্ধারণ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। একটি দলে ধরা যাক আটজন লোক আছে; প্রত্যেককে প্রশ্ন করা হোল কে কার সঙ্গে বেড়াতে যেতে চায়; তাদের উত্তর থেকে একটি রেখাচিত্র টেনে সবচেয়ে কে বেশী জনপ্রিয় তা সহজে বার করা যায়। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কে ভাল, কে নেতা হ'তে পারবে এই সমস্ত তথ্য শিক্ষক এই পদ্ধতির সাহায্যে সহজে জানতে পারবেন।

(চ) **উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতি** (Factor Analysis)—বর্তমানকালে গণিতের উপর নির্ভর করে অনেক পদ্ধতি গড়ে উঠেছে যেগুলির অধিকাংশই বিজ্ঞানসম্মত। গিলফোর্ড ও তার সহকর্মীরা এই পদ্ধতিটি প্রথম প্রয়োগ করেন। তাঁদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ থেকে ব্যক্তিসত্তার ১০টি মৌলিক উপাদানের কথা জানা যায়; এই ১০টি উপাদানের মোট ৩০০ প্রশ্ন আছে যেগুলির উত্তর হ্যাঁ বা না হবে। দশটি মৌলিক উপাদান হোল—(১) সাধারণ সক্রিয়তা (২) সংযম (৩) প্রাধান্য (৪) সামাজিকতা (৫) প্রাক্ষোভিক সমতা (৬) বিষয়মুখিতা (৭) বন্ধুত্ব (৮) চিন্তাশীলতা (৯) ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও (১০) পৌরুষ।

প্রত্যেকটি পদ্ধতির কিছু দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এগুলির কোন উপকারিতা নেই একথা বলা যায় না। ব্যক্তিত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিফলন অভীক্ষাগুলি আমাদের অনুসন্ধানক্ষেত্রকে অনেকখানি বিস্তৃত করেছে।

ব্যক্তিসত্তা ও শিক্ষা (Personality & Education)

পূর্বেই বলা হয়েছে জন্মের সময় শিশুর ব্যক্তিসত্তা থাকে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কতকগুলি আচরণ ক্ষমতা জন্মায়। ফলে তার ব্যক্তিসত্তার

বিকাশ সুরু হয়। ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তির বংশগতি ও পরিবেশের সম্মিলিত ফল; সুতরাং ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি নির্ণয়ে পরিবেশের মূল্য অস্বীকার করা যায় না। বিদ্যালয় শিশুর পরিবেশের এক বিরাট অংশ অধিকার করে আছে; ফলে শিশুর ব্যক্তিসত্তা বিকাশে বিদ্যালয়ের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। স্যার পার্শি নান বলেছেন শিক্ষার উদ্দেশ্যই হোল ব্যক্তিসত্তার বিকাশ।

বিদ্যালয়কে যদি তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে হয় তবে শিশুদের ব্যক্তিসত্তা বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে বিদ্যালয়ে। অভিজ্ঞতার সঞ্চয়নের মাধ্যমে ও নতুন পরিস্থিতিতে আচরণের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হয়। নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্ম বিদ্যালয়ে সুযোগ করে দিতে হবে। শিক্ষার্থী যাতে আত্মসক্রিয় হতে পারে তারও ব্যবস্থা করবে বিদ্যালয়। যদি কোন শিক্ষার্থী পরিস্থিতিকে নিজের আয়ত্তে আনতে না পারে তবে শিক্ষক তাকে এ কাজে সাহায্য করবেন।

ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলো যাতে ঠিকভাবে গড়ে উঠতে পারে সেদিকেও শিক্ষক নজর রাখবেন। শিশুদের নানারকম কাজের দায়িত্ব দিয়ে তাদের দায়িত্ববোধ বাড়াতে হবে। দলগত কাজের সুযোগ দিয়ে তাদের সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। এক কথায় শিক্ষার্থীদের সুস্থ জীবনাদর্শ যাতে গড়ে ওঠে তার ব্যবস্থা করবে বিদ্যালয়। একাজে শিক্ষককে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও আদর্শমুখী হ'তে হবে।

ব্যক্তিসত্তা গঠনে বিদ্যালয় এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবে যাতে শি·ার্থী অতি সহজে পরিবেশের সাথে অভিযোজনে অংশ নিতে পারে; সেইজন্ম বিদ্যালয় পরিবেশ সুবিন্যস্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

প্রশ্নাবলী

1. What is meant by personality? Bring out the factors which influence the development of personality.

(C. U. B. A. 1966.)

2. Elucidate the meaning of the term personality. And indicate the relation between Personality & Character.

(C. U. B. A. H. 1971)

চতুর্থ অধ্যায়

মানব জীবনের ক্রমবিকাশের ধারা

(Process of Development)

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষের জীবন সদা পরিবর্তনশীল। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি জীবন চলমান বা গতিশীল। এই গতির মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতা থাকলেও মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যেমন কখনও বলা হয় বৃদ্ধি (growth), কখনও বলা হয় বিকাশ (development) আবার কখনও বা বলি পরিণমন (maturation)। বিকাশ কথাটি এখানে গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। যখন বলি শিশুটির বৃদ্ধি হয়েছে তখন বুঝতে হবে শিশুর হাত, পা ও দেহের কাঠামো বেড়েছে কিন্তু বিকাশ হয়েছে বললে বোঝায় দৈহিক পরিবর্তনের সাথে তার মানসিক পরিবর্তনও হয়েছে। জীবনব্যাপী ক্রম উন্নতিশীল সামগ্রিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াই হোল বিকাশ।

বিকাশের বৈশিষ্ট্য

বিকাশের নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন—

(১) বিকাশ হোল নিরবচ্ছিন্ন (Continuous) প্রক্রিয়া। মানুষের জীবন প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে, এর মধ্যে কোন ফাঁক নেই।

(২) বিকাশের প্রক্রিয়া ক্রমপরিবর্তনশীল—অর্থাৎ একটি স্তরের পরিবর্তন তার পূর্ববর্তী স্তরের উপর নির্ভর করে। জীবনের বিকাশ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়।

(৩) বিকাশের ধারা সামঞ্জস্যপূর্ণ (development is orderly)। কোন আচরণের পর কোন আচরণ হবে তা মোটামুটি নির্দিষ্ট থাকে এবং একটি স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরের সঙ্গতি থাকে।

(৪) মানুষের বিকাশের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এটা সাধারণ থেকে বিশেষের দিকে যায়। মানুষের প্রথম আচরণগুলো সামগ্রিক, যেমন শিশুর যে কোন অসুবিধা হলেই কাঁদে। কিন্তু ধীরে ধীরে এই কান্না আচরণটি কেবলমাত্র দুঃখ হলেই কাঁদে এই অবস্থায় রূপান্তরিত হয়।

(৫) জীবন বিকাশের প্রক্রিয়া খুব জটিল। কোন এক স্তরে দৈহিক বিকাশ বেশী হয়, মানসিক বিকাশ হয় কম, আবার কোন স্তরে মানসিক বিকাশ

বেশী হয়, দৈহিক বিকাশ কম হয়। আবার কখনও কখনও একই স্তরে এই বিকাশের হার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়।

(৬) বিকাশের ধারা ব্যক্তিজীবনে ঐক্য বজায় রাখে। মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকের বিকাশের মধ্যে একটা ঐক্য থাকে এক ধরণের বিকাশ অন্য ধরণের বিকাশকে সাহায্য করে; যেমন দৈহিক বিকাশ অনেক সময় মানসিক বিকাশকে, মানসিক বিকাশ সামাজিক বিকাশকে সাহায্য করে।

(৭) বিকাশের ধারা ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। কোন এক বিশেষ বয়সের শিশুর বিকাশের সঙ্গে ঠিক সেই বয়সের শিশুর বিকাশ হুবহু এক হবে এমন কথা জানা যায় না। প্রত্যেকটি শিশুর বিকাশে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে।

(৮) ব্যক্তি জীবনের বিকাশ তার বংশগতি ও পরিবেশের উপরে নির্ভর করে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন এই দুটি প্রক্রিয়াই বিকাশের কারণ।

জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর ও প্রত্যেক স্তরের বিকাশের বৈশিষ্ট্য

সমগ্র মানব জীবনের বিকাশকে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বলা যায়। এবং তা বললেও এই বিকাশের ধারাকে কিন্তু কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যায়। প্রত্যেক স্তরে ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। মানুষের জীবন বিকাশের ধারাকে দশটি ভাগে ভাগ করা যায়। তার মধ্যে কয়েকটি স্তরের বিকাশের বৈশিষ্ট্য শিক্ষাক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। দশটি স্তর হোল—(১) প্রাক জন্মস্তর (২) সদ্যোজাত স্তর (৩) প্রথম শৈশব স্তর (৪) শেষ শৈশব স্তর (৫) প্রাথমিক বাল্য স্তর (৬) মাধ্যমিক বাল্য স্তর (৭) দ্বিতীয় বাল্য স্তর (৮) যৌবনাগম স্তর (৯) প্রাপ্তবয়স্ক স্তর (১০) বার্ধক্য স্তর। দশটি স্তরের মধ্যে আমরা কয়েকটি বিশিষ্ট স্তর আলোচনা করব।

শৈশব (Infancy)—নবজাতক যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন থেকেই শিশুর খানিকটা বিকাশ আরম্ভ হয়। এই সময়ের দৈহিক বিকাশ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়; যেমন শিশুর হৃদস্পন্দন, শ্বাসকার্য, রক্তসঞ্চালন ইত্যাদি সুরু হয় প্রথমে, তারপর তার স্নায়ুতন্ত্র গঠিত হয়, সবশেষে তার মাংসপেশী (ও অংশ) তৈরী হয়। প্রকৃতপক্ষে শিশুর জন্মের পর থেকে ৫।৬ বছর বয়স পর্যন্ত শৈশব স্তরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য

শৈশবে—৫।৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর দৈহিক বৃদ্ধির হার খুব দ্রুত। সাধারণতঃ দেখা যায় শিশু একমাস বয়সে মাথা তুলতে পারে,

ছ মাসে মাথা খাড়া করতে পারে, ছ' মাস বয়সে বসতে পারে, ৯।১০ মাসে হামাগুড়ি দিতে পারে ও কোনকিছু ধরে দাঁড়াতে পারে। ১১ মাসে হাত ধরে চলতে পারে, ১৩ মাসে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে পারে। ১৫ মাস বয়সে একা চলতে পারে।

তিন থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু কোন কিছুকে আঁকড়ে ধরা, কিছু ছোঁড়া, দৌড়ান, লাফান, উঁচু জায়গাতে ওঠা ইত্যাদি কাজগুলি সহজে করতে পারে। সে ছোটখাট যন্ত্রপাতির ব্যবহার শেখে। লাইন টানা, ছবি আঁকা, রঙ করা ইত্যাদি কাজ করার ক্ষমতা শিশুর এই স্তরে জন্মায়।

মানসিক বৈশিষ্ট্য—মানব শিশু জন্মকালে থাকে নিতান্ত অসহায়। এই সময় তার ক্ষুধা তৃষ্ণা ও নিরাপত্তার চাহিদা খুব বেশী থাকে; শিশু "সুখভোগের নীতি" অনুসরণ করে। কিন্তু শিশু যখন থেকে নিজে হাঁটতে শেখে তখন থেকে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে; স্বাধীনতার মনোভাব গড়ে ওঠে; অহং সম্বন্ধে সচেতন হয় অর্থাৎ 'আমি আমি' ভাবটা শিশুর মধ্যে প্রবল হয়।

এরপর শিশু অনুকরণের মাধ্যমে নিজের আচরণের পরিবর্তন করে। সে এখন বাবার মত জামাকাপড় পরে অফিস কাছারি করতে চায়, মায়ের অনুকরণে রান্নাবাড়া করতে ভালবাসে। এই সময় শিশুর মন খুব কল্পনাপ্রবণ থাকে, সে গল্প শুনতে ভালবাসে, এবং যে খুব বীরত্বপূর্ণ গল্প বলতে পারে তার সঙ্গে সে নিজেকে এক করে ফেলে; অহংবোধের আদর্শ সম্বন্ধে শিশু খানিকটা সচেতন হয়।

তিন থেকে পাঁচ ছ বছর বয়সের মধ্যে শিশুর ধারণার সৃষ্টি হয়। তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বস্তুকে কেন্দ্র করে একটা অর্থপূর্ণ ধারণা গড়ে ওঠে।

শিশুর ভাষার বিকাশ হোল এই স্তরের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার প্রথম ভাষা হচ্ছে কান্না। তারপর প্রথম ছ'মাস সে মুখ দিয়ে অস্পষ্ট, অর্থহীন কয়েকটা শব্দ করে (echo-babbling stage)। দশ বারো মাস পর্যন্ত বয়সে শিশুর শব্দ অর্থপূর্ণ হয়; এক বা দু অক্ষরের শব্দ বলতে পারে (যে শব্দগুল সাধারণতঃ আত্মীয়, মা, বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়)। আঠার মাস বয়স পর্যন্ত শিশু একটা শব্দ দিয়ে সমস্ত বাক্যের অর্থ বোঝাতে চেষ্টা করে; যেমন "মা জল—" কথাটির দ্বারা সে বোঝাতে চায় 'মা আমাকে জল দাও'। দু বছর বয়স পর্যন্ত সব জিনিষের নামের উপর শিশু

গুরুত্ব দেয়, তারপর আস্তে আস্তে নামের গুরুত্ব কমে যায় ও ক্রিয়া প্রভৃতির ব্যবহার শেখে। স্মিথ সাহেবের মতে শিশুর ভাষাশিল্প মোটামুটি এইভাবে বাড়ে :—

বয়স	শব্দ সংখ্যা
একবছরের শেষে	৩
দু ,, ,,	২৭২
তিন ,, ,,	৮৯৬
চার ,, ,,	১৫৪০
পাঁচ ,, ,,	২০৭২
ছয় ,, ,,	২৫৬২৭

আমাদের দেশের শিশুরাও ভাষা এইভাবে শেখে। তবে আজকাল দেখা যায় শিশুর পরিবেশ আগেকার থেকে অনেক উন্নত হওয়ায় আগেকার শিশুর তুলনায় এখনকার শিশুরা খুব তাড়াতাড়ি অনেক বেশী কথা শিখে ফেলে।

পাঁচ ছয় বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর কৌতূহল খুব বেশী থাকে। তার পরিবেশ সম্বন্ধে তার জিজ্ঞাসার শেষ নেই। এই বয়সে শিশুকে বিজ্ঞানীর ভূমিকায় দেখা যায়—সে সব কিছু নেড়েচেড়ে দেখে তার কৌতূহল মেটাতে চায়। এই সময় শিশুর মনোযোগেরও খুব পরিবর্তন হয়।

প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য—দুবছরের মধ্যে শিশুর প্রক্ষোভগুলি সাধারণ অবস্থা থেকে বিশেষ অবস্থায় পরিণতিলাভ করে। প্রথম ম া প্রক্ষোভগুলি মাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। আগে মনে করা হোত শিশুর মধ্যে যৌনতাবোধ থাকে না; কিন্তু ফ্রয়েডের গবেষণা সে ধারণাকে খানিকটা বদলে দিয়েছে। ফ্রয়েড ও তাঁর অনুগামীরা বলেন শৈশবে যৌনতাবোধ তো থাকেই এবং এই যৌনতাবোধ শিশুর ভবিষ্যৎ আচরণকে প্রভাবিত করে। ফ্রয়েডের মতে শিশু মাতৃস্তন্য পান করার সময়, মলমূত্র ত্যাগ করার সময় যে উত্তেজনা অনুভব করে তার মধ্যেই তার যৌন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়; আঙুল চোষা ও কোন কিছু কামড়ানোর মাধ্যমেও সে যৌন তৃপ্তিলাভ করে।

তিন থেকে ছয় বছর বয়সে শিশুর সেণ্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে। এই সময়ে প্রক্ষোভগুলোর খুব ঘন ঘন পরিবর্তন হয়। এই কেঁদেই আকুল, পরমুহূর্তে হেসেই খুন। ফ্রয়েডের মতে এই সময় যৌন আসক্তি বিপরীত লিঙ্গের প্রতি ধাবিত হয়; যেমন ছেলের ভালবাসা মায়ের প্রতি ও মেয়ের ভালবাসা বাবার

প্রতি বেশী থাকে; একে ফ্রয়েড বলেছেন ইডিপাস কমপ্লেক্স (Oedipus Complex) ও ইলেকট্রা কমপ্লেক্স (Eelectra complex)।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য—জন্মের সময় শিশুকে সামাজিক বা অসামাজিক কিছুই বলা যায় না। শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই গুণগুলিরই বিকাশ হয়, সে আনন্দ, ভালবাসা ধীরে ধীরে প্রকাশ করে, হিংসা, রাগ, বিরক্তি তার আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। শিশুর সামাজিক আচরণও মা-বাবাকে কেন্দ্র করে সুরু হয়, তারপর সে ভাই বোন সমবয়সী শিশুদের সঙ্গে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব করে; আত্মকেন্দ্রিক শিশু সব কিছুতে নিজের অধিকার ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

তিন থেকে ছয় বছর বয়সে অহংবোধ খানিকটা কমে যায়; সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করে; শিশুর মধ্যে সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রভৃতি গুণ দেখা যায়।

শৈশবকালের শিক্ষা—এই স্তরটি শিক্ষার দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় হয়তো; কিন্তু এই স্তরের উপর পরবর্তী স্তরের অনেক কিছু নিভর করে। অ্যাড্‌লার বলেন ভবিষ্যৎ জীবন-সৌধের বুনিয়াদ এই স্তরেই ওঠে। শিক্ষার দিক থেকে বিচার করলে এই স্তরকে প্রাক্‌বিদ্যালয় স্তর বলা উচিত। কিন্তু আজকাল এই স্তরেও শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনেক নার্সারী ও কিণ্ডারগার্টেন স্কুল গড়ে উঠেছে। অবশ্য এই সব স্কুলে খুব বেশী লেখাপড়া শেখানর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না, নানারকম খেলনার সাহায্যে সংখ্যার ধারণা দেওয়া হয়। তাছাড়া শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য ছড়া, গল্প, গান, ছন্দ, খেলনা প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয়। শিশুর প্রাথমিক সৌন্দর্যবোধের ধারণা, নানান রঙের ধারণা এই সময় দেওয়া হয়। শিশুর দেহ সুস্থ রেখে তার বিচার করার শক্তি, কৌতূহল প্রবৃত্তি ইত্যাদিকে কাজে লাগালে ভাল হয়। মাতৃভাষা যাতে ভাল করে শেখে সে দিকেও নজর দিতে হয়।

বাল্যকাল—ছয় থেকে বার বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর বাল্যকাল ধরা হয়। অনেক মনোবিজ্ঞানী এই স্তরকে দুটি ভাগে ভাগ করার পক্ষপাতী (১) ৬—৮ বছর পর্যন্ত প্রাথমিক বাল্যকাল, (২) ৯—১২ বছর প্রান্তীয় বাল্যকাল। তবে এই স্তরগুলির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে খুব বেশী একটা পার্থক্য থাকে না।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য—শৈশবে যে দ্রুত হারে শিশুর দৈহিক পরিবর্তন হয় এই স্তরে তা অনেকখানি কমে যায়; কিন্তু শারীরিক কাজ করার ক্ষমতা, লাফান

দৌড়ান ইত্যাদির ক্ষমতা বাড়ে। দুধে দাঁত পড়ে গিয়ে, নতুন দাঁত গজিয়ে মুখের চেহারা অনেকখানি বদলে দেয়। চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ হয়, মস্তিষ্কের বিকাশ হয়। শৈশবের সারল্য শিশুর মুখের ওপর আর ততটা থাকে না।

মানসিক বৈশিষ্ট্য

শৈশবের দৈহিক চঞ্চলতা যেন এই স্তরে মন্ত্রবলে স্তব্ধ হয়ে যায় কিন্তু মানসিক চঞ্চলতা খুব বৃদ্ধি পায়। শিশু খুব চঞ্চল হয়, তার কৌতূহল বেড়ে যায়; শিশু পর্যবেক্ষণ করতে, চিন্তা করতে ও বিচার করতে শেখে। শৈশবে যে প্রশ্ন ছিল "এটা কি", "ওটা কি" সেটা এখন "এটা কেমন করে হোল" "এটা কেন হোল" ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়। এখানে স্পষ্টই যুক্তির প্রাধান্যলাভ লক্ষ্য করা যায়। এখন কল্পনার প্রাধান্য কমে যায়—বাস্তব অনেকখানি আধিপত্য লাভ করে। এই সময় শিশুমন খুব সঞ্চয়ী হয়ে ওঠে। শিশু মালিকানা করতে চায়, বই, খাতা, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি আমার—এই কথা মনে করে সে গর্ববোধ করে। আর্নেষ্ট জোন্‌স্ বলেন পরিণত বয়স বাল্যেরই পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পরিণত বয়সের সবকিছু বৈশিষ্ট্যই এই বয়সে দেখা যায়।

প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য

শৈশবের প্রক্ষোভমূলক অস্থিরতা এখন অনেক কমে যায়। এই স্তরের প্রথমদিকে প্রক্ষোভমূলক আচরণের মধ্যে খানিকটা বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। কিন্তু দলগত খেলা, সামাজিক আচরণের মাধ্যমে প্রক্ষোভগুলি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রিত হয়।

ফ্রয়েড বলেছেন এই সময় যৌন চেতনা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। ছেলেরা হিংসা, ঈর্ষা প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলিকে প্রতিযোগিতামূলক কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করে, মেয়েরা সাজপোষাক, নাচগান ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য

শৈশবের আত্মকেন্দ্রিক ভাবটা এই স্তরে অনেকটা কেটে যায়। বাল্যকালের প্রথমদিকে দলগত খেলার প্রতি শিশুর বেশ ঝোঁক থাকে। এই দলপ্রীতিই তাকে অনেকখানি সামাজিক করে তোলে। মনোবিজ্ঞানী পিয়াজে (Piaget) বলেন এই সময় শিশুর সমাজ চেতনার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিরও বিকাশ ঘটে।

বাল্যকালের শিক্ষা

বাল্যকালে শিশু তার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাসমাপ্ত করে ফেলে। আমরা দেখেছি এই স্তরের বড় বৈশিষ্ট্য হোল শিশুর সমাজচেতনা ও দলপ্রীতি। এইজন্য বিদ্যালয়ে সমবেত কাজের আয়োজন করতে হবে। শিশুকে সৃজনমূলক কাজে উৎসাহ দিতে হবে। বিদ্যালয়ে পড়াশুনার সাথে সাথে নাচ, গান, খেলাধূলা, অভিনয় ইত্যাদির ব্যবস্থা তো থাকবেই তাছাড়া সমাজসেবামূলক কিছু কাজের ব্যবস্থা থাকলে শিশুরা খুব উৎসাহ নিয়ে সে সব কাজ করবে। শিশুর সঞ্চয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য ডাকটিকিট সংগ্রহ, দেশনেতাদের ছবি ও বাণী সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে উৎসাহ দিতে হবে। শিশুর দলপ্রীতিকে কাজে লাগিয়ে তাদের সংঘবদ্ধ করা যেতে পারে। তাছাড়া শিশুর মধ্যে আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য, বিনয়, নানারকম নৈতিকগুণের বিকাশের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষকের নিজের আচরণ হবে শিশুর কাছে সবচেয়ে বড় আদর্শ।

কৈশোর কাল

আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণকাল হচ্ছে কৈশোর। মানুষের জীবন পরিক্রমার পথে বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্তী স্তর হোল কৈশোর। এই সময় দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক দিক থেকে এত পরিবর্তন আসে যে কিশোরেরা তাতে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এটিকে বয়ঃসন্ধির কাল বলা হয়, কারণ এই স্তরেই শিশু বাল্যকাল থেকে যৌবনের পথে পা বাড়ায়।

ইংল্যাণ্ডের 'হ্যাডো কমিটি' কৈশোরের শিক্ষার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন সাধারণতঃ ১২ বছর বয়সে ছেলেমেয়েদের দেহ-মনে এক নতুন জোয়ার আসে, এই জোয়ারের স্রোতে যদি তাদের জীবনতরী ঠিকমত বাওয়ান যায় তবে তারা অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হতে পারবে।

মনোবিজ্ঞানী স্ট্যানলী হল কিন্তু কৈশোর সম্বন্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন—এই সময়টা হোল প্রবল ঝড়, ঝঞ্ঝা ও উৎকণ্ঠা দ্বন্দ্বের কাল—"a period of great stress and strain, storm and strife."

According to keats :—"The imagination of a young boy is healthy, the matuie imagination of a man is healthy; but there is a space of life in-between in which the soul is in a ferment, the character undecided, the way of life uncertain."

কেউ কেউ আবার এই স্তরটিকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের স্তর (stage of revolution) বলেছেন। থর্ণডাইক ও কিন্সে এই স্তরটিকে জীবনবিকাশের কর্মবিকাশমূলক স্তর বলে চিহ্নিত করেছেন। সাধারণতঃ এই স্তরটি ১১—১২ বছর থেকে ২১ বছর বয়স পর্যন্ত বিস্তৃত। আবহাওয়া, জাতি ও ব্যক্তিগত দৈহিক গঠন অনুসারে যৌবনাগম হয়। কৈশোর কালকেও দুভাগে ভাগ করা যায়—বারো থেকে চোদ্দ বছর পর্যন্ত প্রাথমিক কৈশোর ও পনের থেকে আঠার বা একুশ বছর পর্যন্ত প্রান্তীয় কৈশোর স্তর।

কৈশোরে দৈহিক পরিবর্তন

ছেলেমেয়েদের দেহে এই সময় হঠাৎ এমন পরিবর্তন আসে যে তাতে তারা নিজেরাই খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। বয়স্করা তাদের এই অস্বাভাবিক দৈহিক পরিবর্তন নিয়ে অনেক সময় ঠাট্টা বিদ্রূপ করে; তার ফলে কিশোর-কিশোরীরা একটা অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে নিজেদের ঠিক যেন মানিয়ে নিতে পারে না।

এই স্তরের যৌন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশ ও তার সঙ্গে সঙ্গে নানান দৈহিক পরিবর্তন একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, শরীরের ওজন বাড়ে, উচ্চতা বৃদ্ধি হয়। ছেলেদের দৈহিক উচ্চতা মেয়েদের থেকে বেশী হয়; ফলে ছেলেদের হাত পাগুলোকে সরু সরু মনে হয়। শরীরের মধ্যেও মাংসপেশী, হাড়, রসক্ষরা গ্রন্থি মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্র প্রভৃতির অনেক পরিবর্তন হয়। ছেলেদের স্বরনালীর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় এবং কণ্ঠস্বর কর্কশ ও ভারী হয়। মেয়েদের কিন্তু কণ্ঠস্বর মিহি ও তীক্ষ্ণ হয়।

মানসিক পরিবর্তন

দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সমতা রেখে কিন্তু মানসিক পরিবর্তন হয় না। বুদ্ধির বিকাশ যেন খানিকটা থেমে যায়। অনেক মনোবিজ্ঞানীই মনে করেন ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। তবে এই সময় ছেলেমেয়েদের স্মরণশক্তি, মনোযোগ, ভাষা শেখার ক্ষমতা ইত্যাদি বাড়ে। বিমূর্তচিন্তা করার ক্ষমতা জন্মায়। তাদের আকস্মিক দৈহিক পরিবর্তন, ইন্দ্রিয়গুলোর পরিপূর্ণতা ও যৌন পরিণতি তাদের মানসিক জীবনে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে। এইটাকেই হলিংওয়ার্থ (Hollingworth) বলতে চনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই

বয়সের কিশোর-কিশোরীরা নানারকম কৌতূহল, অনুভূতি, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষার তাড়না অনুভব করে, সব সময় কাজে বীরত্ব ও সাহস দেখাবার চেষ্টা করে, বড়দের শাসনে তারা খানিকটা বিরক্ত হয়, ফলে তারা শাসনের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব পোষণ করে। তাদের মন অনেকটা রোমান্টিক হয়ে ওঠে—তারা এই সময় অ্যাডভেঞ্চারমূলক কাহিনী পড়তে খুব ভালবাসে।

প্রাক্ষোভিক পরিবর্তন

দৈহিক ক্ষেত্রে যেমন বিরাট পরিবর্তন হয়, এই বয়সে প্রাক্ষোভিক দিক থেকেও বেশ ভাল রকম পরিবর্তন দেখা যায়। এই স্তরে যৌনচেতনা প্রক্ষোভমূলক আচরণের অনেক পরিবর্তন ঘটায়। এই সময় ছেলেমেয়েরা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। কিশোর-কিশোরীরা অনুভূতির দিক থেকে ভাবালু ও কল্পনাপ্রবণ হয়ে ওঠে; অনেক সময় তারা দিবাস্বপ্ন দেখে। আত্মচেতনা তাদের মধ্যে বেশ প্রবল হয়ে ওঠে। এই জন্যই তারা নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

প্রাক্ষোভিক অস্থিরতা এই স্তরের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এই তীব্র আনন্দ প্রকাশ, আবার পরমুহূর্তে কিশোর কিশোরীদের বিমর্ষ দেখা যায়। অবহেলা ও তাচ্ছিল্যে এরা ক্ষুব্ধ হয়। লজ্জা, ভয়, অপরাধ ইত্যাদি প্রক্ষোভ একসঙ্গে মিশে এদের মনের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে।

এই সময়ের ছেলেমেয়েরা খুব অন্তর্দ্বন্দ্বেও ভোগে। ছোটদের সঙ্গে তারা ঠিকমত মিশতে পারে না আর বড়রা অনেক সময় পাত্তা দেয় না। নৈতিক সেন্টিমেণ্ট এই স্তরে বিকাশলাভ করে।

সামাজিক পরিবর্তন

কিশোর-কিশোরীদের আচরণ দেখলে মনে হবে এরা যেন অসামাজিক। দৈহিক পরিবর্তনই এদের বিহ্বল করে তোলে—এরা দৈহিক পরিবর্তনকে লুকিয়ে রাখতে চায়; কারণ লজ্জাবোধ করে।

দলপ্রীতিও এই স্তরে প্রবল হয়। কিশোর-কিশোরীরা দুঃসাহসী হয়, বীরপূজা করতে ভালবাসে। বাইরের জগতের প্রতি, সমাজের প্রতি এরা আকর্ষণ বোধ করে; সমাজের শৃঙ্খলা, অনুশাসন ও মূল্যবোধের সাথে নিজেদের সঙ্গতিবিধান করে। তাদের আদর্শ ও নীতিবোধ অনুসারে তারা সমাজের একটা রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে।

মানবতাবোধ ও জনকল্যাণমূলক কাজে এই বয়সের ছেলেমেয়েরা আত্মনিয়োগ করে। বাল্যকালের দলগুলি ভেঙ্গে যায় এই সময় ; নতুনভাবে দল বেঁধে এরা দরিদ্র ও আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। কিন্তু কৈশোরে ছেলেমেয়েরা খুব চিন্তাশীল হয়ে ওঠে বলে অন্যের দোষত্রুটিকে এরা বড় করে দেখে ; অনেক সময় সামান্য ব্যাপারে অযথা তর্ক করে এরা বাচালতার পরিচয় দেয়।

কৈশোরের চাহিদা

কৈশোরের মানসিক, প্রাক্ষোভিক বিকাশগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় এই সময় ছেলেমেয়েরা কতকগুলি চাহিদা ভিতর থেকে অনুভব করে। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী ষ্ট্যানলী হল, থর্নডাইক, কাইও, কিং, হলিংওয়ার্থ ইত্যাদি কৈশোরের বিভিন্ন চাহিদা ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছেন। যেমন—

(১) **স্বাধীনতা ও সক্রিয়তার চাহিদা**—মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছা কৈশোরে খুব প্রবল হয়। জন্মের পর থেকেই শিশু মা, বাবা, আন্যান্য আত্মীয় স্বজনের উপর খুব নির্ভরশীল থাকে। এই সময়েই প্রথম সে দায়িত্বশীল ব্যক্তির মত নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে স্বাধীনভাবে কাজ করতে চায়। এই বয়সী ছেলেমেয়ের মধ্যে আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস জন্মায় বলেই তাদের মধ্যে এখন সক্রিয়তার ও স্বাধীনতার চাহিদা দেখা দেয়।

(২) **সমাজ জীবনের চাহিদা**—কৈশোরে ছেলেমেয়েরা পরিবারের ছোট্ট গণ্ডি ছাড়িয়ে বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সঙ্গে পরিচিত হ'তে চায়। একই আদর্শযুক্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে কোন কল্যাণমূলক সামাজিক কাজে তারা অংশ গ্রহণ করতে চায়। সমাজের বয়স্ক মানুষরা তাদের কাজের স্বীকৃতি দিক এটাও তারা একান্তভাবে কামনা করে।

(৩) **নিরাপত্তার চাহিদা**—কিশোর-কিশোরীদের মনে নানারকম আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগে—কিন্তু কেমন করে এগুলি রূপ দেওয়া যাবে সেটাই তাদের কাছে বড় সমস্যা। বয়স্করা তাদের আচরণকে কোন দৃষ্টিতে দেখবেন এটা তারা বুঝে উঠতে পারে না। তিরস্কৃত হওয়ার ভয়ে তারা নিরাপত্তা বিঘ্নিত বলে মনে করে। তাছাড়া তাদের স্বাধীন চিন্তার বিকাশ হওয়ার পরেও মা বাবার উপর আর্থিক দিক থেকে নির্ভর করতে হয় বলে তাদের মনে হয় মা বাবা এতে বিরক্ত হ'তে পারেন। এর ফলেও তারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে।

(৪) **আত্মপ্রকাশের চাহিদা**—স্বাধীনতা ও যৌন চাহিদার সঙ্গে আত্মপ্রকাশের চাহিদাও দেখা দেয়। লেখা, পড়া, নাচ, গান, আঁকা, খেলাধূলা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে কিশোর-কিশোরীরা নিজেকে প্রকাশ করে ও অন্যের চোখে তাদের গুরুত্ব বাড়াতে চায়।

(৫) **আত্মনির্ভরতার চাহিদা**—আত্মপ্রকাশের চাহিদা থেকেই আত্ম-নির্ভরতার চাহিদাটি জন্ম নেয়। তারা যে কোন একটা বৃত্তি অবলম্বন করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়—কিছু উপার্জন করে আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হতে চায়।

(৬) **জ্ঞানের চাহিদা**—বাল্যকালে পরিবেশের যে কোন জিনিষের প্রতি শিশুদের কৌতূহলও আগ্রহ দেখা যায় কিন্তু কৈশোরে বিশেষ বিশেষ জিনিষের প্রতি তাদের কৌতূহল বাড়ে ও আগ্রহ গভীর হয়। ফলে তারা জিনিষগুলোকে ভাল করে বিশ্লেষণ করে। তবে সেগুলো সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানতে উৎসাহ বোধ করে।

(৭) **দুঃসাহসিক অভিযানের চাহিদা**—বয়স্কদের সামনে নিজেদের মর্যাদা বাড়ানর জন্য কিশোর-কিশোরীরা অনেক সময় দুঃসাহসিক কাজের ঝুঁকি নেয়। শান্ত গৃহকোণ আর এদের আকর্ষণ করতে পারে না। দুঃসাহসিক কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় এদের বিপদে পড়তে হয় কিন্তু সেগুলিকে এরা তেমন গ্রাহ্য করে না।

(৮) **নীতিবোধের চাহিদা**—জীবন সম্বন্ধে নানারকম জিজ্ঞাসা এদের মনে উঁকি দেয়। এই বয়সী ছেলেমেয়েদের অহংসত্তা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিস্তারলাভ করে। ফলে ভালমন্দ, ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে এদের একটা নিজস্ব মতামত গড়ে ওঠে, নিজেদের কাজ ও অন্যের কাজ এবা এইসব মাপকাঠিতে বিচার করে দেখে। নিজেদের অন্যায় কাজের জন্য এরা অনুশোচনা বোধ করে আবার অন্যের অন্যায় কাজের কঠোর সমালোচনা করতে এরা পিছপা নয়।

(৯) **যৌন তৃপ্তির চাহিদা**—শৈশবে যৌনতা দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু কৈশোরে এই বোধ অন্য লিঙ্গের প্রতি বিকাশ লাভ করে; এইজন্য যৌনতাবোধ তৃপ্তিলাভের জন্য পথ খোঁজে ও নানারকম আচরণের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

এই চাহিদাগুলি তীব্র আকার ধারণ করলেই কিশোর-কিশোরী এমন আচরণ করতে বাধ্য হয় যেগুলি সাধারণ বয়স্কদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার

করলে সমস্যামূলক আচরণ বলে মনে হয়। কিন্তু আচরণের কারণগুলি জানার চেষ্টা করলে ও সমস্যা দূর করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করলে তবেই সমস্যামূলক আচরণরত কিশোর-কিশোরীদের প্রতি সুবিচার করা হবে ও তাদের ঠিকপথে পরিচালিত করা যাবে। তারাই হ'য়ে উঠবে ধীরে ধীরে সমগ্র মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

কৈশোরের শিক্ষাব্যবস্থা

শিশু যখন কৈশোরে এসে পৌছয় তখন তাদের শিক্ষার স্তরও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আওতায় এসে পৌছয়। শিক্ষার দ্বারা যদি এইসব ছেলেমেয়েদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করা না যায় তবে মাধ্যমিক শিক্ষা তার তাৎপর্যই হারিয়ে ফেলবে। এই বিষয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষক, পরিচালক ও অন্যান্য সকল শিক্ষাকর্মীকে বিশেষ ভাবে নজর রাখতে হবে; কিশোর-কিশোরীদের চাহিদাগুলি জানতে হবে ও সেইভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কিশোরদের জীবন বিকাশের সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়গুলো হোলো—

(১) প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ব্যায়াম ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করা। কারণ দৈহিক পরিবর্তনের জন্যই এই বয়সের ছেলেমেয়েরা লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। দৈহিক পরিবর্তন সম্বন্ধে এরা যত কম সচেতন থাকে ততই মঙ্গল। দৈহিক ব্যায়াম, খেলাধূলা ও ব্রতচারী ইত্যাদির মাধ্যমে শরীরটা ঠিক মত গড়ে উঠবে, সেই সঙ্গে কতকগুলি আঙ্গিক কৌশলও শিখবে, আত্ম প্রকাশের চাহিদা মিটবে। মেয়েদের জন্যও খেলাধূলা ও নাচের ব্যবস্থা করা যায়। স্ট্যানলি হল বলেছেন—"Dancing is one of the best expressions and pure play and pure motor need of the yonth...."

(২) ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। বাড়ীতে যেমন মা বাবা এই বয়সী কিশোরদের জন্য ভাল ভাল খাদ্য সরবরাহ করবেন তেমনি বিদ্যালয়েও মধ্যাহ্ন জলযোগে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়ার কথা শিক্ষক চিন্তা করবেন।

(৩) সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার—কিশোর-কিশোরীরা স্নেহের কাঙাল; একটু মিষ্টি কথায় তাদের মন জয় করা যায়। সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা তাদের দিয়ে অনেক ভাল কাজ করান যায় ও তাতে অনেক সমস্যারও সহজ সমাধানের পথ খুলে যায়।

(৪) কৈশোর স্তরে ছেলেমেয়েরা রোমাঞ্চকর জিনিষ ও অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করে। সুদূরের পিয়াসা তাদের হাতছানি দেয়। তাই শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ এই সময় বিশেষভাবে তাদের মনের চাহিদা মেটায়।

(৫) ছাত্রছাত্রীদের দায়িত্ব দেওয়া—এই সময় ছাত্রছাত্রীরা দায়িত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করে আত্মমর্যাদা বাড়াতে চায়। তাই বিদ্যালয়ের উৎসব-অনুষ্ঠানগুলোতে ও পরিচালনার ব্যাপারে কিছু কিছু দায়িত্ব দিলে ফল ভালই পাওয়া যায়। এইজন্য বর্তমানে নানান নামে বহু ছাত্রসংসদ গড়ে উঠেছে।

(৬) প্রক্ষোভমূলক আচরণের পরিবেশ—এই সময় কিশোর কিশোরীদের মনে নানারকম প্রক্ষোভের সমাবেশ হয়। এই প্রক্ষোভগুলি যথাযথভাবে যাতে প্রকাশিত হতে পারে তার জন্য বিশেষ পরিবেশ রচনা করতে হবে। কোন কাজের জন্য তিরস্কার করলে এরা বিক্ষুব্ধ হয় ও তাদের মনে প্রাক্ষোভিক আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

(৭) এদের নীতি শিক্ষার দিকে নজর দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এই সময় কোনো জিনিষ তারা অন্ধভাবে গ্রহণ করে না। যুক্তি তর্ক দিয়ে বিচার করে তবেই কোন আদর্শের প্রতি এরা আকৃষ্ট হয়। কাজেই প্রত্যেকটি জিনিষকে বিশ্লেষণ করে তবেই এদের সামনে উপস্থিত করা উচিত।

(৮) অতিমাত্রায় কল্পনাপ্রবণ মনকে সংযত করা উচিত, অতিমাত্রায় কল্পনাপ্রবণ মন হলে ব্যক্তিত্বগঠনে বাধা সৃষ্টি হয় ও বাস্তবের সঙ্গে সংঘাত বাধে।

(৯) এই স্তরে সহশিক্ষা বর্জনীয় হওয়া উচিত। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি এমনিতেই আকর্ষণ বেশী থাকে, তাই মাধ্যমিক স্তরে সহশিক্ষা বর্জন না করলে বিদ্যালয়ে নানারকম সমস্যা দেখা দিতে পারে।

(১০) যৌনশিক্ষা কিছু পরিমাণে দেওয়া যায়—নানারকম পুস্তিকার সাহায্যে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ছেলেমেয়েদের যৌনজীবন সম্বন্ধে কিছু কৌতূহল মিটান যেতে পারে।

(১১) পাঠ্যক্রমের বিস্তৃতি ও সহপাঠ্যক্রমিক নানা বিষয়ের অবতারণার মধ্যে কৈশোরের অনেক চাহিদা মেটান যায়। তারা যত বেশী কাজে থাকবে ততই সমস্যা কম হবে।

(১২) ব্যক্তিগত চাহিদা অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করা একান্তভাবে প্রয়োজন। কারণ প্রত্যেকের প্রবণতা ও সামর্থ্য একরকম নয়—

কাজেই ব্যক্তিগত মনের খোরাক না পেলে তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যর্থ হবে।

(১৩) অবসর বিনোদনের জন্য নানারকম অভ্যাস গঠন করার সুযোগ করে দিতে হবে।

(১৪) কৌতূহল চরিতার্থ করা ও জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য ভাল পাঠাগারের সুযোগ গ্রহণে উৎসাহিত করবেন শিক্ষক।

(১৫) বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে শিক্ষার্থীকে ভালভাবে জানা যায় না। ছেলেমেয়েদের জানার জন্য অভিভাবকদের সহযোগিতা প্রার্থনা করা যেতে পারে। এজন্য অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি বিশেষভাবে কার্যকরী হতে পারে।

কৈশোরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে বন্যা আসে তাকে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা একান্ত প্রয়োজন। ইংল্যাণ্ডের হ্যাডো রিপোর্টে বলা হয়েছে—"There is tide which begins to rise in the face of youth at the age of 11 or 12" এ প্রসঙ্গে শিক্ষকদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানী রস্ বলেছেন—"...Only sufficient man and woman teachers be found who will espouse the great cause of nation's youth and devote their lives to its service.". এই কিশোর-কিশোরীরা জাতীয় সম্পদ হয়ে উঠতে পারে কিন্তু তাদের গঠনের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে হবে অর্থাৎ মানব সেবামূলক কাজে নিজেদের বিলিয়ে দিতে হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যৌন শিক্ষা (Sex Education)

যৌন আকাঙ্ক্ষাকে কোন কোন মনোবিজ্ঞানী জীবনের কেন্দ্রবিন্দু বলায় পক্ষপাতী। যেমন ফ্রয়েড বলেন মানুষের সবরকম কাজ কর্ম, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা ও প্রচেষ্টার মূলে আছে এই যৌন আকাঙ্ক্ষা। মনোবিজ্ঞানী শ্লটার বলেন —জীবনকে পুষ্পে পর্ণে সুশোভিত করে পূর্ণতা দান করছে এই আদিম আকাঙ্ক্ষা —"Like the overflow of a great river, it irrigates and fertilises great tracts of life's territory." ফ্রয়েড প্রমুখ মনঃসমীক্ষণবিদ্‌গণ যেমন বলতে চান সব কাজের উৎস যৌন আকাঙ্ক্ষা—একথা অন্যান্য মনোবিজ্ঞানিগণ সম্পূর্ণভাবে স্বীকার না করলেও তাঁরা যৌন চাহিদার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন এবং যৌন চাহিদা মানুষের জীবনের প্রাথমিক চাহিদার অন্যতম বলে বলেছেন।

সাধারণভাবে যৌন চাহিদাকে সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে— এটিকে যৌন আচরণ ও সন্তান উৎপাদনের সমার্থক মনে করা হয়। কিন্তু যৌন চাহিদার বিস্তৃতি অনেক ব্যাপক। যৌন চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্যই মানুষ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়াস পায়। এই চাহিদার সার্থক পরিতৃপ্তির ফলেই ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়, ব্যক্তির মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক বিকাশ এই যৌন জীবনের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। সুতরাং যৌন জীবনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ফ্রয়েড বলেন কোন ব্যক্তির যৌন জীবন হঠাৎ কৈশোরে ও যৌবনে এসে সুরু হয় না। জন্মের পর থেকেই শিশুর মধ্যে যৌনশক্তি কাজ করতে থাকে। মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগালও যৌন প্রবৃত্তিতে সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু শিশুর মধ্যে আমরা যৌন আচরণের প্রকাশ দেখি না কেন? এর উত্তরে ফ্রয়েড বলেন, শিশুর যৌন আচরণের বহিঃপ্রকাশ ও বয়স্কদের আচরণের বহিঃপ্রকাশের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে; শিশুদের যৌনচেতনা নিজের দেহের মধ্যেই পরিতৃপ্ত হয় প্রথমে, তারপরে পরের স্তরে মা, বাবাকে

"Sex– In psychoanalytic theory. Sex and Sexual are widened so as to include phenomena which have no direct bearing on reproduction, on the assumption that the pleasure derived is of the same order, is in fact essentially the same, in the case particularly of the young child, as that associated with sex phenomena in the strict sense—"

—Dictionary of Psychology.

কেন্দ্র করে এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়। এরপর কিছুদিন যৌন আচরণের বহিঃপ্রকাশ তেমন থাকে না। কৈশোর স্তরে যৌন অঙ্গের বিকাশের কাজ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার কিশোরদের মধ্যে যৌনতার লক্ষণ দেখা যায়। এর পরের স্তরে যৌবনেও এই লক্ষণ বেশ প্রকট থাকে। কাজেই জন্মের পর থেকেই যে প্রবণতা আমাদের মধ্যে বর্তমান থাকে তার গুরুত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

যৌনতাকে সঙ্কীর্ণ অর্থে দেখার ফলেই আমাদের সমাজ-জীবনে যৌনতা সম্বন্ধে কেমন একটা চুপ চুপ ভাব দেখা যায়। এর সঙ্গে লজ্জার সম্পর্ক জড়ান হয়ে থাকে। এই জন্য যৌন জীবনের প্রকৃত স্বরূপ অনেকেরই ধারণার মধ্যে থাকে না অথচ কৌতূহল প্রায় সবার মধ্যেই থাকে। যৌন জীবনকে কেন্দ্র করে এই ধরণের লুকোচুরি ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবন উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর।

যৌন জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিণতি

(১) যৌন জীবন যাপন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা না থাকার ফলে অনেকে অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে যৌন জীবন যাপন করা হয়, তার ফলে স্বাস্থ্যহানি হয়।

(২) যৌন জীবন সম্বন্ধে একটা চাপা মনোভাব থাকার দরুন যৌন জীবন-যাপনের পর একটা পাপবোধ মানুষের মনে আসে, এর ফলে অন্তর্দ্বন্দ্ব ইত্যাদি মানসিক বিকৃতি দেখা দেয়।

(৩) আমাদের সমাজে যৌন জীবন সম্বন্ধে একটা বিকৃত জীবনবোধ থাকে, তার ফলে জীবনকে কেন্দ্র করে জীবনের প্রকৃত মূল্যবোধ জাগে না। যৌন জীবনকে অবদমন না করলে জীবনের উন্নত মূল্যবোধ আসে না। এরকম ধারণা অনেকেরই মনে থাকে, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। যৌনতা যদি জীবনেরই অঙ্গ হয় তবে তার বিকাশকে বাদ দিয়ে জীবনে পরিপূর্ণ বিকাশ কেমন করে সম্ভব?

(৪) যৌন জীবন সম্বন্ধে অল্প জ্ঞান অনেক সময় বিবাহিত জীবনকে বিষময় করে তোলে।

(৫) বিবাহিত জীবনের যৌন অসুবিধা সন্তান-সন্ততির স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

(৬) অনিয়ন্ত্রিত যৌন আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হ'য়ে মানুষ সমাজে অনেক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

(৭) যৌন জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞতার দরুন অনেকে দায়িত্বহীনতার কাজ করতে বাধ্য হয়। অবৈধ সন্তান-সন্ততি সমাজের এক বিরাট বোঝা।

(৮) যৌন জীবন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকার ফলে দেশে ভয়াবহরূপে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমগ্র রাষ্ট্রের পক্ষেও এ এক বিরাট সমস্যা।

(৯) সন্তান উৎপাদন করেই যৌন জীবনের কাজ শেষ হয়ে যায় না, সন্তান-সন্ততি পালনের মধ্যেও বাবা, মার কতব্য আছে। এটির অভাব ঘটলে ছেলেমেয়ের মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে বাধ্য।

যৌন শিক্ষার ব্যবস্থা

নানান দিক থেকে বিবেচনা করে বর্তমান শিক্ষাবিদ্‌গণ যৌনশিক্ষাকে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আনার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। যদিও আমরা জানি এই শিক্ষাকে ঠিকভাবে দিতে না পারলে সুফলের চেয়ে কুফল কম হবে না। এই শিক্ষা দেওয়ার সময় তাই যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। বিদেশের উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থায় যৌন শিক্ষা আছে বলেই আমাদের এই শিক্ষা যেমন তেমন করে দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে সেই সব দেশের সমাজব্যবস্থা কেমন হয়েছে সে সম্বন্ধে অবগত হয়ে তবেই আমাদের এই শিক্ষাব পাঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

যৌন শিক্ষা কি

এখন দেখব যৌনশিক্ষা বলতে আমরা ঠিক কি বুঝি? যৌনশিক্ষা বলতে সাধারণ অর্থে বোঝায় যৌন জীবনযাপনের উপযোগী শিক্ষা। কিন্তু বর্তমানে যৌনশিক্ষাকে এতটা সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয় না। যে শিক্ষার সাহায্যে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের উপযোগী সুস্থ পরিবার জীবনযাপনের জন্য যথাযথ মনোভাব ও আচরণ গড়ে তোলা যায় তাকেই যৌনশিক্ষা বলা হয়। ফ্রেডারিক কিলাণ্ডার-এর কথায় এই মতের প্রতিধ্বনি শোনা যায়, যখন তিনি বলেন—"an education calculated to bring about adult attitudes and behaviour that assure desirable home making the establishing and building of families"......কাজেই দেখা যাচ্ছে যৌনশিক্ষা কেবলমাত্র জৈবিক জ্ঞানই নয়, এই শিক্ষাকে এক রকম সামাজিক প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। যথাযথ যৌন শিক্ষা না থাকলে ব্যক্তিজীবনের বিকাশ

যেমন ব্যাহত হয়, তেমনি প্রয়োজনমত যৌনজ্ঞান ব্যক্তিজীবনকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে। প্রকৃতপক্ষে যৌন শিক্ষা চরিত্র গঠনের জন্য শিক্ষার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হওয়া উচিত। যৌন শিক্ষা একটা বিশেষ বয়সের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষা নয়। যৌন জীবনের বিস্তৃতির কথা চিন্তা করে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা তাই এই শিক্ষাকে পরিবার জীবনের শিক্ষা বলার পক্ষপাতী। পরিবার জীবনের শিক্ষা এই কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এই যৌন শিক্ষার উপর কতখানি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য

এখন আমাদের দেখতে হবে যৌন শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত।

(১) সমাজজীবনে ও পরিবার জীবনে বিবাহ, পিতৃত্ব, মাতৃত্ব প্রভৃতির তাৎপর্য উপলব্ধি করা যৌন শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য।

(২) স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা ইত্যাদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকের মধ্যে এনে দেওয়া এই শিক্ষার আর একটি উদ্দেশ্য।

(৩) শিক্ষার্থীদের যৌন জীবন বিকাশে কোনরকম অপরাধবোধ যাতে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

(৪) পারিবারিক জীবনে পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী ইত্যাদির কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা।

(৫) যৌন জীবনে সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্য সম্বন্ধে অবহিত করা।

(৬) কেবলমাত্র যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য সমাজের একদল মানুষ অন্য দলকে শোষণ করে, এই শোষণের হাত থেকে তাদের বাঁচান।

(৭) অবৈধ যৌন সম্পর্কের বিপদ সম্বন্ধে সকলকে জানান।

(৮) যৌন জীবনের নানারকম অসুস্থতা দূর করা।

(৯) ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা আদর্শ স্থাপন করা।

(১০) যৌন জীবন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা দেওয়া ইত্যাদি।

যৌন শিক্ষার সংস্থা

এত যে প্রয়োজনীয় যৌনশিক্ষা—এই শিক্ষা দেওয়া যাবে কোন কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে? যৌন জীবনের মোট চারটি দিক আছে—ব্যক্তিগত দিক, পারিবারিক দিক, সামাজিক দিক ও ধর্মীয় দিক। যৌন জীবনের বিস্তৃতিও অনেকখানি। কাজেই অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানকে যৌনশিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। যেমন প্রথমেই ধরা যাক গৃহের কথা।

গৃহ—প্রত্যেক মানুষের প্রক্ষোভগুলিকে কেন্দ্র করে যৌনজীবন আবর্তিত হয়। এই প্রক্ষোভগুলির বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ গৃহ পরিবেশেই সম্ভব। গৃহ পরিবেশে থাকতে থাকতেই শিশুদের মনে যৌনজীবন সম্বন্ধে নানারকম কৌতূহল জাগে। এই কৌতূহল গৃহ পরিবেশ থেকেই নিবৃত্ত করা যায়। কিন্তু আমাদের সমাজে মা, বাবা অনেক ক্ষেত্রেই ছেলেমেয়েদের যৌন জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল নিরস্ত করতে গিয়ে বড়ই বিব্রত বোধ করেন। কিন্তু মা বাবার যৌনজীবন সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকলে ছেলেমেয়েকে খুব সহজভাবে এই বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন।

গোষ্ঠী জীবন—শিশুকে সব সময় গৃহের মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। তার সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে তাকে মিশতে দিতে হবে। বাল্যকালে বিশেষ করে কৈশোরে ছেলেমেয়েরা দলবদ্ধ হয়ে সব কাজ করতে চায়। এই সময় দলের প্রভাব তাদের উপর সবচেয়ে বেশী। যৌন জীবন সম্বন্ধে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের যদি ভাল ধারণা থাকে তবে একে অপরকে যৌন জীবনের যে কোন সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে পারবে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান—আমাদের সমাজে যৌন জীবনকে কেন্দ্র করে নানারকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বিবাহকে কেন্দ্র করেই আচার-অনুষ্ঠানের অন্ত নেই। এগুলির মধ্যে দিয়ে যৌন জীবন সম্বন্ধে নানান ধারণা দেওয়া যায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—শিশুর জীবনের মূল্যবান সময়ের অনেকখানিই বিদ্যালয়ে কাটে। তাই যৌনশিক্ষার বিষয়ে বিদ্যালয়কেও কিছু দায়িত্ব নিতে হয়। ব্যক্তিজীবনের বেশীরভাগ শিক্ষাকেই আজ সুনিয়ন্ত্রিত পরিচালনার অধীনে আসতে হয়েছে; জীবনের অধিকাংশ অভিজ্ঞতা সে বিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে পায়। সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শিশু যে জ্ঞান পায় তার মধ্যে অনেক ফাঁক থেকে যায়। সেই ফাঁক পূরণ করে বিদ্যালয়কে সমন্বয় সাধন করতে হয়। এখন দেখতে হবে বিদ্যালয়কে যদি যৌনশিক্ষা দিতে হয় তবে তার পাঠ্যক্রম কেমন হবে ও কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে এই শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রাথমিক স্তর না মাধ্যমিক স্তর—কোন স্তর থেকে এই শিক্ষা আরম্ভ হবে ?

যৌনশিক্ষার পাঠ্যক্রম (Sex Education curriculum)—যৌনশিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনা করার সময় শিশুদের বয়স ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জীবন বিকাশের স্তর চারটি—শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন।

শৈশব—অনেক মনোবিজ্ঞানী মনে করেন যৌন শিক্ষা শৈশব থেকেই সুরু হওয়া উচিত। যৌনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এমন অনেক প্রশ্ন জাগে শিশুমনে। যেমন "আমি কেমন করে হলাম? আমি এর আগে কোথায় ছিলাম? ভাইবোন কেমন করে হোলো? অমুক কেন ছেলে, আমি কেন মেয়ে,' ইত্যাদি ইত্যাদি? এগুলোর সদুত্তর দিতে সব বাবা মা-ই বিব্রত বোধ করেন। শৈশবের যৌনশিক্ষার দায়িত্ব বাবা মাকেই নিতে হয়। যথাসম্ভব শালীনতা বজায় রেখে শিশুদের যৌনজীবন সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। জন্ম রহস্য শিশুকে জানাতে হলে তাকে রূপকের সাহায্যে জানাতে হবে, যেমন পাখীর বাসাতে ডিম থেকে বাচ্চা হওয়া ইত্যাদি।

বাল্যকাল—ছয় থেকে ১০।১১ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর মনে আরও প্রশ্ন জাগে। ছেলেমেয়েতে পার্থক্য কোথায়, পুরুষদের সন্তান হয় কি না ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধানের জন্য পাঠ্যক্রমের মধ্যে কতকগুলি জিনিষ থাকলেই চলবে। (ক) ছেলে মেয়েতে পার্থক্যের ধারণা, (খ) দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম, (গ) নিজের দেহের যত্ন, (ঘ) প্রক্ষোভ সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা, (ঙ) বংশগতি সম্বন্ধে ধারণা, (চ) সমাজ ও পরিবারের প্রতি কর্তব্য ইত্যাদি। এগুলি স্বাস্থ্য, সমাজবিদ্যা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

কৈশোর—কৈশোরে যৌন অঙ্গের বিকাশ হয়। এই স্তরে ব্যক্তিত্ব দেহ ও মনকে কেন্দ্র করে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই এই স্তরে যৌনশিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৈশোরের পাঠ্যক্রম অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া উচিত। (ক) দৈহিক বিকাশ সম্বন্ধে ধারণা (খ) যৌন গ্রন্থির কাজ সম্বন্ধে ধারণা (গ) স্বাস্থ্যের উপর যৌন-জীবনের প্রভাব (ঘ) সামাজিক জীবনে যৌনতার গুরুত্ব নির্ণয় (ঙ) বিবাহিত জীবন ও বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব সম্বন্ধে ধারণা (চ) যৌন-জীবনের সঙ্গে জড়িত প্রক্ষোভ সম্বন্ধে জ্ঞান ও (ছ) যৌন অসুস্থতা সম্বন্ধে ধারণা —এই স্তরের পাঠ্যক্রমে অবশ্যই থাকা উচিত।

যৌবন—এই সময় ব্যক্তিত্ব পূর্ণতালাভ করে। কাজেই এখন যৌনশিক্ষা ব্যক্তির নিজের প্রচেষ্টা ও আগ্রহের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। তবুও প্রত্যেক ব্যক্তির যৌন ব্যাধি, সন্তান পালন, যৌন জীবনের সামাজিক গুরুত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

যৌনশিক্ষা দেওয়ার জন্য বিদ্যালয়ই একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্রে এমন কথা বলা যায় না। গৃহে, পরিবারে, সমাজে শিশু যাদের সাথে মেলামেশা করে

তাদের কাছ থেকেই শিশু এ বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। কিন্তু সেখানে অনেকে শিশুকে ঠিকমত পরিচালিত করতে পারে না—অনেক সময় বিকৃত ধারণা দেয় বলেই শিক্ষালয়ে এই শিক্ষা দেওয়ার কথা আজ চিন্তা করা হচ্ছে। তবে এই শিক্ষা সব সময় পরোক্ষভাবে দিতে হবে।

যৌনশিক্ষার পদ্ধতি (Method of Sex Education)—এবার আমরা দেখব কেমন করে যৌনশিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। যৌনশিক্ষার তিনটে দিক আছে—জ্ঞান, মনোভাব ও আচরণ। জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য পাঠ্যপুস্তক, পত্রিকা, মডেল, চার্ট, ছবি ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া যায়। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মনোভাব গঠনের জন্যে দলগত আলোচনা, মত বিনিময় প্রভৃতি প্রয়োজন। আচরণ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না. মাঝে মাঝে যৌন আচরণ ঠিক পথে চলছে কি না সে সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে মূল্যায়ন করা চলতে পারে মাত্র।

বিদ্যালয়ে শরীরতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, পৌরবিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে যৌনশিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। পাঠ্যক্রমে যৌনশিক্ষা বলে আলাদা কোন বিষয় সংযোজন না করাই বোধ হয় ভাল। গৃহপালিত পশু, পাখী ইত্যাদির জীবনযাত্রা শিশু যদি ভাল করে লক্ষ্য করে তবে জীবন রহস্য সম্বন্ধে সে অনেকখানি অবহিত হ'তে পারে।

শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের দায়িত্ব যদি বিদ্যালয়ের হয় তবে যৌন-জীবন বিকাশের দায়িত্বও নিশ্চয়ই বিদ্যালয়ের। শিক্ষককে এখন চিন্তা করতে হবে কেমন করে একটি শিশুর যৌনবিকাশকে ঠিক পথে পরিচালিত করবেন।

প্রথমে শিক্ষকের যৌন বিষয়ে নিজের বিজ্ঞানসম্মত ধারণা থাকবে। যৌনশিক্ষার প্রয়োজন আছে একথা শিক্ষক বিশ্বাস করবেন। শিক্ষক সঙ্কীর্ণ যৌনতার উর্ধ্বে উঠবেন। যৌন শিক্ষা দেওয়ার আগে শিক্ষার্থীর মানসিক চাহিদার দিকে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন। যৌন জীবন বিকাশের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সব সমস্যার সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে শিক্ষক উদার মত পোষণ করবেন। বিবাহিত জীবনে শিক্ষক নিজে সুখী হলে তবেই তিনি শিক্ষার্থীদের ঠিক পথে পরিচালিত করতে পারবেন।

যৌন জীবনের কতকগুলো বাহ্যিক আচরণের দিক আছে ; যেমন কৈশোরে

বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা ইত্যাদি। এই সময় শিক্ষক তাঁর নিজের আচরণের মধ্যে দিয়ে দেখাবেন যে বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি কিভাবে শ্রদ্ধাশীল হোতে হয়।

যৌনতার একটা সামাজিক, নৈতিক দিক আছে একথা শিক্ষক নিজে উপলব্ধি করলে তবেই ছাত্রছাত্রীদের এরূপ মনোভাব গঠনে সক্ষম হবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষক যৌনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে ধারণা দিতে চেষ্টা করবেন। অন্যথায় কি বিপদ হ'তে পারে সে সম্বন্ধেও তিনি তাদের অবহিত করবেন।

যৌন জীবনের সাথে অযথা অপরাধবোধ শিশুদের মধ্যে না জন্মায় সেদিকেও শিক্ষক খেয়াল রাখবেন, কারণ অপরাধবোধ ব্যক্তিবিকাশে বাধা সৃষ্টি করবে।

ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষক বিশেষ বিশেষ সমস্যা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন ও সমস্যা সমাধানের পথ বলে দেবেন।

এ সমস্ত ব্যাপারেই শিক্ষক পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিতে পারেন। তবে আমাদের দেশে যৌনশিক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় সাহিত্য ও রচনা এখনও ভালভাবে রচিত হয় নি। সেক্ষেত্রে যৌনশিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষককে প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হোতে হবে। ছায়াচিত্র ইত্যাদির সাহায্যে যে ধরণের যৌন শিক্ষার কথা অনেকে ভাবছেন তাতে দেখা যাচ্ছে—যৌনশিক্ষাকে ঠিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে দেওয়ার কোনো প্রচেষ্টাই নেই। বরং এতে কিশোর-কিশোরীরা অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হচ্ছে কিংবা বিকৃত যৌন জীবন যাপনে প্রলুব্ধ হচ্ছে। কাজেই যৌনশিক্ষা দিতে হবে মনে করলেই দেওয়া যায় না। এর জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতির দরকার। শিক্ষাস্তরের প্রত্যেক ক্ষেত্র থেকে বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত মতামত নিয়ে তবেই এ বিষয়ে পাঠ-কল্পনা রচনা করা যেতে পারে।

প্রশ্নাবলী

1. Write short notes on Sex Education.

(C. U. B. T. 1965)

2. Write an essay on the place of Sex Education in schools. (C. U. B. T. 1967)

3. Write an essay on 'Sex Education' at home and in school.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
শিশু পর্যবেক্ষণ (Child Study)

একটি মানবশিশু পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হতে গেলে বেশ কতকগুলি স্তরের মধ্যে দিয়ে তাকে আসতে হয়। এই স্তরগুলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে হলে শিক্ষককে শিশু পর্যবেক্ষণের সাহায্য নিতে হবে। শিশু পর্যবেক্ষণের অনেক পদ্ধতি আছে—কতকগুলি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হলে বিশেষজ্ঞের সাহায্যের দরকার হয়, আবার এমন কতকগুলি পদ্ধতি আছে যেগুলি যে কেউ অনুসরণ করতে পারেন। এখন আমরা সাধারণ পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করব।

(ক) স্বাভাবিক অবস্থায় শিশু পর্যবেক্ষণ (খ) নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় শিশু পর্যবেক্ষণ (গ) পারিবারিক তথ্য ও ইতিহাস সংগ্রহ (ঘ) শিশুর আঁকা ছবি ও কাজ অধ্যয়ন (ঙ) কতকগুলি বিশেষ কৌশল অবলম্বন (চ) শিশুর মা বাবার সঙ্গে কথোপকথন (ছ) শিশুর সামাজিক সম্পর্ক জানার পদ্ধতি গ্রহণ (জ) নাটন (ঝ) নানারকম অভীক্ষার সাহায্য গ্রহণ (ঞ) শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্কতা ও চিকিৎসা।

(ক) **স্বাভাবিক অবস্থায় শিশু পর্যবেক্ষণ**—এই পদ্ধতির সাহায্যে শিশুকে স্বাভাবিক অবস্থায় জানা যায়। শিশু যখন মা, বাবা ও সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে থাকে বা একলা থাকে সেই অবস্থায়ও তাকে পর্যবেক্ষণ করা যায়। তবে পর্যবেক্ষণের আগে কি কি জিনিষ লক্ষ্য করা উচিত তা ঠিক করে নিলে ভাল হয়। যেমন—(১) শিশুর স্বাস্থ্য (২) শিশুকে দেখে প্রথম কি ধারণা হয়—দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছা করে কিনা (৩) শিশুর আত্মবোধ কেমন (৪) বাধা দিলে বা সমালোচনা করলে সে কেমন ব্যবহার করে—অর্থাৎ রেগে যায় কিনা, সে কাজ থেকে বিরত থাকে কি না অথবা ভুল সংশোধনের চেষ্টা করে কিনা ইত্যাদি। (৫) শিশু তার সাফল্যের কথা কি সকলকে বলে বেড়ায়? (৬) শিশুর নিজের কাজে তার আগ্রহ আছে কিনা। (৭) খেলাধূলায় সে আড়ষ্ট কি না (৮) অন্তকে সাহায্য করার মনোভাব কেমন (৯) অন্ত সঙ্গীদের সাথে মিলেমিশে থাকতে পারে কিনা (১০) বয়স্ক ও অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি তার ব্যবহার কেমন (১১) কোন কোন বিষয়ে তার আগ্রহ আছে (১২) কোন বিষয়ে তার খুব বেশী ঝোঁক। (১৩) সে কি নিয়ম মেনে চলতে পছন্দ করে? (১৪) বড়দের

কথায় সে কেমনভাবে কাজ করে? (১৫) শিশুর জীবনের কোন বিশেষ সমস্যাকে চিহ্নিত করা ও তা সমাধানের চেষ্টা করলে তবেই শিশু পর্যবেক্ষণের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন হ'তে পারে।

(খ) **নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় শিশু পর্যবেক্ষণ**—শিশুর মনের খবর জানতে হলে তাকে নানা অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করতে হবে। একই অবস্থায় রেখে বিভিন্ন শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা যায়, আবার একটিমাত্র শিশুকে বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি করে পর্যবেক্ষণ করাও যায়, যেমন একটা ছবি বিভিন্ন শিশুকে দেখিয়ে প্রশ্ন করা যায়, আবার একটি শিশুকে বিভিন্ন ছবি দেখিয়েও প্রশ্ন করা যায়। এই প্রশ্নের উত্তর থেকে শিশুর ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজে তার আচরণের ফল কি হবে তা বিচার করাই হ'ল পর্যবেক্ষণের আর একটি লক্ষ্য।

পারিবারিক তথ্য ও ইতিহাস সংগ্রহ—কেবলমাত্র শিশুকে পর্যবেক্ষণ করে অতীত জীবন ও অন্যান্য বিষয় সবটা জানা যায় না। এ কাজে শিশুর মা ও আত্মীয় স্বজনের সাহায্য নিতে হয়। শিশুটি মা বাবার কত তম সন্তান; তার সঙ্গে মা বাবার সম্পর্ক কেমন; মা বাবার পারস্পরিক ব্যবহার শিশুর জীবনে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে; মা বাবার পেশা ও কাজ; শিশুর স্বাস্থ্য ও কোন দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে থাকলে তার খবর, তার আগ্রহ ও কাজ; খেলার সাথী, লেখাপড়ায় মনোযোগ ইত্যাদি মা বাবা ও আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

(ঘ) **শিশুর আঁকা ছবি ও কাজ অধ্যয়ন**—শিশুর সৃজনধর্মী মন সব সময় নিজেকে প্রকাশ করতে চায় কোন না কোন কাজের মাধ্যমে। শিশুর হাতের লেখা, আঁকা ছবি, রচনা ইত্যাদি অধ্যয়ন করলে শিশুর আত্মপ্রকাশের ধারাটা বোঝা যায়। খুব কমবয়সী শিশুর ছবি দেখলেই বোঝা যায়; মানুষ আঁকতে বললে একটা বড় গোল্লা করে তার সঙ্গে হাত, বুক, পেট, পা, যোগ করে দেয়, গলা থাকে না, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছোট বড় হয়ে যায়। ধীরে ধীরে সামঞ্জস্যের ধারণা জন্মায়।

(ঙ) **কতকগুলি বিশেষ কৌশল অবলম্বন**—শিশুর জন্য নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ তৈরী করতে হলে অনেক সময় বিশেষ বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে হয়। যেমন অসম্পূর্ণ বাক্য পূরণ করতে দেওয়া যায়—আমি একবার খুব ভয় পেয়েছিলাম কারণ...........আমার খুব রাগ হয় যখন......

এইসব প্রশ্নে শিশুর প্রক্ষোভ জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। শিশুর আগ্রহ

ইত্যাদি জানার জন্যও অসম্পূর্ণ বাক্য তৈরী করে শিশুকে সম্পূর্ণ করতে বলা যায়। অসম্পূর্ণ ছবি দেখিয়ে কি কম আছে জিজ্ঞাসা করা যায়।

(চ) **শিশুর মা বাবার সঙ্গে কথাবার্তা**—শিশুর মা বাবার সঙ্গে শিক্ষক খুব অমায়িক ব্যবহার করবেন, তাঁরা যেন মনে না করেন যে তিনি তাঁদের উপদেশ দিচ্ছেন। খুব দরদী মন নিয়ে শিক্ষক শিশুর পিতামাতার সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন ও মিশবেন। কথার মাঝেই শিক্ষক জেনে নেবেন শিশুর কোনো সখ আছে কিনা, পোষা জীবজন্তু আছে কিনা, সে কাউকে অপছন্দ করে কিনা ইত্যাদি।

(ছ) **শিশুর সামাজিক সম্পর্ক জানার পদ্ধতি গ্রহণ**—কোনো দলের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট শিশু কতখানি প্রিয় তা জানার জন্য শিক্ষক কতকগুলি প্রশ্ন করে তার উত্তর থেকে একটা পরিলেখ আঁকতে পারেন। এই পদ্ধতিকে ইংরেজিতে বলা হয় Sociometry। প্রত্যেক শিশুকে একটা করে কাগজের টুকরো দিয়ে বলতে হবে যে সে যাদের সঙ্গে খেলতে ভালবাসে এরকম তিন জনের নাম পরপর লিখতে। কাগজের টুকরো থেকে উত্তর নিয়ে একটা পরিলেখ চিত্র আঁকলে কে সবচেয়ে বেশী প্রিয় এক নজরে জানা যাবে।

এইভাবে অন্যান্য সামাজিক গুণ সম্বন্ধে জানতে হলেও এই পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। তবে শিক্ষকের মনে রাখতে হবে যে শিশুর সামাজিক সম্পর্ক খুব বেশীদিন স্থায়ী নাও হ'তে পারে। কারণ শিশুদের মন অতি দ্রুত পরিবর্তনশীল।

(জ) **নাটক**—বাইরের জীবনে শিশু যা দেখে তার প্রতিফলন হয় শিশুর মনে। একটা স্তরে শিশুর মন অত্যন্ত অনুকরণধর্মী হয়ে ওঠে। তখন সে সামনে যাকে পায় তাকেই অনুকরণ করে। মা, বাবা, মাষ্টারমশাই, বা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের নানারকম কাজ শিশু অভিনয় করে দেখায়। এইসব অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে প্রধানতঃ শিশুর অনুভূতি ব্যক্ত হয়।

(ঝ) **নানারকম অভীক্ষার সাহায্য গ্রহণ**—শিশুর বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, ইত্যাদি কি রকম তা জানার জন্য নানারকম অভীক্ষার সাহায্য নেওয়া যায়। তবে এই ধরণের অভীক্ষা রচনা করা, প্রয়োগ করা, ও সাফল্যাঙ্ক বার করা খুব সহজ নয়, এর জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন।

(ঞ) **শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্কতা ও চিকিৎসা**—শিশুর, ওজন, উচ্চতা, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ শক্তি, দাঁত ইত্যাদি ঠিক আছে কি না দেখতে হবে। শিশুর পক্ষে পুষ্টিকর এমন খাদ্য (বিদ্যালয়ে টিফিনের ব্যবস্থা থাকলে) দেওয়া যায়

অথবা মা বাবার সঙ্গে পরামর্শ করেও দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। শিশুর শারীরিক কোন অস্বাচ্ছন্দ্য ধরা পড়লে চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়ার জন্য শিক্ষক মা বাবার সঙ্গে আলোচনা করবেন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।

এইভাবে শিশু পর্যবেক্ষণের দ্বারা শিক্ষক শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারেন এবং এই ধারণার সাহায্যে শিশুর বিকাশে বিশেভাবে সাহায্য করতে পারেন। এই কাজের জন্য অবশ্য শিক্ষককে একটু পরিশ্রম ক'রে বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে পাওয়া তথ্যগুলির যথাযথ তাৎপর্য ব্যাখা করতে হবে ও সবগুলির মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়
বংশগতি ও পরিবেশ

মানুষের জীবনের বিকাশ হয় স্বাভাবিক নিয়মে। কিন্তু তবুও প্রশ্ন থেকে যায় এই বিকাশের প্রকৃতি কিসের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। জন্মের সময় থেকেই মানুষের মধ্যে এমন কী প্রবণতা থেকে যায় যা তার বিকাশের ধারাকে প্রভাবিত করতে পারে? যে পরিবেশে শিশু ধীরে ধীরে পূর্ণ মানুষে রূপান্তরিত হয়, সেই পরিবেশের প্রভাবই বা তার জীবন বিকাশের পথে কতখানি সাহায্য করে?

এইসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেছেন—একদল বলেন মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারণ করে বংশগতি অর্থাৎ মানুষ জন্মসূত্রে যে সব গুণ পেয়ে থাকে। আবার অন্যদল জোর গলায় ঘোষণা করেন—না, পরিবেশই মানুষের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের পক্ষে যথেষ্ট। তবে কোন একটি উপাদানকে এককভাবে মানুষের বিকাশের মূল কারণ বলা যায় না, বরং এদের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলেই মানুষের বিকাশ সম্ভব হয় এটা নিঃসন্দেহে আজ স্বীকার করা যায়।

বংশগতি

এখন আমরা দেখব বংশগতি বলতে আমরা কি বুঝি? বংশধারা বা

"Heredity, meaning simply the tendency of things to produce their own kind."—Beals and Hoijar.

"Heredtty is a slow motion picture of evolution."—Mary Adams.

Heredity কথাটি ল্যাটিন কথা Hereditas থেকে এসেছে—যার অর্থ হোল মানুষের মধ্যে এমন একটা নিজস্ব সম্পত্তি আছে, যেটা সে তার উত্তরাধিকারী-কে দিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে বংশগতি বলতে শিশুর জন্মসূত্রে পাওয়া কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যকেই বোঝায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে শিশু, মা, বাবা ও পরোক্ষভাবে অন্যান্য পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেও পেতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যের সম্ভাবনার বীজ নিয়েই শিশু জীবন পরিক্রমা সুরু করে; এর সঙ্গে সে যোগ করে তার জীবনের নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতাগুলি কিন্তু সে পরিবেশ থেকেই সঞ্চয় করে। কাজেই শিশুর জন্মসূত্রে পাওয়া গুণগুলি হল সহজাত এবং পরে অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ বৈশিষ্ট্যগুলি হল তার অর্জিত গুণ।

বংশগতির ধারা

মানবদেহ নানাপ্রকার কোষের সমষ্টি। বংশ উৎপাদনকারী পুরুষের কোষের নাম স্পার্ম (Sperm) ও স্ত্রীকোষের নাম ওভাম (Ovum)। বাবা, মায়ের কোষের মিলনের ফলেই জীবন আরম্ভ হয়; এই মিলিত কোষটি দ্বিধাবিভক্ত হ'তে হ'তে অসংখ্য কোষের সৃষ্টি করে তার ফলেই শিশুর (ভ্রূণাবস্থায়) বৃদ্ধি ও বিকাশ চলতে থাকে।

বাবা, মা'র জার্মকোষের মধ্যে ক্রোমোজোম (Chromosomes) এবং জিন্‌স্ (Genes) নামে কতকগুলি পদার্থ থাকে। প্রত্যেকটি ক্রোমোজোম অসংখ্য জিনের সমষ্টি, এবং এগুলিই বংশগতির ধারক ও বাহক। জিনগুলি আকারে অত্যন্ত ছোট। এক ইঞ্চির দুশোভাগের একভাগ হোল জিন—আলপিনের ছোট্ট মাথার মত দেখতে। এই জিনগুলির বিভিন্ন প্রকার মিলনের ফলেই শিশুর নানারকম বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়—যেমন ফর্সা, কালো, লম্বা, বেঁটে, মেধাবী অথবা নির্বোধ ইত্যাদি।

বাবা, মা'র জার্মকোষের প্রত্যেকটিতে ২৪ জোড়া করে ক্রোমোজোম থাকে। এইগুলি মিলিত হয়ে জাতকের গুণ ও বৈশিষ্ট্য স্থির হয়। বাবা, মা'র জিন্‌সের মিলনের ফলে যে পরিণাম হয় তাকেই বলা হয় বংশগতি।

"Life and environment are, in fact, co-relates."—Mac Iver & Page.
"Environment is any external force which influences us."—E. J. Ross.

বংশগতির কয়েকটি সূত্র

বহুদিন ধরে জীববিজ্ঞানীরা নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বংশগতির কয়েকটি সূত্র নির্ণয় করেছেন।

(১) প্রত্যেক প্রাণী তার নিজের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাণীরই জন্মদানে সক্ষম (Like tends to beget like)। শিশু সাধারণতঃ তার বাবা মায়ের আকৃতি, রঙ, বুদ্ধি নিয়ে জন্মায়। তবে এর ব্যতিক্রম যে একেবারে নেই এমন কথা বলা যায় না। তার জন্য আবার আলাদা সূত্র আছে।

(২) ব্যতিক্রম ব্যাখ্যা করার জন্য আছে পার্থক্যের সূত্র (Law of variation)। ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা মায়ের অবিকল নকল হয় না। ভাইবোনের মধ্যেও অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়; তবে পার্থক্যের মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য থাকে যা সম্বন্ধহীন বাইরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায়।

(৩) বংশগতির তৃতীয় সূত্রটিকে বলা হয় প্রত্যাবৃত্তির সূত্র (Law ot filial régression)। অতি প্রতিভাশালী বাবা মায়ের ছেলেমেয়েরা অনেক সময় অতটা প্রতিভাশালী হয় না। যেমন রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বিদ্যাসাগর ইত্যাদির ছেলেমেয়েরা বাবার মত প্রতিভাশালী বলা যায় না। আবার অতি কম বুদ্ধিমান বাবা মায়ের সন্তান সব সময় অত কমবুদ্ধি সম্পন্ন নাও হতে পারে। এই দুই চরম অবস্থা থেকে ছেলেমেয়েদের একটা মাঝামাঝি অবস্থায় ফিরে আসার প্রবণতাকেই প্রত্যবৃত্তি বলা হয়।

বংশগতির সূত্র সম্বন্ধে জার্মান প্রাণিবিদ্ ওয়েজম্যান (Waisman) বলেন—(১) জননকোষের নিরবচ্ছিন্নতা হল একটা সূত্র যার অর্থ হোল জননকোষটি বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হবে। (২) দ্বিতীয় সূত্র হোল অর্জিত বৈশিষ্ট্যের অ-সংক্রমণ—বাবা মায়ের অর্জিত গুণ সন্তানের মধ্যে সাধারণত সঞ্চারিত হয় না। বাবা মায়ের কেউ যদি ভাল ছবি আঁকেন বা ভাল গান করেন—ছেলেমেয়েরা তা পারবে এমন কোন স্থিরতা নেই।

গালটনের সূত্র

অনেক সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে এমন গুণ দেখা যায় যা বাবা মায়ের মধ্যে ছিল না। এই সমস্যা সমাধানের সূত্র হিসাবে ফ্রান্সিস গালটন (Francis Galton) বলেন বংশগতির ধারায় আমরা যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করি তার কিছু

অংশ আসে প্রত্যক্ষভাবে বাবা মায়ের কাছ থেকে, আর কিছু অংশ আসে পরোক্ষভাবে অন্যান্য ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে। শিশু তার বৈশিষ্ট্যের $\frac{1}{2}$ অংশ পায় বাবা মায়ের কাছ থেকে, $\frac{1}{4}$ অংশ পায় দাদু-দিদিমা শ্রেণীর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে ; $\frac{1}{8}$ অংশ পায় তার পূর্ববর্তী বংশধরদের কাছ থেকে। এমনিভাবে ক্রমঅনুসারে শিশু পূর্ববর্তী বংশধরদের কাছ থেকে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। কাজেই বাবা মায়ের মধ্যে কোন বিশেষ গুণ হয়তো ছিল না কিন্তু শিশুর যে কোন পূর্বপুরুষের মধ্যে সে গুণের অস্তিত্ব থাকলে শিশু তা পেতে পারে।

মেণ্ডেলের তত্ত্ব

বংশগতিতে পার্থক্য কি করে আসে তা ব্যাখ্যা করতে এগিয়ে আসেন মেণ্ডেল। মেণ্ডেল গোলদানা ও কোঁচকানো মটরশুঁটির দানা মিশিয়ে কি জাতীয় শুঁটি পাওয়া যায় তা নিয়ে পরীক্ষা কাজ চালান। দুটি দানার সংমিশ্রণে যে দানা জন্মাল, তা বিশুদ্ধ গোলদানা নয়—দানাগুলো দেখতে অনেকটা গোল হলেও তাদের মধ্যে কোঁচকানোর বৈশিষ্ট্য নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থেকে গেল। এই নতুন গোলদানা মটরশুঁটি থেকে যে শুঁটি জন্মাল তার মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ বিশুদ্ধ গোল, শতকরা ২৫ ভাগ কোঁচকানো আর বাকি ৫০ ভাগ মেশান গোলদানা। এর পরের বার দেখা গেল বিশুদ্ধ গোল থেকে বিশুদ্ধ গোলদানা মটরশুঁটি ও বিশুদ্ধ কোঁচকানো দানা থেকে বিশুদ্ধ কোঁচকানো দানার মটরশুঁটি জন্মেছে। কিন্তু মেশান দানা থেকে শতকরা ২৫ ভাগ বিশুদ্ধ গোল ও শককরা ২৫ ভাগ বিশুদ্ধ কোঁচকানো ও বাকি ৫০ ভাগ মেশান দানা জন্মেছে। মেণ্ডেলের এই সূত্র উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজগতে বার বার প্রয়োগ করা হয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রেও বংশধারার প্রকৃতিকে খানিকটা এই সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়।

ডঃ হরগোবিন্দ খোরানার মতবাদ

আধুনিক জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন প্রত্যেক ক্রোমোজোমের মধ্যে অসংখ্য দানার মত জীন থাকে এবং এইগুলিই হোল বংশগতির প্রকৃত ধারক ও বাহক। এই জীনগুলি জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী করা। এদের পৃথকভাবে অনুশীলন করা সম্ভব হয়েছে। কোন মানুষ কি ধরনের বংশগতি পাবে তা

নির্ভর করবে সে কি ধরনের জীনের সমন্বয়ের অধিকারী তার উপর। ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা জীন বিশ্লেষণ করে ও কৃত্রিম জীন তৈরী করে বংশগতির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। এর উপর নির্ভর করে বংশগতি সম্বন্ধে আরও নতুন নতুন তথ্য জানা যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বংশগতিবাদীদের যুক্তি

একদল মনোবিজ্ঞানী আছেন যারা মনে করেন মানুষকে শিক্ষার দ্বারা মার্জিত করার আগে তাকে আদর্শ বংশগতির অধিকারী হতে হবে। মানুষের মানসিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে হলে বংশগতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে একথা তাঁরা বিশ্বাস করেন।

বংশগতিবাদীদের মধ্যে প্রথমেই গালটনের নাম বলতে হয়। তিনি ৯৭৭ জন বিখ্যাত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনদের জীবন বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছিলেন যে তাদের ৫৩৬ জন জীবনে প্রতিষ্ঠিত। আবার ৯৭৭ জন সাধারণ ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে জেনেছিলেন যে তাদের মধ্যে মাত্র ৪ জন জীবনে প্রতিষ্ঠিত। এর থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে মানুষের প্রতিষ্ঠার মূলে আছে তার বংশগতি।

এরপর কার্ল পিয়ার্সান নামে আর এক মনোবিজ্ঞানী ওয়েজউড-ডারউইন-গাল্টন (Wedgewood-Darwin-Galton) পরিবারের এক হাজার বছরের বংশতালিকা তৈরী করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে এই পরিবারের পাঁচ পুরুষের বিভিন্ন ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, এই বংশের ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা লক্ষ্য করে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়।

প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছেন নিউইয়র্ক জেলের অধিকর্তা ডাডগেল, (R. L. Dudgale) তিনি কয়েদীদের মধ্যে একই ধরনের পদবী লক্ষ্য করে জানলেন যে তারা প্রায় একই বংশ জিউক (Jukes) পরিবারের লোক। এই পরিবারের প্রধান ছিলেন একজন ভবঘুরে দুশ্চরিত্র লোক। তার থেকে পাঁচ পুরুষের লোকের বৈশিষ্ট্য ডাডগেল লক্ষ্য করে দেখেছেন যে তাদের মধ্যে অধিকাংশ সমাজ বিরোধী। এর থেকে

তিনি মন্তব্য করেন যে বংশগতির প্রভাবেই কোন ব্যক্তির মধ্যে সমাজ বিরোধী মনোভাব দেখা যায়।

গডার্ড ঠিক একইভাবে ক্যালিকাক (Kalikak) ছদ্মনামে এক পরিবারের বংশতালিকা প্রস্তুত করেন। মার্টিন ক্যালিকাক নামে ব্যক্তিটির দুই বিয়ে—এক স্ত্রী বুদ্ধিমতী ও মার্জিত, নাম এলিজাবেথ—অপর জন ক্ষীণবুদ্ধি ও অসৎকুলোদ্ভবা। বুদ্ধিমতী স্ত্রীর সন্তানরা বুদ্ধিমান ও স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আর ক্ষীণবুদ্ধি স্ত্রীর সন্তানরা ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন ও অসামাজিক, কাজেই এসব থেকে তিনি অনুমান করেন বংশগতির প্রভাব এখানে অনেক বেশী।

মনোবিজ্ঞানী উইনশিপ্ গর্ডাডের মত একটি পরিবারের অনুশীলন করে দেখান যে এডওয়ার্ড নামে এক ব্যক্তি দুবার বিয়ে করে বংশগতির ধারা দুদিকে প্রবাহিত করতে সক্ষম হন।

টারম্যান (Terman) ক্যালিফোর্ণিয়া'র এক হাজার প্রতিভাশালী শিশুর সঙ্গে তাদের বাবা মায়ের বুদ্ধির তুলনামূলক বিচার করে দেখান যে ছেলে-মেয়েদের বুদ্ধি বংশগতির উপর অনেকখানি নির্ভর করে।

যমজ সন্তান দুরকমের হ'তে পারে—সমকোষী (বাবা মায়ের অভিন্ন জনন কোষ থেকে উদ্ভূত) ও ভিন্ন কোষী (ভিন্ন জনন কোষ থেকে উদ্ভূত)। মনোবিজ্ঞানী নিউম্যান—ফ্রেড (Fred) এবং এডুইন (Edwin) নামে দুজন যমজকে ছোটবেলা থেকে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে রেখে মানুষ করতে থাকেন। তাদের ২৬ বছর বয়সের সময় দেখা গেল শারীরিক বৈশিষ্ট্য—গায়ের রং, চুল, ওজন এসব তো এক, এমন কি বুদ্ধ্যঙ্কও এক, কেবলমাত্র ভিন্ন পরিবেশের জন্য দুজনে দুরকম কাজ করে।

এইসব পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে বংশগতিবাদীরা বলেন জন্মগত সম্ভাবনা ছাড়া জীবন বিকাশের কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই তাঁরা মানুষের জীবন বিকারের ও বৈষম্যের মূল কারণ হিসাবে বংশগতিকে নির্ধারণ করেছেন। মনোবিদ্ উইগাম বংশগতির উপর জোর দিয়ে বলেছেন—"Heredity not environment is the chief maker of men........"

বংশগতিবাদীরা মনে করেন মানুষের গায়ের রঙ, চুলের রঙ, চোখের রঙ, রক্তের শ্রেণী, উচ্চতা, ওজন ইত্যাদি দৈহিক গুণাবলী বংশগতির সাহায্যে পাওয়া। আর মানসিক দিক থেকে বুদ্ধি, সংগীত প্রবণতা, ব্যক্তিত্বের কোন কোন গুণ ইত্যাদিও বংশগতি সূত্রে মানুষ পায়। বংশগতির উপর

প্রাধান্য দিতে গিয়ে নান্ সাহেব বলেছেন পরিবেশে মানুষের গুণগুলি জন্মায় না—গুণের বিকাশ হয় মাত্র। মানুষের মধ্যেকার সুপ্ত সম্ভাবনাই শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের প্রধান সর্ত যার উপর নির্ভর করে তার শিক্ষার সম্ভাবনা নির্ণয় করা যায়। ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে বাবর, শিবাজী, রণজিৎ সিংহ, রাণা প্রতাপ ইত্যাদির নাম উল্লেখ করে বলা যেতে পারে যে কি প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রাম করেও তাঁরা নিজেদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রেখে ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে গেছেন। এখানে পরিবেশ তো প্রতিকূল—কেবলমাত্র বংশগতির অমোঘ প্রভাবেই এই রকম দৃষ্টান্ত সম্ভব হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাবিদদের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশোই প্রথম শিশুর বংশগতির দিকে সকলের দৃষ্টি ফেরান। তারপর মনোবিজ্ঞানীরা এই নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন।

মানসিক বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশ

যাঁরা পরিবেশের উপর গুরুত্ব দেন তাঁরা আবার বংশগতির গুরুত্বকে স্বীকার করতে চান না। তাঁরা বলেন ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও বৈষম্য পরিবেশ দ্বারাই নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

মনোবিজ্ঞানী ওয়াটসান বংশগতিবাদীদের বলেন—'আমাকে ১৬ জন সুস্থ শিশু দিন আমি তাদের বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে পূর্ণতা এনে দে ।' ফরাসী দার্শনিক হেলভিসিয়াস, জন লক্, রবার্ট আওয়েন প্রভৃতি এই মত সমর্থন করেন। আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী ক্যাটেল কুলপঞ্জী অনুশীলন করে বলেন মানুষের চিন্তার বিকাশ, নানা প্রকার সুযোগ, আর্থিক সঙ্গতি, আদর্শ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত ; এগুলির উপর নির্ভর করে ব্যক্তিত্বের বিকাশ।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইস্টার ব্রুক বলেন, ডাগডেলের জিউক পরিবারের উদাহরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তাদের সামাজিক পরিবেশের উন্নতির ফলেই মানসিক উন্নতি হয়েছিল। কাজেই তিনি পরিবেশের প্রভাবের গুরুত্ব বিশ্বাস করেন।

আমেরিকার জাতীয় শিক্ষা সংক্রান্ত অনুশীলন সংস্থার মাধ্যমে বারবারা বার্কস্ একটি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে পরিবেশের প্রভাব দেখান। তিনি এক

"Circumstances of life are to men what rocks and winds and currents are to a ship ; merely accidents what make their qualities manifest but have nothing whatever do with producing them. T. P. Nunn

বছর বয়সের ২০৪ জন ছেলেমেয়েকে বুদ্ধি ইত্যাদি পরীক্ষা করে পোষ্য নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তারপর তিনি শিশুদের প্রকৃত মা বাবা ও পালিত মা, বাবার বুদ্ধি পরিমাপ করেন। এরপর তাদের বুদ্ধির সঙ্গে শিশুদের বুদ্ধির তুলনামূলক প্রভাব বিচার করে দেখান যে পালক পিতামাতার প্রভাবে শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্কের ৭—২০ পয়েন্ট পর্যন্ত পরিবর্তন হয়। তিনি তাই বলেন শিশুদের সামগ্রিক পার্থক্যের জন্যও পরিবেশ অনেকখানি দায়ী। মনোবিদ্ লীহি মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা করে বার্ক্‌সের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করেন।

ফ্রীম্যান হোলৎজিঙ্গার, মীচেল প্রভৃতি যমজ সন্তানের উপরও পরীক্ষা চালিয়ে দেখিয়েছেন যে পরিবেশ ভিন্ন হলে তাদের দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যও ভিন্ন রকম হয়।

মনোবিদ ক্যাটেল আমেরিকার কয়েকজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের জীবনী অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন যে তাঁদের মধ্যে অনেকেরই বংশগতি ভাল ছিল না তা সত্বেও তাঁরা উন্নত বুদ্ধির ও প্রতিভার অধিকারী হয়েছেন।

বনে জঙ্গলে লালিত পালিত হয়েছে এমন মানবশিশু পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা তাদের আচরণ ও জীবনযাত্রা দেখে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে পরিবেশের প্রভাবে মানুষের বংশগতি লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন অ্যাভিরণের বন্যবালক, নেকড়ে বালক রাঁমু, মেদিনীপুরের জঙ্গলে পাওয়া কমলা ইত্যাদিরা প্রত্যেকেই মানব শিশু, তা সত্বেও তারা বন্য জন্তুদের সঙ্গে থেকে পরিবেশের প্রভাবে প্রায় বন্য জন্তুতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তাদের আচার-আচরণ, খাদ্যগ্রহণ প্রণালী, হাঁটা-চলা সবই প্রায় বন্য জন্তুদের মত।

একদল যাযাবর, ভবঘুরে ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এদের মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়েছে প্রতিকূল পরিবেশের জন্যই।

অধ্যাপক ওয়েলম্যান বলেছেন পরিবেশ যত ভাল হবে বুদ্ধ্যঙ্কও তত বাড়বে, পরিবেশ খারাপ হলে বুদ্ধ্যঙ্কও কমে যাবে।

রাশিয়ার বিজ্ঞানী মিচুরিন ও লাইসেংকো পরিবেশ পরিবর্তন করে বংশগতিকেও পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়েছেন। গমের চাষে তাঁদের পরীক্ষা বিশেষ ভাবে কার্যকরী হয়েছে। আবহাওয়া পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের গম উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন।

বংশগতি ও পরিবেশ সম্বন্ধে আধুনিক মত

বংশগতিবাদীরা বলেছেন ব্যক্তিগত বৈষম্য ও ব্যক্তি জীবনের বিকাশের

ধারা বংশগতির সাহায্যে নির্ধারিত হয়। আবার পরিবেশবাদীরা বলেন, ব্যক্তিজীবন বিকাশের জন্য দায়ী একমাত্র পরিবেশ। দুই চরম মতের সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছেন আধুনিক মনোবিজ্ঞানিগণ। তাঁরা মনে করেন ব্যক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে বংশগতিবাদ যেমন চরম কথা নয়, তেমনি পরিবেশবাদও শেষ কথা—এমনটি বলা যায় না। এই দুইয়েরই প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে দেখতে হবে ব্যক্তিজীবনের বিকাশের হার কি ভাবে বাড়ান যায় এবং বংশগতি ও পরিবেশের কোন উপাদানকে কতখানি সক্রিয় করা যায়। এই প্রসঙ্গে আমরা পার্সী নান এর উক্তি স্মরণ করে দেখতে পারি। তিনি বলেছেন ...The actual problem is not to choose one of the horns of a dilemma but to decide how much two distinct influences contribute to human development." সুতরাং প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে দুটো উপাদানের মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নেওয়া নয়—দুটি উপাদানের কতটুকু মানব বিকাশের কাজে লাগান যায় সেটা ঠিক করাই সমস্যা।

প্রত্যেক মনোবিজ্ঞানী যখন বংশগতি ও পরিবেশ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তখন যে কোন একটির পক্ষে রায় দিয়েছেন, অন্যটির প্রাধান্য অস্বীকার করেছেন।

বংশগতির প্রভাবে শিশু কতকগুলি দৈহিক ও মানসিক সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায় ঠিকই, কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ না পেলে সেগুলি বিকশিত হতে পারে না। বংশগতি সূত্রে পাওয়া সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায় যদি উপযুক্ত পরিবেশের অভাব ঘটে। রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপীয়ার, বিটোভেন ইত্যাদি আফ্রিকার জঙ্গলে যদি মানুষ হতেন তবে তাঁদের আমরা এইভাবে প্রতিভাধর হিসাবে পেতাম কি ? অতএব ব্যক্তিসত্তার বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশ—উভয়ের প্রভাব অনস্বীকার্য। স্যাণ্ডিফোর্ড (Sandiford) যথার্থই বলেছেন—"Heredity and environment are correlative factors." দুটি উপাদান পরস্পর বিপরীত বা বিরুদ্ধ তো নয়ই—বরং একটি অপরটির পরিপূরক।

বংশগতি অনেকটাই পূর্ব নির্ধারিত। পরিবেশের প্রভাবে যথার্থ সম্ভাবনাকে অদল বদল করা যায় না—বিকশিত হতে সাহায্য করা যায় মাত্র। ভাল বীজকে যেমন মাটি সার জল দিতে হয় আবার পোকামাকড়ের হাত থেকেও রক্ষা করতে হয়, তেমনি ব্যক্তিসত্তা-বীজকে অনুকূল পরিবেশ তৈরী করে বিকশিত হ'তে সাহায্য করতে হয়, আবার প্রতিকূল অবস্থা দূর করতে হয়।

একটা মানবসত্তা বংশগতি ও পরিবেশের যোগফল নয় বরং এটিকে বংশগতি ও পরিবেশের গুণফল বলা যায়।

যদি পরিবেশকে উন্নত করা যায় তবে ব্যক্তিগত পার্থক্য বাড়বে—কমার সম্ভাবনা কম।

পরিবেশ কিন্তু পরিবর্তন সাপেক্ষ; সারাজীবন ধরে একে পরিবর্তন করে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায়।

বংশগতি শরীর, মন, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রভাবশালী কিন্তু কোন ব্যক্তির সামাজিক ও নৈতিক গুণগুলি অনেকটাই তার পরিবেশের উপর নির্ভর করে।

মা বাবার কোন অর্জিত গুণ সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে বর্তাবে এমন কথা বলা যায় না। আসলে মা বাবার সৃষ্ট পরিবেশ থেকেই সন্তান সন্ততি মা বাবার অর্জিত গুণগুলি ধীরে ধীরে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়।

শিশুর অভ্যাস ও চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে বংশগতির চেয়ে পরিবেশ অনেক বেশী প্রভাবশালী।

স্যাণ্ডিফোর্ড বংশগতিকে জৈবিক বংশগতি ও পরিবেশকে সামাজিক বংশগতি বলার পক্ষপাতী। তিনি বলেন শিশু তার জৈবিক বংশগতি নিয়ে জীবন পরিক্রমা সুরু করে কিন্তু সামাজিক বংশগতির মধ্যে সে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে। জৈবিক বংশগতির উপর আমাদের কোন হাত নেই—এটি অপরিবর্তনীয় ও পূর্ব নির্ধারিত কিন্তু শিশুর সামাজিক বংশগতিকে আমরা অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ ও সমৃদ্ধ করতে পারি এবং শিশুর বিকাশে সাহায্য করতে পারি।

শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বংশগতিবাদীরা বলেন—যে শিশুর বংশগতি ভাল তার শিক্ষাও ভাল হবে। আর যে সব শিশু বংশগতভাবে ভাল দৈহিক ও মানসিক গুণ পায় না, তাদের হাজার চেষ্টা করে আদর্শ শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ করেও আশানুরূপ জ্ঞানলাভ করান যাবে না। এঁরা বলতে চান গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা যায় না। আম গাছে কাঁঠাল ফলান কি সম্ভব? "You can not make a silk purse out of a sow's ears". বীজ থেকে গাছ হয় আমরা জানি। এটা কেমন করে সম্ভব হয়? বীজের মধ্যে

........."Child is born with a biological heritage, he is born into a social heritage." —Sandiford

মহীরুহের সমস্ত সম্ভাবনা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। তার ফলেই অনুকূল পরিবেশে সেটি মহীরুহে পরিণত হয়। কাজেই এঁরা বলতে চান শিক্ষাক্ষেত্রে বংশগতির প্রাধান্ত বেশী।

আবার পরিবেশবাদীরাও তাঁদের স্বপক্ষে অকাট্য যুক্তি দেখাতে ছাড়েন না। তাঁরা বলেন শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবেশই বড় কথা। পরিবেশ বংশগতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এমনকি পরিবর্তনও করতে পারে। কোন কোন পরিবেশ যেমন কোন শিশুকে উন্নত ও প্রতিভাশালী করে তুলতে পারে, তেমনি আবার তাকে অসামাজিক এবং উচ্ছৃঙ্খলও করতে পারে। প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের অনেকেই পরিবেশের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। যেমন রুশো বংশগতিকে প্রাধান্য দিলেও পরিবেশের গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারেননি।

বর্তমানকালের প্রগতিবাদী বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে পিতামাতার অর্জিত গুণও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে সন্তানসন্ততির মধ্যে বর্তাবে। ম্যাকডুগাল ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে আলোকিত পথে ইঁদুরগুলি যেতে গিয়ে যে ইলেকট্রিক সক্ খেত তা তাদের পরবর্তী বাচ্চাদেরও মনে সংক্রামিত হয়েছিল।

রাশিয়ার বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী প্যাভলভ বলেছেন পিতামাতার অর্জিত গুণ ছেলেমেয়েদের মধ্যেও দেখা যেতে পারে যদি পরিবেশকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

মনোবিজ্ঞানী উড্‌ওয়ার্থ ও মারকুইস্ কিন্তু বংশগতি ও পরিবেশ উভয়ের উপরই সমান গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষপাতী। তাঁরা বলেন প্রত্যেক ব্যক্তি বংশগতি ও পরিবেশের সার্থক সংমিশ্রণের ফলশ্রুতি। কাজেই একটিকে বাদ দিলে অপরটি অর্থহীন হয়ে পড়বে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বংশগতি ও পরিবেশ

এখন আমরা দেখব শিক্ষাক্ষেত্রে বংশগতি ও পরিবেশকে কি ভাবে কাজে লাগান যায়। শিক্ষার উদ্দেশ্যই তো হোল ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ; আর এই বিকাশের মূলে আছে বংশগতি ও পরিবেশের সমন্বিত প্রভাব। শিক্ষাক্ষেত্রে শুধুমাত্র বংশগতির প্রভাব যদি আমরা স্বীকার করে নিই, শিক্ষা ও শিক্ষকের গুরুত্বকে তাহলে আমাদের অস্বীকার করতে হয়। শিক্ষার্থী যখন

বিদ্যালয়ে আসে তখন কিছু সে জন্মগত ক্ষমতা নিয়েই আসে; সেগুলোকে শিক্ষক হয়তো সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। কিন্তু শিক্ষক পরিবেশকে এমনভাবে সমৃদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন যাতে করে শিশুর বিকাশ অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলতে পারে। বিদ্যালয়ে সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে বংশগতি ও পরিবেশের নীতিকে কিভাবে শিক্ষক কাজে লাগাতে পারেন এখন আমরা তা দেখব।

(১) শিক্ষার্থীদের মধ্যে বংশগতি ভেদে ব্যক্তিগত বৈষম্য থাকবেই; এই বৈষম্য কোন বিষয়ে কতখানি তা শিক্ষক প্রথমে অভীক্ষা প্রয়োগ করে পরিমাপ করার চেষ্টা করবেন।

(২) শিক্ষক বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ উন্নতি করায় চেষ্টা নিশ্চয়ই করবেন। বিদ্যালয়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বসার ব্যবস্থা, পাঠাগারের ব্যবস্থা, বাগান করার ব্যবস্থা, খেলাধূলার ব্যবস্থা ইত্যাদি থাকলে শিক্ষার্থী খুশী মনে মনের মত পাঠ গ্রহণ করতে পারবে—এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে।

(৩) শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক মধুর হলে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীকে প্রভাবিত করতে পারবেন শিক্ষক—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম।

(৪) শিক্ষক নিজে জ্ঞান আহরণে নিযুক্ত থাকবেন ও ছাত্রছাত্রীদের সর্বাধুনিক জ্ঞান আহরণে সাহায্য করবেন।

(৫) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অবসর যাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। খেলাধূলা, অভিনয়, গান, নাচ, সাহিত্যচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সাহায্য করেও সুফল পাওয়া যায়।

(৬) বিদ্যালয়ের পরিচালনায় ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ দিতে হবে।

(৭) বংশগতির খবর রাখার জন্য শিক্ষক অভিভাবকদের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করবেন।

(৮) শিশুর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ব্যবস্থা রাখতে হবে ও চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে। শিক্ষক এ বিষয়ে সহানুভূতিশীল হবেন।

(৯) শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান সম্মত করার জন্য শিক্ষার্থীর রুচি, সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার্থীর মনের মত কাজ দিতে

হবে যাতে সে সেই কাজটিকে ভবিষ্যৎ জীবনে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে পারে সেদিকেও নজর রাখতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষককে বংশগতি ও পরিবেশ উভয়কেই কাজে লাগানর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। যে বিদ্যালয় শিশুর জীবন বিকাশের পক্ষে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারে, সমাজ জীবনে সেই বিদ্যালয়ের মূল্য অতি নগণ্য বলে বিবেচিত হবে। বংশগতি নিজে বিকশিত হতে পারে না, পরিবেশ এটিকে বিকশিত হতে সাহায্য করে—উডওয়ার্থের এই কথা স্মরণ করে শিক্ষক উভয়কেই কাজে লাগাতে সচেষ্ট হবেন। বংশগতির ওপর তো শিক্ষকের কোন হাত নেই। তাই তিনি শিশুর বংশগতির খবর নিশ্চয়ই নেবেন, কারণ তাঁকে শিশুর বিকাশের সম্ভাবনা কতটুকু তা প্রথমে জানতে হবে। তারপর সেই সম্ভাবনাটুকু যাতে যথাযথ বিকাশ লাভ করতে পারে অর্থাৎ শিশুর বিকাশের পথে যদি কোন বাধা সৃষ্টিকারী পরিবেশ থাকে তবে তা দূর করে এবং পরিবেশকে সমৃদ্ধ করে—শিশুর বিকাশের পথ প্রশস্ত করবেন ও ত্বরান্বিত করবেন শিক্ষক। এইভাবে তিনি বংশগতি ও পরিবেশ উভয়কেই যথাযথ-ভাবে কাজে লাগাতে চেষ্টা করবেন, তবেই তাঁর শিক্ষাদান কাজ সার্থক হয়ে উঠবে।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the relative importance of heredity and environment in the psychological development of a child

(C. U. B. T 1968)

2. Examine the role of heredity and environment in the development of a child and show their relation to each other.

(C. U. B. T 1971)

ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ
শিখন (Learning)

প্রত্যেক প্রাণী কতকগুলি সহজাত ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে ; কিন্তু এই ক্ষমতাগুলির সাহায্যে জটিল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে অনেক সময় প্রাণী তার নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। তখনই প্রাণীর জন্মগত ক্ষমতা ও আচরণের পরিবর্তন করার প্রয়োজন অনুভূত হয় ও পরিবর্তিত পরিবেশের উপর যথাযথ প্রতিক্রিয়া করে প্রাণী জীবনসংগ্রামে জয়ী হয়। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে গিয়েই প্রাণীকে নিত্য নতুন আচরণের উপায় উদ্ভাবন করতে হয়। পরিবর্তিত পরিবেশে নতুন আচরণ করা ও নতুন বিষয় আয়ত্ত করার নামই হোল শিক্ষা।

হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন, বেঁচে থাকার অর্থই হোল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান। Education (lite) is adaptation to environment··· Learning is primarily a process of adjustment. যে সমস্ত প্রাণী পরিবর্তিত পরিবেশের উপযোগী নতুন আচরণ করার কৌশল আয়ত্ত করতে পারে তারাই জীবনপ্রবাহে টিকে থাকে। আর যারা তা পারে না, তাদের অস্তিত্ব ধীরে ধীরে লোপ পায়।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা হোল জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। আমরা যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি। মাতৃগর্ভ থেকে শিক্ষা সুরু হয় ও মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিজাত আচরণ বেশী ; কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে শিক্ষা-প্রসূত আচরণ বেশী দেখা যায়। একজন মানুষের জীবনধারা লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে নানারকম বাধা-বিপত্তি, বিপদ-আপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করার কৌশল তাকে আয়ত্ত করতে হবে, জীবন ধারণের জন্ম একটা বৃত্তি তাকে শিক্ষা করতে হবে, সামাজিক আচার-আচরণ শিখতে

"......to learn is to modify behaviour and experience." —Nunn

"Learning refers to the growth and decay of interests, knowledge and skills and to the transfer of these to new situations."

(Encyclopaedia of Educational Research)

"Learning is the modification of behaviour through experience and training." --Gates

"To learn is to modify behaviour." – Nunn

হবে, নিজের জীবন দর্শন ও নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধেও তাকে কিছু শিখতে হবে। কাজেই শিখন-প্রক্রিয়া ছাড়া আমরা আমাদের অস্তিত্বের কথা কল্পনাই করতে পারি না।

শিখনের স্বরূপ (Nature of Learning)

এখন আমরা দেখব শিখন প্রক্রিয়ার মধ্যে এমন কি কি বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি এই প্রক্রিয়ার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। শিখন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি এর মধ্যে রয়েছে :

(১) **আচরণের পরিবর্তন**—কোন কিছু শেখা হলেই তবে আচরণের পরিবর্তন ঘটে। যেমন আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে এটা জানা হলে তবেই আর শিশু পরবে আগুনে হাত দিতে চাইবে না।

(২) **নতুন অভিজ্ঞতা লাভ**—আচরণের পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু নতুন অভিজ্ঞতা লাভ হয়। আগুনে হাত দেওয়া শিশুর নতুন অভিজ্ঞতা।

(৩) **নতুনত্ব**—শিখনের মধ্যে কিছু নতুনত্ব থাকে। শিশুর শিখনের মধ্যে দিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় তা তার কাছে নতুন; অভিজ্ঞতার ফলে যে আচরণের পরিবর্তন হয় তাও তার কাছে নতুন।

(৪) **বিশেষ গতিপথ**—শিখনের ফলে আচরণের যে পরিবর্তন হয়, তা একটা নির্দিষ্ট গতিপথ ধরে চলে। ফলে প্রাণীর মধ্যে যে চাহিদা সৃষ্টি হয়, নির্দিষ্ট পথে আচরণ জানার ফলে সেই চাহিদার তৃপ্ত হয়।

(৫) **আচরণের উৎকর্ষ সাধন**—নির্দিষ্ট পথে চলতে চলতে আচরণটি ক্রমশঃ উন্নত হয়; ফলে শিখন প্রক্রিয়ারও উন্নতি হয়।

(৬) **অভ্যাস ও অনুশীলন**—যে সব আচরণ পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি-বিধানের পক্ষে অনুপযুক্ত সেগুলিকে প্রাণী বাদ দেয়, আবার যেগুলি উপযুক্ত

"Learning is a process by which an organism, in satisfying his motivation, adapts or adjusts to a situation in which it must modify its behaviour in order to overcome obstacles or barriers."

—Kingslay & Garry

"Learning is a process of progressive behaviour adaptation"

—Skinner

"Learning is change. It is a change of behaviour, influenced by previous behaviour"

—H. R. Bhatia

বলে মনে হয় সেই আচরণের ধারাটি বার বার অনুশীলনের ফলে ক্রমশঃ অভ্যাসে পরিণত হয় কিন্তু যে সব শেখার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির প্রাধান্য থাকে সেখানে অভ্যাসের প্রয়োজন হয় না।

(৭) **সমস্যা**—প্রাণী জীবন-পথে চলতে চলতে যখনই সমস্যার সম্মুখীন হয় তখনই তার সমাধানের পথ খোঁজে। সমস্যা যদি জটিল হয় তবে তার জন্য আচরণও জটিল হবে। কাজেই সমস্যার প্রকৃতির উপর নির্ভর করছে শিখন প্রক্রিয়ার সরলতা ও জটিলতা।

শিখনের বিভিন্ন স্তর

শিখনের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে আমরা শিখন প্রক্রিয়ার কতকগুলি স্তর লক্ষ্য করে থাকি। যেমন—

(১) কোন একটা সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে প্রথমে।

(২) সমস্যা সমাধানের উপযোগী আচরণ আবিষ্কার করতে হবে।

(৩) সবশেষে ঐ আচরণের ধারাটি আয়ত্ব করার চেষ্টা করতে হবে।

যখন কোন ব্যক্তি পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে অক্ষম হয় তখনই সমস্যার উদ্ভব হয়। সমস্যা সমাধানের জন্য কি ভাবে আচরণ করা উচিত একথা সে চিন্তা করতে থাকে ও শেষে পর্যন্ত উপযুক্ত আচরণ খুঁজে বার করে। আচরণটি খুঁজে বার করেই তার কাজ শেষ হয় না, সেটি অনুশীলন করে তাকে আয়ত্ত করতে হয়।

শিখনের উপাদান (Factors determining Learning).

শিখন প্রধানতঃ চারটি উপাদানের উপর নির্ভর করে, যেমন—

(১) পরিবেশের চাহিদা (Environmental demand)

(২) পরিণমন (Maturation)

(৩) প্রেষণা (Motivation)

(৪) প্রস্তুতি (Readiness)

(১) **পরিবেশের চাহিদা**—কোন ব্যক্তি তখনই শেখে যখন তার শেখার প্রয়োজন পড়ে। পরিবেশ সব সময়ই আমাদের উপরে চাপ সৃষ্টি করে ; এই চাপ যত বেশী হয় ততই শেখার সুযোগটা বৃদ্ধি পায়। কাজেই আমরা পরিবেশের চাপে পড়েই শিখি।

(২) **পরিণমন**—শিখনের পক্ষে আর একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হোল পরিণমন। শিশুর বৃদ্ধি বলতে আমরা বুঝি শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ। বৃদ্ধি চোখে দেখা যায় কিন্তু বিকাশ অনুভব করতে হয়। মানসিক বিকাশের পিছনে দুটি প্রক্রিয়া কাজ করে—শিখন (Training) ও পরিণমন (Maturation)। শিক্ষণ অভিজ্ঞতা থেকে আসে ; কিন্তু পরিণমন অভিজ্ঞতা নির্ভর নয়।

এক মাস বয়সে শিশু বসতে পারে না এক কিন্তু ছয় মাস বয়সে মোটামুটি সে বসতে শেখে। এটা পরিণমন প্রক্রিয়ার উদাহরণ। কিন্তু সাইকেল চড়া. সাঁতার কাটা, গাছে চড়া ইত্যাদি আপনা থেকেই কেউ শেখে না। এসবের জন্য বিশেষ শিখনের প্রয়োজন।

পরিণমন ও শিখন দুটোই আচরণকে প্রভাবিত করে। তবে কোন কোন আচরণের উপর পরিণমন ও কোন কোন আচরণের উপরে শিখন বিশেষভাবে কার্যকরী। মনোবিজ্ঞানী গেসেল মনে করেন শিশুর আচরণের ক্ষেত্রে পরিণমনের প্রভাব বেশী ; এই পরিণমনের সহাযোেই শিশুর শিক্ষার গতিবেগ ও সীমা নির্ধারিত হয়।

পরিণমনের প্রভাব জানার জন্য যমজ শিশুকে নিয়ে একস্থানে পরীক্ষা করা হয়। যমজ শিশু দুটির নাম ধরা যাক T ও C, T-এর বয়স যখন ৪৬ সপ্তাহ তখন তাকে প্রতিদিন সিঁড়িতে ওঠা শেখানো হোত। এরকম চলল ৬ সপ্তাহ। ৫২ সপ্তাহ পরে T ২৬ সেকেণ্ডে সিঁড়ি অতিক্রম করল। C কে কোন Training দেওয়া হোল না, কিন্তু C Training ছাড়াই ৩৫ সেকেণ্ডে সিঁড়ি অতিক্রম করল। এইবার C-কে ২ সপ্তাহ ট্রেনিং দিয়ে দেখা গেল সে ১০ সেকেণ্ডে সিঁড়ি অতিক্রম করতে পারে। T ও C-এর সিঁড়ি অতিক্রম করা—কাজকে তুলনা করে দেখা গেল C-এর শেখার ক্ষমতা T-এর চেয়ে ভাল। এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র C-এর পরিণমনের ফলেই।

(৩) **প্রেষণা**—পরিবেশের চাপ যেমন শিখন প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করে, তেমনি শিক্ষার্থীর মনের ভিতর থেকে যে তাগিদ আসে তা তাকে শক্তি জোগায়। মনের এই তাগিদের নামই মনোবিজ্ঞানের ভাষায় প্রেষণা। প্রেষণাই ব্যক্তির মনের এমন একটা অবস্থা যা তাকে লক্ষ্যে পৌছানর জন্য বিশেষ এক ধরনের আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। প্রেষণার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ম্যাকগিয়োক (Mc Geoch) বলেছেন—"প্রেষণা হোল ব্যক্তির এমন একটা

অবস্থা যা তাকে একটা প্রদত্ত কাজের অনুশীলন করার নির্দেশ দেয় এবং যা তার কর্ম পদ্ধতির প্রাচুর্য ও কাজটির পরিসমাপ্তি নির্ধারণ করে।” প্রত্যেক কাজের একটা আভ্যন্তরীণ শক্তি থাকে। সেটাকেই বলা হচ্ছে প্রেষণা। বস্তু জগতে কোন কিছু পাওয়ার জন্যই প্রেষণা জাগে এবং তখনই তা শিক্ষার্থীকে শিখতে প্রবুদ্ধ করে।

প্রেষণাকে দু ভাগে ভাগ করা যায়—মানসিক ও শারীরিক। প্রেষণা জাগলে পর মানুষের আভ্যন্তরীণ সাম্যাবস্থাটি নষ্ট হয়, তার মধ্যে একটা অস্বস্তি ও উত্তেজনা দেখা যায়। শারীরিক দিক থেকে যে চাঞ্চল্য সেটি হোলো শারীরিক প্রেষণা আর মানসিক দিক থেকে যে উত্তেজনা সেটা হল মানসিক প্রেষণা। প্রত্যেক শিখনের ক্ষেত্রে এই দুটি একই সঙ্গে থাকে।

যে বস্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় উদ্বোধক। উদ্বোধক ও প্রেষণার পারস্পরিক ক্রিয়ার উপর শিখন নির্ভর করে। মনোবিদ গ্যারেট (Garret) বলেছেন—“Learning is a function of motive incentive condition. এই উদ্বোধককে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ। শিখনের বিষয়-বস্তুটি শিক্ষার্থীর মনের মত হলে সেটা শেখার জন্য সে স্বাভাবিকভাবে প্রেষণা অনুভব করে; এটাই হোল তার আভ্যন্তরীণ প্রেষণা, তবে কোন কারণে যদি আভ্যন্তরীণ প্রেষণার অভাব দেখা যায় তখন শিখনের জন্য আনন্দ ও স্বতঃস্ফূর্তভাব থাকে না; সে ক্ষেত্রে বাহ্যিক উদ্বোধকের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। বাহ্যিক উদ্বোধক হোল—শাস্তি, পুরস্কার, নিন্দা, প্রশংসা, শ্রবণেক্ষণ উপকরণ (audio-visual aids) ইত্যাদি। অনেক সময় বাহ্যিক উদ্বোধক শিক্ষার্থীর মধ্যে শক্তি সঞ্চার করার পর আভ্যন্তরীণ উদ্বোধকে রূপান্তরিত হয়। তবে সব সময় বাহ্যিক উদ্বোধকের সাহায্য না নেওয়া ভাল। কারণ বাহ্যিক উদ্বোধক প্রেষণাকে দীর্ঘ স্থায়ী করতে পারে না।

শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণার কাজ—শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণার মূল্যবান

শিখনের সংজ্ঞা—‘ শিখন হোল অভ্যাসের ফলে ক্রিয়ার পরিবর্তন”—

ম্যাকগিয়োক (Mc Geoch)

“শিক্ষা হোল আচরণের পরিবর্তন”—বার্নার্ড (Bernard)

“শিখন হোল সেই প্রক্রিয়া যার সহায়তায় আমরা আচরণের মধ্যে এমন পরিবর্তন আনতে পারি যা পরিবেশের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের উন্নতি সাধন করে।”

অবদান রয়েছে। প্রেষণার কাজকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়—কাজে শক্তিসঞ্চার করা, নির্বাচন করা ও আচরণ পরিচালিত করা।

কাজে শক্তিসঞ্চার—শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা শক্তি জোগায়। তার ফলে সে বেশ উদ্যমী ও কর্মতৎপর হয়।

নির্বাচন করা—শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা জাগার পর কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় সে প্রতিক্রিয়া করে ও অন্যান্য অবস্থাকে বাতিল করে দেয়।

আচরণ পরিচালিত করা—প্রাণীর আচরণকে একটা নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করা হল প্রেষণার আর একটা কাজ। কোন লক্ষ্যে পৌঁছুতে চলে আচরণটি যেমন তেমন হলে চলবে না—আচরণটি সুনির্দিষ্ট পথে চলবে। তবেই অভীষ্ট ফললাভ হবে।

শিক্ষা ও প্রেষণা

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে আছে প্রেষণা। প্রেষণা ছাড়া শিক্ষা সম্ভব নয়। এই প্রেষণাগুলির মধ্যে কতকগুলি হ'ল সহজাত ও আর কতকগুলি অর্জিত হয়ে থাকে। শিশুর মধ্যে কতকগুলি জৈবিক চাহিদা থাকে। এই চাহিদাগুলিই তার সমস্ত আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে; তাই এগুলিকে প্রাথমিক প্রেষণা বলে। এই প্রাথমিক প্রেষণা থেকেই আরও নানারকম প্রেষণা ও উদ্বোধকের জন্ম হয়ে থাকে।

শিক্ষাকে যদি কার্যকরী করতে হয় তবে শিক্ষার কি উদ্দেশ্য তা ভাল করে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে হবে। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকলে তবে শিক্ষার্থী সেই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করবে। শিক্ষার্থীকে অর্থহীন ও বিচ্ছিন্ন আচরণ করতে না দেওয়াই উচিত, কাজটির সামগ্রিক স্বরূপ শিশু বুঝতে পারলে এলোমেলো আচরণ সে করবে না। আচরণ থেকে সে যা অভিজ্ঞতা লাভ করবে তা তার কাছে অর্থপূর্ণ হবে।

সুশিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রেষণার দিকে খেয়াল করবেন এবং শিক্ষার্থীর আচরণকে সেইভাবে চালিত করবেন। সব প্রেষণা অবশ্য একইভাবে কাজ করে না—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে কাজ করে। কোন সময়ে কোন প্রেষণা কার্যকরী তা শিক্ষক বিশেষভাবে চিন্তা করে শিক্ষার্থীকে সেইভাবে উদ্বুদ্ধ করবেন।

(৪) **প্রস্তুতি**—শিক্ষার্থী যখন শিক্ষাগ্রহণের জন্য মানসিক দিক থেকে

প্রস্তুত হয় তখনই একমাত্র শিক্ষাদান করা সম্ভব। আমরা সব আয়োজন করতে পারি কিন্তু শিশুর প্রস্তুতি ছাড়া সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে—"One man can take the horse to water twenty times but cannot make him drink." এই কথা মনে করে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। দৈহিক অসুস্থতাও অনেক সময় শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতি নষ্ট করে। শিক্ষক সেদিকেও খেয়াল রাখবেন।

বিভিন্ন প্রকারের শিখন (Forms of Learning)

শিখন বলতে আমরা বুঝি কোন বিষয়ে নতুন জ্ঞান আহরণ, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা অর্জন, মনে রাখার ক্ষমতা, উন্নত মানসিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি। শিখনকে মানসিক প্রক্রিয়া হিসাবে দেখলে এর প্রকারভেদ মনে হয় যেন অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু শিখনের বিষয়বস্তুকে তো ভাগ করা যায়, সেই হিসাবে শিখনেরও প্রকারভেদ নির্ণয় করা সম্ভব। শিখনের বিষয়বস্তুকে দুভাগে ভাগ করা হয়—জ্ঞানমূলক ও দক্ষতামূলক বিষয়। জ্ঞান বলতে সেই বিষয়সমূহকে বুঝি যেগুলি শেখার জন্য মানসিক শক্তি লাগে। দৈহিক শক্তির এখানে তেমন প্রয়োজন হয় না। যেমন তথ্যমূলক কিছু শেখার সময়, কোন জিনিষ উপলব্ধি করার সময় ইত্যাদি। কিন্তু দক্ষতামূলক শিখনের ক্ষেত্রে দৈহিক সক্রিয়তার বেশী প্রয়োজন হয়। যেমন সাইকেল চড়া, সাঁতার কাটা, টাইপ করা ইত্যাদি। এছাড়াও কতকগুলি ছোট ছোট ভাগে শিখনকে ভাগ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—

(১) **ইন্দ্রিয় ও চালক যন্ত্রের সমন্বয়মূলক দক্ষতা** (Sensorimotor Skill)—কতকগুলো কাজ আছে যেগুলো অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে সেই সঙ্গে অন্য কাজও করা যায়। যেমন হাঁটাচলা, কাপড়-জামা পরা ইত্যাদি। এগুলি সম্বন্ধে দক্ষতা অর্জনের সময় খেয়াল করতে হবে যেন কোন খারাপ অভ্যাস না গড়ে ওঠে। তাহলে সেটা দূর করা বেশ কঠিন কাজ হয়ে পড়বে।

(২) **প্রত্যক্ষ ও চালক যন্ত্রের সমন্বয়মূলক দক্ষতা** (Perceptual motor Skill)—কোন জিনিষ দেখে তারপর প্রতিক্রিয়া যখন করা হয় তখন এই ধরনের শিখন হয়। যেমন—টাইপ করা।

(৩) **প্রত্যক্ষণমূলক শিখন** (Perceptual Learning)—অনেক সময়

প্রত্যক্ষণের উপর আমাদের শিখন অনেকখানি নির্ভর করে, যেমন ভাষা শিক্ষা, উচ্চারণ শিক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে আদর্শ প্রত্যক্ষণের প্রয়োজন।

(৪) **সংযোগমূলক শিখন** (Associational Learning)—আমাদের শিখনের অনেকখানি জুড়ে আছে বিভিন্ন বস্তু ও ধারণার মধ্যে সংযোগ স্থাপন। আগের জানা কোন ধারণার সঙ্গে নতুন ধারণা যোগ করলে তবে শিখনের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

(৫) **ধারণামূলক শিখন** (Conceptual Learning)—বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে যখন একটা ধারণা গঠন করা হয় তখন তাকে concept বলা হয়। শিখনের সাহায্যে এই concept গঠনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়।

(৬) **আদর্শের শিখন** (Learning of Ideals)—আদর্শ হোল এক বিশেষ ধরনের ধারণা। ব্যক্তিজীবনের আদর্শ তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। শিখনের দ্বারা আচরণের পরিবর্তন করতে হলে ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আদর্শের ধারণা গড়ে তুলতে হবে।

(৭) **সমস্যা সমাধানের শিখন** (Problem-solving Learning)—পরিবর্তনশীল পরিবেশে বিভিন্ন সমস্যাকে সমাধান করে আমরা জীবনপথে অগ্রসর হই। সমস্যার অর্থই হোল বাধা—এই বাধা অতিক্রম করে তবেই আমরা সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে পৌঁছুই। এর ফলে যে আচরণের পরিবর্তন হয় সেটাই হোল শিখন। এইভাবে শিখনের বিষয়বস্তু অনুসারে শিখনের প্রকারভেদ আমরা নির্ণয় করতে পারি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব (Theories of Learning)

শিখনের স্বরূপ সম্বন্ধে খুব একটা মতভেদ দেখা যায় না। কিন্তু শিখন কি ভাবে ঘটে—এ বিষয়ে নানা মনোবিজ্ঞানী নানা মত পোষণ করেন। শিখনের প্রচলিত তত্ত্বগুলির মধ্যে চারটিই প্রধান। সেগুলি হোল—

(১) থর্নডাইকের সংযোজনবাদ (Thorndike's Connectionism)

(২) গেস্টাল্টবাদীদের অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন (Insightful Learning of the Gestaltists)

(৩) প্যাভলভের সাপেক্ষীকরণ বা অনুবর্তনবাদ (Pavlov's Conditioning)

(৪) শিখনের 'ফিল্ড' মতবাদ (Field theory of Learning)

(১) **থর্নডাইকের সংযোজনবাদ**—বিখ্যাত আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী থর্নডাইক তাঁর—Animal Intelligence নামে বইতে যে তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন তা-ই পরবর্তীকালে শিখন সম্বন্ধে চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে। থর্নডাইক বিভিন্ন প্রাণীর শেখার সময়কার বিভিন্ন আচরণ বিশ্লেষণ করে শিখনের সরলতম কৌশল আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন।

তাঁর মতে শিখনের সরলতম ক্ষেত্র হোল একটা উদ্দীপকের (Stimulus) সঙ্গে একটা প্রতিক্রিয়ার (Response) নির্ভুল সংযোজন (Connection)। উদ্দীপক হোল—যে সমস্ত জিনিষ আমাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি জাগায় আর এই অনুভূতির উত্তরে আমরা যে সাড়া দিই তাই হোল প্রতিক্রিয়া। যেমন যখন আমরা একটা তালাবন্ধ ঘরের সামনে একগোছা চাবি নিয়ে উপস্থিত হই—জানা নেই কোনটা ঠিক ঘরের চাবি, তখন আমরা কি করি? একটার পর একটা চাবি দিয়ে বন্ধ তালাটা খোলার চেষ্টা করি। হয়তো দেখা গেল প্রথম চাবিটাতে খুলল না, দ্বিতীয় চাবিটাতেও খুলল না, কিন্তু তৃতীয় চাবিটা ঘোরাতেই খুলে গেল। এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় চাবির বেলায় উদ্দীপক (তালা) ও প্রতিক্রিয়ার (চাবি ঘোরানর) মধ্যে সঠিক সংযোগ হয় নি, কিন্তু তৃতীয় চাবির বেলায় সঠিক সংযোগ হয়েছে বলে সেক্ষেত্রে শিখন হয়েছে বলা যেতে পারে।

আর একটু জটিল উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক। কোন একটি ছাত্র

বীজগণিতের অঙ্ক কষতে গিয়ে দেখল যে সঠিক ফরমুলা তার জানা নেই। তখন একটার পর একটা ফরমুলা প্রয়োগ করে অঙ্কটা কষার চেষ্টা করল। কিন্তু যতক্ষণ না ঠিক ফরমুলা প্রয়োগ করল অর্থাৎ উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নির্ভুল সংযোগ স্থাপিত হোল ততক্ষণ অঙ্কটা কষা শেখা হোল না। এইজন্য থর্নডাইকের মতে শিখন হোল উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগ স্থাপন, —Stimulus Response Bond বা S-R Bond.

থর্নডাইকের উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সূত্রটি অনুষঙ্গবাদের মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অনুষঙ্গবাদ হোল যখন কোন শিখন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উদ্দীপকের বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা সাড়া দিই। আমাদের প্রত্যেক মানসিক প্রক্রিয়াই প্রত্যক্ষ, সংবেদন প্রতিরূপ প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক এককের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়। থর্নডাইকের মত শিখনও এই ধরনের মানসিক এককের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়।

প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতি (Trial and Error Method)

উপরের সূত্রটিকে থর্নডাইক নাম দিলেন প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতি। প্রাণী শেখে চেষ্টা ও ভুল করতে করতে। কোন কিছু শেখার সময় প্রাণী অনেকগুলি ভুল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে নির্ভুল প্রতিক্রিয়াটি খুঁজে বার করে। যেমন বন্ধ তালার সঠিক চাবি ও অঙ্কের সঠিক ফরমুলা চিনে বার করা।

প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণা—থর্নডাইক তাঁর প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসার জন্য মনুষ্যেতর প্রাণী ও মানুষের উপর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁর ক্ষুধার্ত বিড়াল ও খাঁচার (cat and the puzzle-box) পরীক্ষাটি বিখ্যাত।

একটা ক্ষুধার্ত বিড়ালকে একটা খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে রেখে বাইরে এমনভাবে এক টুকরো মাছ রাখা হোল যাতে সেটা বিড়ালের চোখে পড়ে। খাঁচার দরজাটা একটা 'লিভার' (ছিটকিনি) দিয়ে এমনভাবে আটকান হোল যাতে বিড়ালের পায়ের সামান্য চাপ লাগলেই দরজাটি খুলে যায় ও মাছের টুকরোটা সে পেয়ে যায়। বিড়ালটা প্রথমে খাঁচার ভিতর থেকেই মাছটার নাগাল পাবার জন্য ছুটোছুটি করল। সে এলোমেলোভাবে দরজা খোলার চেষ্টা করতে লাগল। এইভাবে কিছুক্ষণ করার পর হঠাৎ

লিভারের উপর চাপ পড়তেই দরজাটা খুলে গেল ও বেড়ালটি দৌড়ে গিয়ে মাছের টুকরোটা পেল। পরের দিনও ঠিক একইভাবে পরীক্ষা করা হোল, কিন্তু আগের দিনের থেকে অনেক কম প্রচেষ্টায় বিড়ালটা বাইরে চলে এল। তৃতীয় দিনে প্রচেষ্টার সংখ্যা আরও কমল, চতুর্থ দিনে ব্যর্থ প্রচেষ্টা আরও কম হোল। একইভাবে দেখা গেল প্রচেষ্টা ও ভুলের সংখ্যা ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে। শেষে একদিন এমন অবস্থায় এসে পৌছল যে বিড়ালটাকে খাঁচায় বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে কোন ব্যর্থ প্রচেষ্টা না করেই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। এই দিন বিড়ালটির বার বার প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নিভুল যোগসূত্র স্থাপিত হোল; ফলে বিড়ালটার শেখাও শেষ হল।

প্রথমদিন বিড়ালটার প্রচেষ্টার সময় লেগেছিল ১৬০ সেকেণ্ড কিন্তু পরে প্রচেষ্টার সময় কমতে কমতে ৭ সেকেণ্ডে দাঁড়িয়েছিল।

থর্নডাইকের মতে শিখন একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া যার মধ্যে চিন্তা, যুক্তি ও বিচারের কোন সুযোগ নেই। শিখন প্রক্রিয়ার মধ্যে উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন সম্বন্ধে প্রাণীর বিশেষ সচেতনতা থাকে না। থর্নডাইকের সিদ্ধান্ত হোল—শিক্ষা, অনুশীলনের মাধ্যমে ভুল প্রক্রিয়া বর্জন করে যথাযথ প্রক্রিয়া করার ক্ষমতা অর্জন করা। এই জন্যই একে প্রচেষ্টা ও সাফল্যের পদ্ধতিও বলা চলে। মানুষও মনুষ্যেতর প্রাণীর মতই এই পদ্ধতিতে শেখে।

থর্নডাইকের শিখনের সূত্র (Thorndike's Laws of Learning)

দীর্ঘ গবেষণার পর থর্নডাইক শিখনের আরও কতকগুলি সূত্র আবিষ্কার করেছেন। এর মধ্যে প্রধান সূত্র হ'ল তিনটি ও অপ্রধান সূত্র হ'ল পাঁচটি।

প্রধান সূত্র তিনটি হ'ল—(১) ফললাভের সূত্র (The Law of Effect) (২) অনুশীলনের সূত্র (The Law of Exercise) (৩) প্রস্তুতির সূত্র (The Law of Readiness) অপ্রধান পাঁচটি সূত্র হ'ল—(১) বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Multiple Response) (২) প্রস্তুতি, মনোভাব বা মানসিক অবস্থার সূত্র (Law of Set Attitude or Disposition) (৩) আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Partial Activities) (৪) সাদৃশ্য বা উপমানের সূত্র (Law of Assimilation or Analogy) (৫) অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র (Law of Associative Shifting)

(১) **ফললাভের সূত্র** (The Law of Effect)—যখন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এক পরিবর্তনযোগ্য সংযোগ স্থাপিত হয় এবং এর ফল যদি প্রাণীর কাছে তৃপ্তিদায়ক হয় তবে ঐ সংযোগটি প্রাণীর মনে রেখাপাত করে (Stamped in)। বিপরীতভাবে বলা যায় সংযোগ স্থাপনের ফল যদি সন্তোষজনক না হয় তবে সংযোগটি শিথিল হয় (Stamped out)। বিড়ালের ক্ষেত্রে যে আচরণের ফলে সে খাঁচ থেকে বেরিয়ে মাছ পেয়েছিল সেই আচরণগুলিই তার মনে রেখাপাত করে ছিল, সেইগুলোই সে শিখেছিল আর যে আচরণগুলো তার কাছে সন্তোষজনক ছিল না সেগুলো সে ভুলে গিয়েছিল।

(২) **অনুশীলনের সূত্র** (The Law of Exercise)—উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যদি বার বার সংযোগ স্থাপন করা হয় তবে এই সংযোগটি দৃঢ় হয়, তবে এর জন্য অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তনীয় থাকা দরকার। এই সূত্রটিকে ব্যবহারের সূত্রও (Law of Use) বলা হয়। আবার দীর্ঘদিন যদি উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা না হয় তবে যোগসূত্র শিথিল হয়ে যায়; একে অব্যবহারের সূত্র (Law of Disuse) বলা হয়।

পরে আরও তিনটে ছোট সূত্রের কথা থর্নডাইক বলেছেন—তীব্রতার সূত্র (Law of Vividness) সাম্প্রতিকতার সূত্র (Law of Recency) ও পৌনঃপুনিকতার সূত্র (Law of Frequency) উদ্দীপক তীব্র হলে বেশী মনে থাকে, সম্প্রতি কোন ঘটনা ঘটলে বেশী মনে থাকে আর ঘটনাটি বার বার ঘটলে বেশী মনে থাকে। শিখনের ক্ষেত্রে সবগুলিই কাজ করে।

(৩) **প্রস্তুতির সূত্র** (The Law of Readiness)—উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ভালভাবে সংযোগ স্থাপন করতে হলে প্রাণীর মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন। মানসিক প্রস্তুতি থাকলে তবে সংযোগটি তার কাছে আনন্দদায়ক হবে অন্যথায় বিরক্তি উৎপাদন করবে।

অপ্রধান সূত্র

(৪) **বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার সূত্র** (Law of Multiple Response)—অনেকগুলো প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে সঠিক প্রতিক্রিয়াকে খুঁজে বার করতে হয়। এজন্য প্রাণীকে উদ্দীপকের সামনে নানারকম প্রতিক্রিয়া করতে হয়। প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে যত বৈচিত্র্য থাকবে শেখাটাও তত সহজ হবে।

(৫) **প্রস্তুতি মনোভাব বা মানসিক অবস্থার সূত্র** (Law of Set

Attitude or Disposition)—একটা বিশেষ উদ্দীপকের সামনে প্রাণী কিভাবে আচরণ করবে—তা নির্ভর করছে তার প্রস্তুতি, মনোভাব ও মানসিক অবস্থার উপর। যেমন বিড়ালটি ক্ষুধার্ত ছিল বলেই খাওয়ার জন্ম সে খাঁচার বাইরে আসার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পেট ভরা থাকলে হয়তো বাইরে আসার চেষ্টা না করে ঘুমিয়ে পড়ত।

(৬) **আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র** (Law of Partial Activities)—এই সূত্রের মূল উদ্দেশ্য হোল—প্রাণীরা সামগ্রিক অবস্থার উপর নির্ভর করে প্রতিক্রিয়া করে না, তারা ভিন্ন ভিন্ন অংশ আলাদাভাবে দেখেও প্রতিক্রিয়া করে। এর ফলে শিখনে শক্তির অপচয় কম হয়।

(৭) **সাদৃশ্য বা উপমানের সূত্র (Law of Assimilation or Analogy)**—প্রাণীর শিখনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হোল—যে অবস্থায় অভিযোজন করার মত আমাদের কোন প্রতিক্রিয়া জানা থাকে না, সেই অবস্থায় পড়লে আমরা আগের কোন অবস্থার সঙ্গে বর্তমানের অবস্থার আংশিক মিল খুঁজে বার করি, এবং আগে যেভাবে আমরা প্রতিক্রিয়া করেছিলাম সেইভাবে প্রতিক্রিয়া করি। যেমন ইতিহাস পড়াবার সময় যদি কোন শিক্ষক ইতিহাসের কোন ঘটনার সঙ্গে বর্তমানের কোন ঘটনার সঙ্গে মিল খুঁজে বার করতে পারেন তবে তিনি নিশ্চয়ই আদর্শ শিক্ষক।

(৮) **অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র (Law of Associative Shifing)**—শিখনের সময় শিক্ষার্থী যে সব প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম সেগুলোকে শিখনের দ্বারা অন্য কোন উদ্দীপকের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। শিশুরা যে সব অভ্যাস, অনুরাগ বিদ্যালয়ে আয়ত্ত করে তা পরবর্তী জীবনেও প্রয়োগ করতে পারে।

থর্নডাইকের মতবাদের সমালোচনা—থর্নডাইকের সংযোজনবাদকে শিখনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বলে সব মনোবিজ্ঞানী মনে করেন না। এগুলির মধ্যে যথেষ্ট অসম্পূর্ণতা আছে বলে তাঁরা মনে করেন। যেমন—

ফললাভের সূত্রটিতে বলা হয়েছে—আচরণের ফল তৃপ্তিদায়ক হলে শিখন হবে আর বিরক্তিজনক হলে শিখন হবে না। ওয়াটসান ইত্যাদি আচরণবাদীরা বলেন এই সূত্রটা প্রাণীর নিজস্ব অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া কোন বিষয়ের কার্যকারণ সম্বন্ধে নির্ণয় করলে দেখা যায় কারণ আগে, কাজ পরে। কিন্তু এখানে বিড়ালের খাঁচার বাইরে আসার কারণ কি? মাছ পাওয়া।

বিড়ালের আচরণটা হোল কাজ। আগে আচরণ মানে কাজ আগে, পরে কারণ, মাছ পাওয়া।

আরও বলা যায় যে বিরক্তিজনক সব কিছু কি আমরা ভুলে যাই? স্মৃতির অতলে ডুবে গিয়ে মানুষ দুঃখের অনুভূতির কথাই প্রথম মনে রেখেছে বলে আমরা জানতে পারি।

অনুশীলনের সূত্র—বার বার অভ্যাস করলে শিখন দৃঢ় হয়—একথা সব ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য নয়। অনুশীলন না করেও অনেক ঘটনা আমাদের মনে ছাপ রাখে। অর্থপূর্ণ কোন কিছু শেখার সময় অনুশীলনের তেমন প্রয়োজন হয় না। যান্ত্রিক উপায়ে যেগুলির দক্ষতা অর্জন করতে হয় সেগুলির ক্ষেত্রে অনুশীলন অবশ্য কার্যকরী। মনোবিজ্ঞানী গ্যারেট বলেছেন—অনুশীলনের সূত্রের সাহায্যে পারদর্শিতার ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু প্রকৃত শিখন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করা যায় না।

প্রস্তুতির সূত্র—প্রস্তুতি ছাড়াও অনেক সময় দেখা যায় শিখন সম্ভব। যখন আমরা রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ কিছু শিখে ফেলি তখন আমাদের মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র পরিকল্পিত শিখনের ক্ষেত্রেই প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়।

থর্নডাইকের সংযোজনবাদের মূলে আছে স্নায়বিক উপাদানঘটিত ব্যাখ্যা; উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগ বলতে তিনি স্নায়বিক বন্ধনের কথাই বলেছেন। কিন্তু ল্যাসলে, ফ্রাঞ্জ প্রভৃতি শরীর বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে কেবলমাত্র এ ধরনের স্নায়বিক সংযোগ দ্বারা শিখন হয় না।

শিখন সম্পর্কে থর্নডাইকের ধারনা অনেকটা যান্ত্রিক। শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থী অন্ধ। শিখনের জন্য মনোযোগ, আগ্রহ ও চাহিদার প্রয়োজন আছে, এটা এই সূত্রে তেমন স্বীকার করা হয় না।

পরবর্তীকালে নিজেই নিজের সূত্রের অসম্পূর্ণতা দূর করার জন্য থর্নডাইক অন্তর্ভুক্তির সূত্র নামে আর একটি সূত্রের কথা বলেছেন যার সাহায্যে তিনি বুঝিয়েছেন যতক্ষণ উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়া দুটোই একটি বিশেষ সম্বন্ধের অন্তর্ভুক্ত হবে তখন শিখন সম্ভব হবে।

থর্নডাইক যখন বলেন যে শিখন পরিস্থিতিকে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশে ভাগ করে নিই ও পৃথক পৃথক ভাবে সাড়া দিই—তখন সামগ্রিকতাবাদী মনোবিজ্ঞানীরা বলেন এটা হচ্ছে মনোবৈজ্ঞানিক আণবিকতা (Psychological

Atomism)। তাঁরা বলেন শিখন পরিস্থিতিকে আমরা সামগ্রিকভাবে দেখি, সামগ্রিকভাবে সাড়া দিই।

শিক্ষা ক্ষেত্রে থর্নডাইকের মতবাদের প্রয়োগ

থর্নডাইকের সূত্রগুলির নানান সমালোচনা তুলে ধরা হলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে এগুলির উপযোগিতা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

প্রস্তুতির সূত্রটির উপর শিখন অনেকখানি নির্ভর করে। প্রস্তুতি বলতে অবশ্য শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক ও আবেগমূলক প্রস্তুতিই বোঝায়। প্রস্তুতিকে আবার দুভাগে করা যায়—জ্ঞানমূলক ও আবেগমূলক প্রস্তুতি। জ্ঞানমূলক প্রস্তুতির জন্য শিক্ষক যে বিষয় পারবেশন করবেন তার সম্বন্ধে কিছু পূর্বজ্ঞান থাকা দরকার। আর আবেগমূলক প্রস্তুতির জন্য শিক্ষণীয় বিষয় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আগ্রহ ও অনুরাগ সৃষ্টি করা দরকার।

ফললাভের সূত্রটি শিখনের ক্ষেত্রে অনেক সময় কাজে লাগে। শিক্ষার্থীর শেখার মাত্রা বাড়ানর জন্য প্রশংসা, পুরস্কার, প্রমোশন ইত্যাদি দেওয়া হয়। এগুলোকে প্রেরণা (incentive) বলা যেতে পারে, এগুলো দিয়ে বাইরে থেকে আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এগুলোর সাহায্যে যাঁতে মনের দিক থেকে আগ্রহ (motive) জাগান যায় তার চেষ্টা করতে হবে। বাইরের জিনিষ দিয়ে যে আগ্রহ সৃষ্টি হয় তা বেশী দিন স্থায়ী হয় না।

তাছাড়া ফলভোগের সূত্রের উপর নির্ভর করেই বোধ হয় সহজ থেকে কঠিন বিষয়বস্তু পরিবেশনের কথা বলা হয়েছে। যেমন—একটি ছাত্রকে যদি অঙ্ক ভাল করে শেখাতে হয় তবে তাকে প্রথমে সহজ অঙ্ক দিতে হবে। সেই অঙ্কটার নির্ভুল উত্তর বার করতে পারলে তার খুব উৎসাহ হবে আরও অঙ্ক করবার জন্য। একটা অঙ্ক পারলেই তাকে প্রশংসাসূচক উৎসাহ দিতে হবে। তাতেই তার অঙ্ক করার উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। কিন্তু প্রথমেই শক্ত অঙ্ক কষতে দিলে, না পারলে তার অঙ্কে ভয় জন্মে যাবে। পরীক্ষার খাতায় অনেক সময় দেখা যায় প্রথম অঙ্কটা ঠিক করতে না পারলে সব গুলিয়ে যায়। তাই শিক্ষার্থীকে বলা হয় প্রথমে সহজ অঙ্কের উত্তর করতে।

অনুশীলনের সূত্রও শিক্ষাক্ষেত্রে উপেক্ষা করার মত নয়। প্রাচীন উপদেশ এখানে মনে পড়ছে—"নিত্য যাহা শিখিবে নিত্য তাহা অভ্যাস করিবে।" একটা জিনিষ বার বার অনুশীলন করার ফলে মনের মধ্যে গভীরভাবে দাগ

কাটে শিক্ষণীয় বিষয়কে এমন ভাবে ভাগ করে নিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে অনুশীলন করা সহজ হয়। অনুশীলনের পিছনে তৃপ্তিবোধ নিশ্চয়ই থাকবে তা না হলে অনুশীলন ব্যর্থ হবে।

কতকগুলি বিষয় শেখার সময় শিক্ষার্থীর পক্ষে অনুশীলন একান্ত অপরিহার্য। যেমন অঙ্কের ফরমুলা, নামতা মুখস্থ, ব্যাকরণের Tense Chart, শব্দ, প্রতিশব্দ, লিঙ্গ পরিবর্তন, ভাষা শিক্ষার জন্য শব্দ (Vocabulary) ইত্যাদি।

একটা শিখন পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক জানা থাকলে শিশুর পক্ষে সমস্যা সমাধান করার সুবিধা হয়।

বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা শিক্ষার একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ। বিশেষতঃ মেধাবী শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা প্রতি জিনিষেই বৈচিত্র্য খোঁজে—শিক্ষাক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় না। একই জিনিষ গতানুগতিক পদ্ধতিতে তারা কিছুতেই পড়তে চায় না।

উপমানের সূত্রটাও শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে লাগে। শিক্ষার্থী নতুন কোন শেখার সময় যদি তার পুরাতন অভিজ্ঞতার কোন জিনিষের সঙ্গে নতুন জিনিষের সাদৃশ্য খুঁজে বার করতে পারে তবে শেখাটা অনেক সহজ হয়।

অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনও শিক্ষার ক্ষেত্রে সমানভাবে উপকারী। শিশুরা যে সমস্ত অভ্যাস, আচরণ বিদ্যালয়ে এসে শেখে তা তার পরবর্তী জীবনেও কাজে লাগে। তেমনি আবার বিদ্যালয়ের কোন বিরূপ মনোভাব যদি গড়ে ওঠে তবে তা তার জীবনকে নষ্ট করে দিতে পারে।

সবশেষে আমরা বলতে পারি কর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সূত্রগুলি বিশেষভাবে কার্যকরী। এই শিক্ষা বাস্তবমুখী; শিশু কাজের মধ্যে দিয়ে শেখে বলে আনন্দের সঙ্গে শেখে ও অনেক দিন মনে রাখে। বড় বড় আবিষ্কারের গোড়ার কথাই হল প্রচেষ্টা ও ভুল। স্কুল পাঠ্য বিষয়ের তালিকার কয়েকটি বিষয় যেমন অঙ্ক, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমেই অনেকখানি শিখতে হয়। আগেই আমরা দেখেছি, নামতা মুখস্থ, ব্যাকরণের নিয়ম মুখস্থ, কবিতা মুখস্থ ও যুক্তিসম্মত বিষয় শেখার সময়ও এই পদ্ধতির প্রয়োগ অস্বীকার করা যায় না।

গেষ্টাল্ট মতবাদ (Gestalt theory of Learning)।

গেষ্টাল্ট কথাটা হল একটা জার্মান শব্দ যার অর্থ হচ্ছে কাঠামো গঠন বা সম্পূর্ণ আকার (Structure, form of Configuration) বা প্যাটার্ন। গেষ্টাল্টবাদীরা বলেন আমরা যখন কোন জিনিষ দেখি তখন সেটাকে খণ্ড বিচ্ছিন্নভাবে দেখি না, সেটাকে সমগ্রভাবে দেখি। বিভিন্ন জাতীয় জিনিষও যদি খুব কাছাকাছি থাকে এবং তাদের মধ্যে যদি সামান্যতমও সাদৃশ্য থাকে তবে সেগুলিকে আমারা একক (Unit) হিসাবে দেখি। বিভিন্ন ফুল দিয়ে মালা গাথা হয়ে গেলে আর ফুলগুলির বিভিন্নতা চোখে পড়ে না। একটা গান শোনার সময় কোন শব্দের সারেগামা আলাদা করে মানুষ উপলব্ধি করে না। তখন একটা সামগ্রিক উপলব্ধি মানুষের মনে আসে।

গেষ্টালবাদীরা বলেন কোন একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রাণী যখন কোন উদ্দীপকের উত্তরে সাড়া দেয় তখন সামগ্রিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করেই সামগ্রিক-ভাবে সাড়া দেয়। প্রাণী যখন শেখে তখন অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই শেখে। যখন কোন একটা সমস্যার মধ্যে ফাঁক থেকে যায়, তখন সেই ফাঁকগুলোকে সমগ্র সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষণ করার নামই হল অন্তর্দৃষ্টি, আর সেই ফাঁক পূরণ করার জন্য আচরণই হোল শিখন। অন্তর্দৃষ্টি অবশ্য কোন সহজাত ক্ষমতা নয়—এটা অনেকটা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করলেও এটা হঠাৎ মনে উদয় হয় বিদ্যুচ্চমকের মত। এটার মধ্যে অতীত ও ভবিষ্যৎ দুইই নিহিত থাকে।

শিখন সম্বন্ধে গেষ্টাল্টবাদীদের গবেষণা।

শিখনের ক্ষেত্রে গেষ্টাল্ট মতবাদের সমর্থক হলেন কোহ্‌লার (Kohler), কফ্‌কা (Koffka) ও ওয়ার্দাইমার (Wertheimer) ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানিগণ।

কোহ্‌লার প্রথমে মুরগীর শিখনের ক্ষেত্রে আচরণ নিয়ে নানান পরীক্ষা করেন। তিনি দুটো একই আকারের কাঠের বাক্স নিয়ে একটার উপর কালো কাগজ ('ক' বাক্স) ও আর একটার উপর ধূসর রঙের কাগজ ('খ' বাক্স) লাগালেন। দুটো বাক্সের উপর তারের জালের সামনে দিয়ে তার উপরে কিছু খাবার ছিটিয়ে দিলেন। তারের জালের উল্টো দিকে মুরগীগুলোকে রাখলেন। বাক্সগুলোকে এমনভাবে রাখা হল যাতে তারের জালের মধ্যে দিয়ে ঠোঁট ঢুকিয়ে মুরগীগুলো খাবার খেতে পারে। এবার মুরগীগুলোকে 'ক' বাক্স থেকে খেতে

গেলে খেতে দেওয়া হোল, আর 'খ' বাক্সের কাছে গেলে হাত দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হ'তে লাগল। এরকম ক'বার করার পর মুরগীগুলো খাবার থাকা সত্ত্বেও আর 'খ' বাক্সের কাছে গেল না। এই পরীক্ষা থেকে দেখা গেল যে শিখন পরিস্থিতিতে মুরগী ও বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটা সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছে ও কালো বাক্সের কাছে যেতে শিখেছে।

এরপর কোহ্‌লার আফ্রিকার উপকূলে টেনিরিফ দ্বীপে একটা শিম্পাঞ্জীকে সকাল থেকে কিছু খেতে না দিয়ে একটা খাঁচায় রাখলেন। খাঁচার মধ্যে উপরে কিছু খাবার ঝুলিয়ে রাখলেন ও খাঁচার মধ্যেই দূরে একটা কাঠের বাক্স রাখলেন। বাক্সটা এতটা উঁচু যে সেটা খাবারের তলায় রাখলে তার উপর দাঁড়িয়ে খাবারটা পাড়া যায়। প্রথমে শিম্পাঞ্জী লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে খাবারটা পাড়ার চেষ্টা করল কিন্তু খাবারটা পেল না। তখন হতাশ হ'য়ে বসে পড়ল। তখন কোহ্‌লার নিজে খাঁচার মধ্যে ঢুকে বাক্সটা টেনে নিয়ে উপযুক্ত স্থানে বসিয়ে খাবারটা হাত দিয়ে ছুঁলেন। পরে বাক্সটা আবার আগের জায়গায় রেখে বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শিম্পাঞ্জীও বাক্সটা টেনে নিয়ে অনুরূপ-ভাবে খাদ্যটা পেড়ে নিল। এইভাবে কয়েকবার করার পর দেখা গেল শিম্পাঞ্জী কোন ইঙ্গিত ছাড়াই তার সমস্যার সমাধান করতে পারে। যতক্ষণ শিম্পাঞ্জী তার পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারে নি ততক্ষণ সে খাবারও পায় নি।

কোহ্‌লারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হোল 'সুলতান' নামে এক বুদ্ধিমান শিম্পাঞ্জীকে নিয়ে। শিম্পাঞ্জীকে খাঁচায় রেখে তার সঙ্গে খাঁচার ভিতর দুটো লাঠি (একটা মোটা ও একটা সরু—একটার ভিতর একটা ঢুকিয়ে জোড়া দেওয়া যায়) এমন ভাবে রাখা হোল, যাতে দুটো লাঠি জোড়া দিলে খাঁচার বাইরের খাবারটা টেনে আনা যায়। সুলতান প্রথমে আলাদাভাবে দুটো লাঠি দিয়ে খাবারটা পাওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু খাবার পেল না। বহুবার চেষ্টা করেও খাবার না পেয়ে সে হতাশ হোল। তখন কোহ্‌লার নিজে বড় লাঠিটা নিয়ে তার তলার দিকটায় আঙুল দিয়ে সুলতানকে একটা ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু সুলতান কিছু না বুঝে দুটো লাঠি নিয়ে খেলা করতে সুরু করল। খেলতে খেলতে হঠাৎ সে সরু লাঠিটা মোটা লাঠিটার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে জোড়া লাঠিটা দিয়ে সে খাবারটা টেনে আনল। এর পরের পরীক্ষায় সে চেষ্টা না করেই সমস্যার সমধান করতে পারল।

এই সব পরীক্ষা থেকে গেষ্টাল্টরা বলতে চান, শিখন সব সময় যান্ত্রিক ক্রিয়ার ফল নয়। সমস্যামূলক পরিস্থিতির সামগ্রিকরূপ উপলব্ধি হওয়ার ফলেই প্রাণীরা সমস্যা সমাধান করতে শেখে। এই উপলব্ধি শিক্ষার মধ্যে হঠাৎ আসে। আজকাল অবশ্য অনেক মনোবিজ্ঞানী যেমন হিলগার্ড, বার্ণার্ড ইত্যাদি বলেন অন্তর্দৃষ্টি হঠাৎ প্রত্যক্ষণের ব্যাপার নয়; এটা ধীরে ধীরে উদ্দেশ্যমুখী প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বিকশিত হয়।

গেষ্টাল্টবাদীদের মতে অন্তর্দৃষ্টি জাগার জন্য পৃথকীকরণ (Abstraction) ও সামান্যীকরণ (Generalisation)—এই দুই মানসিক ক্রিয়ার প্রয়োজন। পৃথকীকরণের সাহায্যে প্রাণী একটা শিখন পরিস্থিতির অন্তর্গত অপ্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলো বর্জন করে, আর সামান্যীকরণের সাহায্যে কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলোই গ্রহণ করে।

যেমন শিম্পাঞ্জী অপ্রয়োজনীয় লম্ফ-ঝম্পগুলো বর্জন করল আর খাবার পাওয়ার পক্ষে প্রয়োজনীয় যে লাঠি জোড়া দেওয়া সেটা গ্রহণ করল। কাজেই দেখা যাচ্ছে শিখন পরিস্থিতির অন্তর্গত সাধারণ সূত্রগুলো উপলব্ধি করার পরই অন্তর্দৃষ্টি হয়। এই শিখনের মধ্যে আছে (১) সমগ্র পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করা, (২) সমস্যার উদ্দেশ্যে সামগ্রিকভাবে সাড়া দেওয়া, (৩) সমস্যার অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ সাধন করা।

শিক্ষাক্ষেত্রে গেষ্টাল্টবাদ—গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিখনের মধ্যে আছে—(ক) অন্তর্দৃষ্টি (খ) সামগ্রিকতার নীতি (গ) সমাধানের আকস্মিক আবির্ভাবের নীতি। তাঁরা শিখনকে জীবধর্মের অঙ্গ হিসাবে দেখেছেন। জীবন বিকাশের বিশেষ ক্ষেত্র হ'ল বিদ্যালয়। এই শিখন সুরু হয় অবিভাজ্য সামান্যীকরণের মধ্যে দিয়ে, আর শেষ হয় পৃথকীকরণের মাধ্যমে।

প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে শিখনের ক্ষেত্রে খানিকটা সময় ও শ্রমের অপচয় হ'ত কিন্তু শিখনের এই তত্ত্বে তা নেই। গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের দেওয়া শিখনের ব্যাখ্যা আধুনিক শিক্ষার উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার ও বিষয়বস্তু নির্বাচনে এই পদ্ধতি বেশ কার্যকরী দেখা যাচ্ছে।

আগেকার দিনে শিক্ষানীতি ছিল—সব শিক্ষণীয় বিষয় মুখস্থ করা, যুক্তি তর্কের বিশেষ কোন স্থান ছিল না তাতে। কিন্তু গেষ্টাল্ট মতবাদে যুক্তি ও বিচারকরণের প্রাধান্য বেশী দেখা যায়। শিক্ষণীয় বিষয়, ভাব সংগঠন, অর্থপূর্ণ উপলব্ধি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে শিক্ষার্থীর সহজাত প্রবৃত্তি বেশী প্রয়োজনীয়।

এতদিন আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে বিশ্লেষক পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। এই পদ্ধতিতে শিক্ষণীয় বিষয়কে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে ছাত্রছাত্রীদের শেখান হ'ত। ফলে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা গড়ে ওঠার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি হ'ত। এর ফলে শিক্ষা হয়ে পড়ত শিক্ষক পরিচালিত ও যান্ত্রিক। যেমন ক্লাসে কবিতা পড়ানর সময় সমগ্র কবিতাটিকে কয়েকটি স্তবকে ভাগ করে নিয়ে পড়ান হ'ত; ফলে সমগ্র কবিতাটির রসোপলব্ধি ছাত্রছাত্রীরা করতে পারত না। বর্তমানে কিন্তু সমগ্র কবিতাটি প্রথমে পড়ান হয়, তারপর স্তবক ধরে ধরে ব্যাখ্যা করা হয়, শেষে আবার ছাত্রছাত্রীরা যাতে সমগ্র কবিতাটির রসাস্বাদন করতে পারে তার চেষ্টা করা হয়। আগে বিশ্লেষণ থেকে সংশ্লেষণে যাওয়া হ'ত, বর্তমানে প্রথমে সংশ্লেষণ, তারপর বিশ্লেষণ, সবশেষে আবার সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়া হয়।

গেষ্টাল্টবাদীরা শিখনের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির গুরুত্ব স্বীকার করেছেন কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি তখনই জাগা সম্ভব যখন একটা সমস্যার বিভিন্ন অংশের মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্বন্ধের উপলব্ধি আসে। ছাত্রছাত্রীর মধ্যে যাতে এই সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষমতা ভালভাবে বিকশিত হয় সেটা সব সময় খেয়াল রাখতে হবে। সম্বন্ধ স্থাপনের কৌশলটা শিক্ষার্থীর জানা থাকলে, তার পক্ষে শেখাটা অনেক সহজ হবে। এছাড়াও শিক্ষার্থীর মধ্যে পৃথকীরণ ও সামান্যীকরণ—এই দুই মানসিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টির প্রতিও বিশেষ যত্নশীল হ'তে হবে।

শ্রেণীতে পাঠদানের সময় শিক্ষককে মনে রাখতে হবে শিখন যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। কাজেই অনর্থক যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সময় ও উদ্যম নষ্ট যেন না হয় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

শিক্ষার্থীর বোধশক্তি ও গ্রহণক্ষমতার উপর নির্ভর করে শিক্ষক শ্রেণীপাঠ পরিচালনা করবেন। শিখন তখনই সার্থক হয় যখন শিক্ষার্থী সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে সমর্থ হয়। সমস্যার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্বন্ধ উপলব্ধির উপর আবার সমাধান অনেকখানি নির্ভর করে। কাজেই প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে সমস্যার অংশগুলির মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারে তার চেষ্টা করতে হবে।

শিক্ষা দেওয়ার আগে দেখতে হবে শিক্ষার্থীর অনুভূতিমূলক ও জ্ঞানমূলক প্রস্তুতি আছে কি না।

শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে অবহিত করতে হবে। গেষ্টাল্ট নীতি সৃজনমূলক কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধনে সহায়তা করে।

অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের ফলে শিক্ষার্থীর আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাড়ে।

গেষ্টাল্ট মতবাদের ত্রুটি—শিখনে ক্ষেত্রে গেষ্টাল্ট মতবাদীরা যথেষ্ট যুগান্তর এনেছেন। কিন্তু তা আনলেও এই মতবাদ সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সব শিখনকে ব্যাখ্যা করা যায় না, অন্তর্দৃষ্টি জাগার আগে শিক্ষার্থীরা অনেক সময় প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতির সাহায্যে নেয়। কোহ্‌লার পরীক্ষা করার সময় নিজে প্রথমে ইঙ্গিত করেছেন প্রত্যেক ব্যাপারে, তাই এখানে যেন মনে হয় অন্তর্দৃষ্টির চেয়ে অনুকরণের প্রভাব বেশী। তাছাড়া পরীক্ষা করার সময় বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির তেমন প্রয়োগ দেখা যায় না।

প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতি ও -মূলক শিখনের তুলনা

প্রচেষ্টা-ভুল পদ্ধতি	অন্তর্দৃষ্টি-মূলক পদ্ধতি
(১) শিখন পরিস্থিতিতে প্রাণী উদ্দীপকগুলোকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখে সাড়া দেয়।	(১) প্রাণী শিখন পরিস্থিতিকে সামগ্রিকভবে দেখে সাড়া দেয়।
(২) উদ্দীপকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার যোগ-সূত্র স্থাপিত হলে শিখন সম্ভব হয়।	(২) শিখন পরিস্থিতির উপযুক্ত সংগঠন হলে শিখন সম্ভব হয়।
(৩) শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা অন্ধ যান্ত্রিক ও উদ্দেশ্য বিহীন।	(৩) শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা সুপরিকল্পিত, অর্থপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমুখী।
(৪) সমগ্র শিখন পরিস্থিতি-বদ্ধ।	(৪) সমগ্র শিখন পরিস্থিতি-উন্মুক্ত।
(৫) শিখনের জন্য উন্নত মানসিক ক্রিয়ার প্রয়োজনে হয় না। বার বার প্রচেষ্টা ও অনুশীলনের সাহায্যে শিখন সম্ভব।	(৫) উন্নততর মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে হয় শিখন। এখানে অন্তর্দৃষ্টি প্রধান হাতিয়ার।
(৬) সময় বেশী লাগে।	(৬) সময় কম লাগে।
(৭) শিক্ষার্থীর শ্রম নষ্ট হয়।	(৭) শিক্ষার্থীর শ্রম বাঁচে।
(৮) শিখনের জন্য বেশীরভাগ প্রচেষ্টা শারীরিক।	(৮) শিখনের জন্য অধিকাংশ প্রচেষ্টা মানসিক।
(৯) স্বল্পবুদ্ধিদের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী।	(৯) মেধাবীদের দ্বারা এই পদ্ধতিতে শিখন অধিক মাত্রায় সম্ভব।

অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া মতবাদ (Theory of Conditioned Response)

অনুবর্তন (Conditioning) কথাটা নানান অর্থে ব্যবহৃত হ'তে পারে। যে কোন অভ্যাসকে আমরা অনুবর্তিত প্রক্রিয়া বলতে পারি। রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক প্যাভলভ এই অনুবর্তনের উপর প্রথম ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন ; তারপর থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আজও চলছে। প্যাভলভের পরে হাল (Hull), স্কিনার (Skinner), হিলগার্ড (Hillgard), মার্কুইস্ (Marquis), মার্কস (Marx) ইত্যাদি এই পদ্ধতির উপর পরীক্ষার কাজ চালান !

পদ্ধতি হিসেবে অনুবর্তন প্রক্রিয়া শিখনের সরলতম পরিস্থিতিতে প্রাণীর আচরণ ব্যাখ্যা করতে পারে। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে শরীরতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, কারণ প্যাভলভ নিজেই ছিলেন শরীর বিজ্ঞানী ও তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। এই অনুবর্তনতত্ত্বে বলা হয়েছে প্রাণী ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্জগৎ থেকে জ্ঞান আহরণ করে। কোন উদ্দীপক প্রথমে উত্তেজিত করে, সঙ্গে সঙ্গে তার একটা প্রতিক্রিয়া হয়। সব প্রাণীর বেলায় একটা স্বাভাবিক উদ্দীপকের (Stimulus) একই রকম স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (Natural response) হয়। যেমন ক্ষুধার্ত কুকুরের ক্ষেত্রে খাবার দেখলে লালাক্ষরণ হওয়া, ছোট শিশুর ক্ষেত্রে উচ্চ শব্দ শুনলে ভয় পাওয়া ইত্যাদি স্বাভাবিক উদ্দীপক ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু প্যাভলভ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করলেন যে কৃত্রিম উদ্দীপকের সামনেও সাড়া দেওয়ার জন্য স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

প্যাভলভের পরীক্ষা—একটা ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে কোনো খাবার রাখলে, তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হবে লালাক্ষরণ (Salivation)। প্যাভলভ পরীক্ষাগারে একটা কুকুরের লালাক্ষরণ পরিমাপের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ক'রে কুকুরটার সামনে কিছু খাবার রাখলেন। এরপর প্রত্যেকদিন কুকুরটাকে খাবার দেওয়ার ঠিক আঁগে একটা ঘণ্টা বাজিয়ে তারপর খাবারটা দিতে লাগলেন। কিছুদিন ধরে এইভাবেই কুকুরটাকে খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। এরপর খাবার দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ঘণ্টা বাজানর সঙ্গে সঙ্গে খাবার দেখার আগেই কুকুরটার লালাক্ষরণ হচ্ছে। প্রথমে কিন্তু খাবার দেওয়ার আগে ঘণ্টা শুনলে কুকুরটার লালাক্ষরণ হতো না। ঘণ্টার শব্দ শুনে কুকুরটা সজাগ হতো, এটা

তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু পরে দেখা গেল ঘণ্টা শোনায় সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটার লালাক্ষরণ। কাজেই স্বাভাবিক উদ্দীপক থেকে কৃত্রিম উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়ার যে সঞ্চালন হচ্ছে একেই বলা হচ্ছে অনুবর্তন (Conditioning) এবং যে প্রাণীর ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন হচ্ছে সেই প্রাণীকে বলা হয় অনুবর্তিত (Conditioned)।
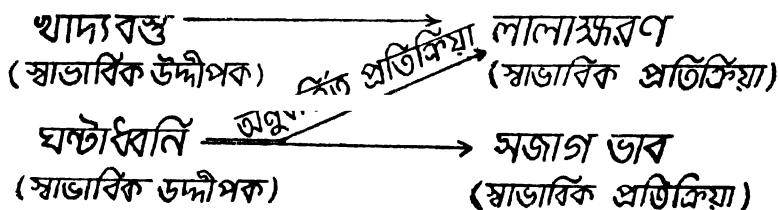
মানুষের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভকে অনুবর্তিত করে দেখালেন বিখ্যাত আচরণবাদী ওয়াটসান (Watson)। গবেষণা করে তিনি দেখিয়েছিলেন নবজাত শিশুর মধ্যে ভয় জাগাতে পারে এমন মাত্র দুটি উদ্দীপক আছে—উচ্চ শব্দ ও হঠাৎ অবলম্বন হারানো। কিন্তু ধীরে ধীরে শিশু অনেক জিনিসকে ভয় করতে শেখে। অনুবর্ত প্রক্রিয়ার সাহায্যে ভয় মাত্র দুটি উদ্দীপক থেকে অনেক উদ্দীপকে সঞ্চালিত হয়। এই সিদ্ধান্তে আসার জন্য তিনি অ্যালবার্ট নামে একটি এগার মাসের শিশুকে পরীক্ষা করেন। শিশুটিকে প্রথমে খরগোশ, ইঁদুর, কুকুর প্রভৃতি দেখাতেন, কিন্তু সে ভয় পেত না, অথচ জোর শব্দ শুনলে সে ভয় পেত। অ্যালবার্টের কাছে প্রথমে একটা সাদা ইঁদুর দেওয়া হলে, সে ইঁদুরের সঙ্গে খেলা করত। কিন্তু কয়েকদিন পর অ্যালবার্ট যখনই ইঁদুরটাকে ধরল তখনই পিছন থেকে খুব জোরে শব্দ করা হোল। শব্দ শুনেই ভয় পেয়ে সে ইঁদুরটাকে ছেড়ে দিল। এইরকম করে কয়েকবার ইঁদুর ও জোর শব্দ একসঙ্গে অ্যালবার্টের সামনে হাজির করার পরে দেখা গেল সে এখন ইঁদুর দেখলেই ভয় পায়। এখানে দেখা যাচ্ছে জোর শব্দের জন্য ভয়টা ইঁদুরের উপর সঞ্চালিত হয়েছে। এরপর ইঁদুরের জন্য ভয়টা সব লোমওয়ালা জন্তুর উপর সঞ্চালিত হ'তে পারে।

ওয়াটসান পরীক্ষা করে আরও দেখালেন যে অনুরূপ আর একটি অনুবর্তন প্রক্রিয়ার সাহায্যে শিশুটির মন থেকে ভয় দূর করাও যায়। যে উদ্দীপকের জন্য তার মনে ভয়ের সঞ্চার হয় সেই উদ্দীপকের সাথে তৃপ্তিকর কোন উদ্দীপকের সংযোগসাধন করতে পারলে তার মন থেকে ভয় দূর হয়।

একটা খরগোসকে দেখলে একটা শিশু ভয় পেত। কিন্তু শিশু যখন মায়ের কোলে থাকে তখন খুব আনন্দজনক অবস্থায় শিশু খেলা করে, খাবার খায় ইত্যাদি। সেই সময় খরগোসটাকে শিশুর কাছে আনা হ'ত। এইভাবে পর পর কয়েকদিন করার পর খরগোস ভীতি তার মন থেকে চলে যায়। এই প্রক্রিয়াকে অনুবর্তনের বিপরীত প্রক্রিয়া মনে করা হয়। একে বলা হয় অপানুবর্তন (Deconditioning)।

অনুবর্তন পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে কয়েকটি নীতির উপর। যেমন—

(ক) **সময়ের নীতি** (Principle of time)—কৃত্রিম উদ্দীপক ও স্বাভাবিক উদ্দীপক—এই দুই উদ্দীপক উপস্থিত করার মাঝখানে সময়ের ব্যবধান যেন বেশী না হয়। ৩ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে ১নং ও ২নং উদ্দীপককে উপস্থিত করতে হবে।

(খ) **তীব্রতার নীতি** (Principle of Intensity)—স্বাভাবিক উদ্দীপকটি যেমন তীব্র হওয়া প্রয়োজন, কৃত্রিম উদ্দীপকটি তেমন কম তীব্র হলে প্রাণীর মধ্যে তেমন ভাবে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না।

(গ) **সামঞ্জস্যের নীতি** (Principle of Consistency)—এই পদ্ধতির মধ্যে কোনরকম পরিবর্তন না করে মোটামুটি একটা সামঞ্জস্য রাখতে হবে।

(ঘ) **পরিস্থিতি সম্বন্ধীয় নীতি** (Principle of Situation)—যে পরিস্থিতিতে অনুবর্তন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে সেখানে মনোযোগ ব্যাহত করার মত কোন জিনিষ না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) **পুনরাবৃত্তির নীতি** (Principle of Repetition)—স্বাভাবিক ও কৃত্রিক উদ্দীপক বার বার উপস্থিত করলেও প্রাণীকে প্রতিক্রিয়া করতে সাহায্য করলে তবেই অনুবর্তন পদ্ধতির সাহায্যে শিখন সম্ভব হয়।

(চ) **পুনরুত্থাপনের নীতি** (Principle of Reinforcement)—কুকুরের লালাক্ষরণ যখন ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে অনুবর্তিত হয়ে যায়, তখন যদি অনেকদিন খাবার না দিয়ে কেবলমাত্র ঘণ্টা বাজান হয় তবে লালাক্ষরণ ক্রমশঃ কমে আসবে; এবং ক্রমে ক্রমে লালাক্ষরণ বন্ধ হবে যাবে। তাই যখন দেখা যাবে লালাক্ষরণ কমে আসছে সেই সময় কৃত্রিম উদ্দীপকের (ঘণ্টার) সাথে স্বাভাবিক উদ্দীপক (খাবার) আবার উপস্থিত করতে হবে—তবে অনুবর্তন প্রক্রিয়াটি ঠিক থাকবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার উপযোগিতা—অনুবর্তন পদ্ধতির

প্রয়োগ শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী। শিশুর ব্যক্তিসত্তা বিকাশের পক্ষে যে সব গুণ বিশেষ সহায়ক যেমন অভ্যাস, শিক্ষা, শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি তা এই অনুর্তন পদ্ধতির সাহায্যে পাওয়া যায়।

শিশুর (প্রথম শিক্ষার্থীর) ভাষা শিক্ষার জন্য এই অনুবর্তন পদ্ধতি (Conditioned Response—C. R. bond)-কে কাজে লাগান যেতে পারে। যেমন—টেব্‌ল্ কথাটা শেখানর সময়, শিক্ষক টেব্‌ল কথাটি মুখে বলবেন ও সঙ্গে সঙ্গে টেব্‌ল দেখাবেন (direct method), কয়েকবার এইভাবে করার পর কাঠের টেব্‌ল্ ও টেব্‌ল্ কথাটি অনুবর্তিত হবে যাবে।

অনুবর্তন পদ্ধতির মধ্যে আমরা জানি যে দুটি উদ্দীপকের মধ্যে সময়ের বেশী ব্যবধান থাকলে আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। কোন ছাত্রছাত্রীকে শেখার ব্যাপারে উৎসাহ দেবার জন্য যদি শাস্তি, পুরস্কার ঘোষণা করা হয় তবে তা সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেওয়া দরকার, তা না হলে শেখায় উৎসাহ কমে যাবে।

শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে শিক্ষক যদি কোন কারণে ছাত্রছাত্রীদের কাছে অপ্রিয় হন তবে তিনি যে বিষয়টি পড়াবেন সেই বিষয়টিও তারা পছন্দ করবে না। এটি অঙ্কের বেলা প্রায়ই ঘটে থাকে। অনেকেরই অঙ্কের প্রতি একটা অহেতুক ভয় থাকে; সেই সঙ্গে অঙ্ক না পারলে শিক্ষক যদি শিশুকে শাস্তি দেন তবে শিশুর অঙ্কের প্রতি গভীর অপছন্দের মনোভাব গড়ে উঠবে। শাস্তি দেওয়ার জন্য শিক্ষককে শিশুদের হয়তো ভাল লাগবে না, ফলে তাঁর বিষয়ও ভাল লাগবে না।

মনের প্রস্তুতি ও উদ্দেশ্য না থাকলে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার সাহায্যে শিখন তেমন ফলপ্রদ হয় না। যেমন কুকুরটার বেলায় দেখা গেল যদি সে ক্ষুধার্ত না হয় তবে খাবার দেখলে উপযুক্ত পরিমাণে লালাক্ষরণ হবে না।

তবে প্রস্তুতি বাড়ালেই শিখন বাড়বে এমন কথা সব সময় বলা যায় না,—'Learning is directly proportioned to the strength of motivation till a physiological limit is reached.' একজন ছাত্রকে হয়তো পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে মানসিক প্রস্তুতি বাড়ান যায়, কিন্তু তাই বলে তাকে ভারতীয় সংবিধান যদি এক সপ্তাহের মধ্যে মুখস্থ করতে বলা হয় তা সে পারবে না। শিখনের জন্য শারীরীক সীমাও একটা প্রয়োজনীয় বিষয়।

স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উদ্দীপক বার বার উপস্থিত করলে তবে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া সম্ভব। অভ্যাসকে অনুবর্তন প্রক্রিয়া ছাড়া আর

কীই বা বলা যায়? একটা জিনিষের বার বার অনুশীলনের ফলে একটা অভ্যাস গড়ে ওঠে।

কতকগুলি শিক্ষণীয় বিষয় আছে। সেগুলি নিয়মিত অভ্যাস না করলে ছাত্রছাত্রীরা ভুলে যাবে। যেমন ভাষা শেখার জন্য ব্যাকরণ শেখা, অঙ্ক শেখার জন্য নামতা মুখস্থ করা ইত্যাদি মাঝে মাঝে অভ্যাস না করালে ছাত্রছাত্রীরা এগুলো ভুলে যায়।

যদি কোন কারণে কোন ছাত্রের মধ্যে কোন কু-অভ্যাস গড়ে ওঠে তবে দীর্ঘদিন সেটি অভ্যাস না রাখলে আস্তে আস্তে ছাত্র সেটি ভুলে যাবে। সময়ের ব্যবধান ও অনভ্যাস তাকে ভুলে যেতে সাহায্য করছে।

শিক্ষকের আরও একটা প্রয়োজনীয় জিনিষ মনে রাখা উচিত। যেমন কোন ছাত্রের যদি কোন বিষয়ে (অঙ্ক) ভয় জন্মায় তবে কেমন করে ভয় দূর করে অপানুবর্তন (deconditioned) এর সাহায্যে তার বিষয়টির প্রতি আগ্রহ জন্মাতে সাহায্য করা যায় তার চেষ্টা করা যেতে পারে। অঙ্ক কষার সময় তাকে আনন্দদায়ক কিছু দিতে হবে। তবেই ধীরে ধীরে তার ভয় কাটবে।

কৃত্রিম পরিবেশ তৈরী করে কৃত্রিম উদ্দীপক দিয়ে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকেও বদলে দেওয়া যায়। যেমন কুকুর সাধারণতঃ মাংস ভালবাসে। কিন্তু পরীক্ষা-মূলকভাবে একটা কুকুরকে একথালা মাংস ও একথালা সব্জি দিয়ে এমনভাবে ব্যবস্থা করা হোলো যাতে কুকুরটা যেই মাংসয় থালা ছুঁতে গেল তখনই সে শক্ খেল, কিন্তু সব্জীর থালা ছুঁলে তার কোন শক্ লাগল না। এরকম কয়েকবার করার পর দেখা গেল কুকুরটা কোন সময়ের জন্য আর মাংস খেত না।

শিখনের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় শিখনের মাত্রা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে—এক এক সময় একেবারে শিখনের গতি স্থির হয়ে যায়। একে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় শিখনের স্থিতাবস্থা (Plateau of learning) বলা হয়। এই সময় শাস্তি ও পুরস্কারের সাহায্যে বিশেষ করে পুরস্কারের সাহায্যে অনুবর্তিত প্রক্রিয়ায় আবার শিখনের ক্ষেত্রে গতি ফিরিয়ে আনা যায়।

শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে শিশুর প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে অনুবর্তনের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। শিশুর পছন্দ, অপছন্দ, ভয়, ঘৃণা, আনন্দ, অনুরাগ প্রভৃতি অনুবর্তনের দ্বারাই সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে যদি কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে তবে সমগ্র বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠতে পারে।

সু-অভ্যাসের মত কু-অভ্যাসও অনুবর্তন প্রক্রিয়া থেকে সৃষ্ট। শিশুর

অসতর্কতা, বানান ভুল, অমনোযোগ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে অনেক সময় দেখা গেছে যে, অজ্ঞতাবশত শিক্ষকই এর জন্য দায়ী। যেমন শিক্ষার্থী পরীক্ষার খাতায় কোন বানান ভুল করলে শিক্ষক লালকালি দিয়ে দাগ দিয়ে দেন। এই লাল রঙ দেখলে বেশীর ভাগ শিশুর ভয় করে (অনুবর্তিত)। ফলে ঐ ভুলগুলো শিশু শোধরাবার চেষ্টা না করে এড়িয়ে যায়।

শিশুকে সামাজিক করার জন্যও শিক্ষক এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাতে পারেন। সামাজিক রীতি নীতি, লৌকিকতা, ভদ্রতা, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস উদার মনোভাব ইত্যাদি শিশুর মধ্যে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষক সুপরিকল্পিত অনুবর্তনের সাহায্য নিতে পারেন।

শিখনের ফিল্ড তত্ত্ব (Field theory of Learning)।

অতি আধুনিক কালে Field Psychology নামে মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা বিশেষভাবে উন্নত হয়েছে। জর্মান মনোবিজ্ঞানী কার্ট লুইন এই শাখার উদ্ভাবক। প্রকৃতির দিক দিয়ে গেষ্টাল্ট মতবাদের সঙ্গে এই তত্ত্বের অনেক মিল আছে। কিন্তু মানুষের জটিল আচরণের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই ফিল্ড তত্ত্বের অনেকটা অভিনবত্ব আছে। মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব, ব্যর্থতা, প্রেষণা প্রভৃতি নিয়ে কার্ট লুইন গবেষণা করেন এবং সেটির সাহায্যে শিখনের ক্ষেত্রে ফিল্ড তত্ত্ব গঠন করা যায়—এই মত প্রকাশ করেন।

এখন আমরা দেখব ফিল্ড কাকে বলে। কোও ব্যক্তি ও তার সঙ্গে সহ-অবস্থিত বিভিন্ন শক্তি নিয়ে যে পরিবর্তনশীল মনোবিজ্ঞানমূলক ক্ষেত্র রচিত হয় তাকেই ফিল্ড বলা হয়। অনেকে হয়তো বলবেন পরিবেশের সঙ্গে এর তফাৎ কোথায়? হ্যাঁ পরিবেশের সঙ্গে ফিল্ডের একটু তফাৎ আছে—পরিবেশের মধ্যে এমন অনেক জিনিষ থাকে যা ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নাও হতে পারে—কিন্তু সেরকম কোনো জিনিষ ফিল্ডের মধ্যে থাকতে পারে না।

ফিল্ডতত্ত্ব বলে ব্যক্তির সমস্ত আচরণই এই মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ড থেকে সৃষ্টি হয় ও নিয়ন্ত্রিত হয়। যে বস্তুগুলি ব্যক্তির চাহিদা মেটাতে সক্ষম সেগুলিকে অস্তিবাচক ও যেগুলি চাহিদা মেটাতে অক্ষম সেগুলিকে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন বস্তু বলা হয়। অস্তিবাচক বস্তু ব্যক্তির মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি করে ও নেতিবাচক বস্তু তার মধ্যে সৃষ্টি করে বিকর্ষণ। এই নেতিবাচক বস্তুই ব্যক্তির

লক্ষ্যে পৌঁছানর পথে বাধা সৃষ্টি করে। লক্ষ্যটা এমন জিনিষ হওয়া দরকার যা তার চাহিদার তৃপ্তি আনতে পারে।

যখন দেখা যায় ব্যক্তি তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে না, তার চাহিদার তৃপ্তি হচ্ছে না, কারণ লক্ষ্যের পথে অনেক বাধা তখন সে ফিল্ডের পুনর্গঠন করে—জিনিষগুলোকে নতুন করে সাজায়। ফিল্ডের এই পুনর্বিন্যাস থেকেই আসে শিখন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। একটা শিশুর সামনের টেবিলে আছে তার প্রিয় খাবার, আর মাঝখানে আছে একটা বেঞ্চ। খাবারটা শিশুর চাহিদা মেটাতে পারে, কাজেই এটা অস্তিবাচক জিনিষ; কিন্তু বেঞ্চটা খাবারটা পাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করছে এটা নেতিবাচক জিনিষ। শিশুটি যখন বেঞ্চ টপকে খাবার নিতে পারছে না, তখন সে কি করবে? তখন সে সহজ পথ ছেড়ে বেঞ্চটাকে ঘুরে টেবিলের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করবে। তার সামনে যে সমস্যা ছিল তা সমাধান করা মাত্রই শিশুটির শিখন ঘটল। কিন্তু সমাধানটি এসেছে এখানে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ কিছু কিছু আছে। যেমন শিক্ষার জন্য প্রেষণা জাগা প্রয়োজন এটা মনে রাখতে হবে। প্রেষণা জাগার ফলে ব্যক্তির মধ্যে যে উত্তেজনা দেখা দেয় তার ফলেই সে আচরণ করতে উদ্যত হয়। তাছাড়া শিখনের ক্ষেত্রটাকে পুনর্বিন্যাস করতে হলে পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। সমস্যা সমাধানের জন্য অন্তর্দৃষ্টি হোলো সার্থক হাতিয়ার; এগুলো শিক্ষকের জানা থাকা দরকার।

শিখনের বিভিন্ন তত্ত্বের সমন্বয়।

শিখনের বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে দেখা যায় মূল বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু তাই বলে তত্ত্বগুলির মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই এমন কথা বলা যায় না। প্রত্যেক তত্ত্বই প্রথমে প্রাণীদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই উদ্ঘাটিত হয়েছে; প্যাভলভের কুকুরের উপর, থর্নডাইকের বিড়াল, মুরগী ইত্যাদির উপর ও কোহ্‌লারের শিম্পাঞ্জীর উপর পরীক্ষাই তা প্রমাণ করে। প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যেতর প্রাণীর উপর পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানই মানুষের শিখনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রত্যেকটি তত্ত্বের মধ্যে দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এদের মধ্যে সত্যতা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে আমরা সব তত্ত্বের মাধ্যমেই শিখি। কিন্তু শিখনের ক্ষেত্রে আমরা কোন অবস্থায় কোন তত্ত্বের সাহায্য নেব তা নির্ভর

করছে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি, পরিস্থিতি ও শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতির উপর। অভ্যাসমূলক কাজ আমরা সাধারণতঃ অনুবর্তনের সাহায্যে শিখি, আবার যে সব পরিস্থিতিতে আমরা সমস্যার সম্পূর্ণ অংশ দেখতে পারছি না সেখানে প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে শিখি। আর যে সব ক্ষেত্রে সমস্যামূলক পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয় সে সব ক্ষেত্রে আমরা অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শিখি।

অনেক মনোবিজ্ঞানী বলেন প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে শেখা ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শেখার মধ্যে খুব কম পার্থক্য আছে। প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে যখন শিখি তখন প্রচেষ্টাটা বাহ্যিক আচরণের দ্বারা প্রকাশ পায়; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শেখার সময় প্রচেষ্টাটা মনের মধ্যে থাকে—তার তখন বহিঃপ্রকাশ হয় না। ফিল্ড তত্ত্বের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। ফিল্ডের পুনর্গঠন প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে করা হয়, কিন্তু পুনর্গঠন শেষ হলেই অন্তর্দৃষ্টি জাগে। এই জন্য ফিল্ড তত্ত্বকে প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতি ও অন্তর্দৃষ্টিমূলক পদ্ধতির সমন্বয় বলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতার উপর শিখন অনেকখানি নির্ভর করে। বুদ্ধিমান লোক যে কাজ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে করে, কম বুদ্ধির লোক সেই কাজ প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে করে।

মনোবিজ্ঞানী ওয়াসবার্ন ও মেগ্রোথ শিখনের মূলতত্ত্বগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা শিখন প্রক্রিয়ার বিকাশের ধারাকে বিশ্লেষণ করে শিখনকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বলেন শিখনের মধ্যে কয়েকটা স্তর আছে; যেমন,

(১) অভিমুখীনতা বা Orientation (প্রথমে সমস্যাটির স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করতে হবে)।

(২) অভিজ্ঞতার অনুসন্ধান বা Exploration (সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় উদ্ভাবন করতে হবে)।

(৩) সম্প্রসারণ বা Elaboration (সমস্যাসমাধানের জ্ঞানকে সম্প্রসারিত করতে হবে ও সমাধানের পদ্ধতির উন্নতি করতে হবে)।

(৪) পরিস্ফুটন বা Articulation (লক্ষ্যে পৌছানর উপায়টাকে সুনির্দিষ্ট ও সুশৃঙ্খলিত করতে হবে)

(৫) সরলীকরণ বা Simplification (অবান্তর বিষয় বাদ দিয়ে উপায়টাকে সহজ সরল করতে হবে)।

(৬) স্বয়ংক্রিয়করণ বা Automatisation (সমস্যা সমাধানের উপযোগী আচরণটির অনুশীলন ও আয়ত্তীকরণ)।

(৭) পুনঃসংস্থাপন বা Re-Orientation (সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে সাধারণ সূত্র স্থাপন করতে হবে)।

এরপর শিখনের সমাপ্তি ঘটে। মানুষ যুগ যুগ ধরে চেষ্টা করে আসছে কেমন করে অল্প পরিশ্রমে কাজ করা যায়, পরিবেশকে আয়ত্তে আনা যায়। শিক্ষার্থীও চেষ্টা করে অল্প আয়াসে শিখনকে কী ভাবে সার্থক করা যায়। শিখনকে সার্থক করতে গেলে কতকগুলো কৌশল শিক্ষার্থীকে আয়ত্ত করতে হয়।

(১) শিক্ষার্থী যখন কোন পাঠ্যবিষয় শেখে তখন তাকে দুভাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা করে। তারা অনেক সময় বিষয়বস্তুকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বার বার পড়ে আয়ত্ত করে (Whole method of learning); আবার অন্য সময় হয়তো বিষয়বস্তুকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নিয়ে আয়ত্ত করে (Part method of learning)। যে সমস্ত বিষয় উপলব্ধির জিনিষ সেগুলি whole method-এ শিখলে ভাল হয়, যেমন কবিতা মুখস্থ। কিন্তু অঙ্ক শেখার সময় part method-এ ভাল ফল পাওয়া যায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি whole method বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারে; আর যেখানে দেখা যায় শিক্ষার্থী কম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সেখানে part method এর বেশী প্রয়োগ হয়।

সামগ্রিক পদ্ধতি (Whole method)—এই পদ্ধতির একটা সীমা আছে। বুদ্ধিমান ছাত্র হলেও তার শিখনের একটা মাত্রা আছে। সামগ্রিক পদ্ধতিতে শিখনেও একদিনে একটা বই মুখস্থ করতে পারবে না।

শিখনের আর এক কৌশল হোল সময়ের ব্যবহারের দিক। শিক্ষার্থী এক নাগাড়ে কোন জিনিষ আয়ত্ত করার জন্য বার বার অনুশীলন করলে একঘেয়েমি এসে যায়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় অবিরাম পদ্ধতি (Massed Learning)। আর শেখার সময়টাকে যদি ভাগ করে নেওয়া হয়, মাঝে মাঝে ৫।১০ মিনিটের বিশ্রাম দেওয়া হয় তখন তাকে বলে সবিরাম পদ্ধতি (Spaced Learning) মনোবিজ্ঞানী এবিংহস্ বলেছেন অবিরাম পদ্ধতির চেয়ে সবিরাম পদ্ধতি শিখনের ক্ষেত্রে বেশী সহায়ক।

শিখনের সময় শিক্ষার্থী যদি সক্রিয় থাকে, নিজে অনেক সময় আবৃত্তি করে নিজের ভুল নিজের কানে ধরতে পারে—ফলে শিখনের মাত্রা বাড়ে।

শিখনের আর এক কৌশল হোলো—কোন বিষয়ের অতি শিখন ভাল। অল্প শিখন হলে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে; কিন্তু অতি শিখনে কোনো দোষ নেই, তবে ধৈর্যের প্রয়োজন।

শিখনের ব্যক্তিগত শর্তাবলী (Subjective Conditions of Learning)

শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা শিখনের ক্ষেত্রে প্রধান প্রযোজ্য বিষয়। মানসিক অবস্থার মধ্যে আছে প্রেষণা (motivation), মনোযোগ (attention) ও অনুরাগ (interest)।

প্রেষণা—আধুনিক কালে সব শিক্ষাবিদ্ প্রেষণার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রেষণ'কে ঠিকমত কাজে লাগাতে না পারলে শিখন শিশুর কাছে স্বতঃস্ফূর্ত হবে না। মনোবিজ্ঞানী টম্সান ((M. K. Thomson) বলেন—"Motivation is super highway to learning." শিখন এক ধরণের প্রক্রিয়া যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, শিক্ষার্থী সেখানে আত্মসক্রিয়—এই আত্মসক্রিয়তা ছাড়া সার্থক শিক্ষা সম্ভব নয়। সুতরাং শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য ছাত্রদের মধ্যে প্রেষণা জাগান অবপর শিখনের ব্যবস্থা করা।

মনোযোগ—শিক্ষার্থী যদি শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি ঠিকভাবে মনোযোগ দিতে না পারে তবে সব ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যাবে। মনোযোগ হোল বিশেষ এক ধরণেব মানসিক প্রক্রিয়া যার সাহায্যে কোন বস্তুকে আমরা চেতনার মধ্যস্থলে আনি, এই প্রক্রিয়ার ফলে আমরা বস্তুটি সম্বন্ধে সচেতন হই ও তার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হয়। কাজেই শ্রেণীপাঠনার কাজে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করবেন এটা তো বলাই বাহুল্য।

অনুরাগ—পরিবেশ থেকে কোন জিনিষ বেছে নিয়ে তার প্রতি আমরা মনোযোগ দিই। এই বেছে নেওয়ার পিছনে যে নীতি কাজ করে, তা হলো অনুরাগ। যে সব জিনিষের প্রতি আমাদের অনুরাগ আছে সেই সব জিনিষের প্রতি আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনোযোগ দিই।

এখন দেখব শিক্ষক কেমন করে শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা, মনোযোগ ও অনুরাগ সঞ্চার করবেন।

(১) শিক্ষার্থীকে যদি শিখনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করা হয় তবে শিক্ষার অনুরাগ দেখা যাবে।

(২) শিক্ষার উদ্দেশ্যকে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

(৩) শিক্ষার্থীদের কৃতকার্যতা সম্বন্ধে তাদের জানাল হলে শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণা জাগবে।

(৪) পরিপূর্ণ সফলতা আসার আগেও শিক্ষার্থীকে প্রতি স্তরে উৎসাহ দিলে এবং শিক্ষার্থীর নিজের অগ্রগতি সম্বন্ধে ধারণা দিলে—শিক্ষায় উন্নতি দেখা যায়।

(৫) প্রশংসা, পুরস্কার ইত্যাদি শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা জাগায়। তবে আন্তরিক প্রেষণা শিক্ষার অগ্রগতির পক্ষে বেশী সহায়ক।

(৬) শিখন যদিও ব্যক্তিগত ব্যাপার তবুও অনেক সময় দলগত প্রভাব দুভাবে শিখনকে প্রভাবিত করে। (ক) দলের মধ্যে শিক্ষার্থীর প্রতিযোগিতার মনোভাব দেখা দেয়— এর থেকেই শিক্ষায় অনুরাগ জন্মায়। (খ) আবার দলগত প্রভাবের ফলে পারস্পরিক সহযোগিতার দিকও লক্ষণীয়। এই সহযোগিতার ফলে শিখন দ্রুত হয়। প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা পরস্পর বিরোধী হলেও এই দুইটি একইসঙ্গে শিখনে সাহায্য করে।

(৭) শিক্ষার্থীর মনোযোগ ও অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক পাঠদানকালে শ্রবণেক্ষণ শিক্ষাসহায়ের (audio-visual aid) সাহায্য নিতে পারেন।

(৮) পরিশেষে বলা যায় শিক্ষকের নির্দেশনা (Guidance) শিখনে বিশেষভাবে সাহায্য করে। ছাত্রছাত্রীদের দোষক্রটি সংশোধন করে তাদের ঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন শিক্ষক।

প্রশ্নাবলী

1. What is meant by learning ? How is it related to maturation ? Discuss some of the conditions of effective learning. (C. U. B. T. 1962)

2. How do Children learn ? Critically consider Thorndike's major laws of learning. (C. U. B. T. 1963)

3. Dwell on learning as conditioned response with suitable illustration. A child displays fear of a dog. How can that fear be deconditioned ? (C. U. B. A. 1962)

4. Discuss the place of maturation and learning in the development of a child. Add your Comment.

(C. U. B. A. H. 1971)

5. Examine the characteristics of 'trial and error' method in learning and bring out its relevance to Education.

(C. U. B. A. H. 1972)

6. State clearly Thorndike's major laws of learning. How far are they adequate in explaining human learning?

(C. U. B. T. 1971)

7. Describe one experiment made on learning with animals and bring out its relevance to education.

(C. U. B. T. 1972)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষায় সঞ্চরণবাদ (Transfer of Training)

আমরা জানি ব্যক্তি জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ শিক্ষার উদ্দেশ্য। মানুষের এই জীবনবিকাশের ধারা অনুশীলন করলে দেখা যায়—প্রত্যেক মানুষই একটা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গৃহ পরিবেশে, সামাজিক পরিবেশে ও বিদ্যালয় পরিবেশে একই উদ্দেশ্যের পথে এগিয়ে চলছে। জীবন পথে চলতে চলতে প্রাণী নিত্য নতুন শিখছে—ও তার জ্ঞান জটিলতায় সমস্যা সমাধানে সার্থকভাবে প্রয়োগ করছে। এইভাবে শিখন নানাক্ষেত্রে সঞ্চালিত হচ্ছে। এই ধরণের সঞ্চালন না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্যে পৌছানো যাবে না।

কোন একটা জিনিস শেখার পর যখন অন্য একটা জিনিস শেখা হয় তখন প্রথমবারের শিখন দ্বিতীয়বারের শিখনের উপর প্রভাব বিস্তার করে; একেই বলা হয় শিখনের সঞ্চালন বা শিক্ষায় সঞ্চরণবাদ। শিক্ষায় সঞ্চরণ কিভাবে হয়

The improvement of one mental or motor function, by the systematic training of another allied function; a highly controversial field in which much experiment research has been carried out.

—Dictionary of Psychology

সে সম্বন্ধে দুটি মতবাদ আছে—মানসিক শক্তিবাদ (Mental Faculty theory) ও মানসিক শৃঙ্খলাবাদ (Formal Discipline theory)।

মানসিক শক্তিবাদ (Mental Faculty theory)।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকরা মনে করতেন মন বা আত্মা একটা অখণ্ড সত্তা; এর যে কোন একটা অংশের উন্নতি হলে সমগ্র মনেরও উন্নতি হবে। মধ্যযুগে মনকে কতকগুলি মানসিক বৃত্তির সমষ্টি মনে করা হ'ত। স্মৃতি, অনুমান, কল্পনা, ইচ্ছা, বুদ্ধি, বিচারকরণ ইত্যাদি হ'ল এক একটা বৃত্তি বা Faculty. এই বৃত্তিগুলি স্থনির্দিষ্ট, পরস্পর নিরপেক্ষ এবং সংখ্যাতেও এরা সীমিত। কোন বিষয়বস্তুর সাহায্যে এগুলির বার বার চর্চা করলে এদের উৎকর্ষ সাধন হয়। শিক্ষার ফল সঞ্চারিত হওয়ার মূলে আছে এই বৃত্তিগুলির উৎকর্ষসাধন। দার্শনিক প্লেটো, জন লক্ প্রভৃতি এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

মানসিক শৃঙ্খলাবাদ (Theory of Formal Discipline)।

মানসিক শৃঙ্খলাবাদটি মানসিক শক্তিবাদ থেকেই এসেছে। এই মতবাদে বলা হয় বিশেষ বিশেষ বিষয় পাঠ করলে বিশেষ বৃত্তির উন্নতি হয়, সবচেয়ে প্রধান যে বৃত্তি—যুক্তি (reason) তার উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজন অঙ্ক শেখা, ল্যাটিন ও ব্যাকরণ চর্চা করা। স্মৃতি ও কল্পনার উৎকর্ষসাধনের জন্য কবিতা পড়া প্রয়োজন।

কিন্তু এই মতবাদ এর সমর্থক ছিলেন পেইনি (Payne), ইয়েল (Yale) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানী। মানসিক শক্তিবাদ ও শৃঙ্খলাবাদ বহুদিন ধরে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে এসেছে। হার্বার্ট ইত্যাদি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই মতবাদের উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেও উইলিয়াম জেম্‌সই প্রথম এই মতবাদের উপর গভীর বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানিগণ মানসিক শক্তিতত্ত্বে ও শৃঙ্খলাতত্ত্বে আর বিশ্বাস করেন না।

শিখন সঞ্চালনের উপর পরীক্ষা—উইলিয়াম জেমস নিজের স্মৃতিশক্তি বাড়ান যায় কিনা এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন। তিনি প্রথম তাঁর স্মৃতিশক্তির পরীক্ষার জন্য ভিক্টর হিউগোর 'স্যাটির' থেকে ১৫৮ লাইন বেছে নিয়ে মুখস্থ করেন—এতে তাঁর সময় লেগেছিল ১৩১ মিনিট। এরপর তাঁর স্মৃতিশক্তির উন্নতির জন্য ৩৮ দিন ২০ মিনিট করে পড়ে, মিল্টনের 'প্যারাডাইস্ লষ্ট' এর

১ম খণ্ড সম্পূর্ণ মুখস্থ করেন। এরপর তিনি দেখতে চাইলেন তাঁর স্মৃতিশক্তি কতটা বেড়েছে। এবার তিনি হিউগোর "স্যাটির" থেকে অন্য ১৫৮ লাইন বেছে নিয়ে মুখস্থ করতে লাগলেন; এতে তাঁর সময় লেগেছিল ১৫১½ মিনিট। স্মৃতিশক্তির উন্নতি হলে সময় আরও কম লাগতো। এইভাবে তিনি তাঁর ছাত্রদের উপরও পরীক্ষা করেন। এখানে অবশ্য শিখনের ক্ষেত্রে মানসিক অবসাদ, বিষয়বস্তুর কাঠিন্য ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ না করে পরীক্ষা করা হয়েছে বলে জেমসের পরীক্ষার বিশেষ বৈজ্ঞানিক মূল্য দেওয়া হয় না।

বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর পরীক্ষা।

(১) **সংগ্রাহক ও চালক যন্ত্রের সমন্বয়মূলক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু পরীক্ষা** (Sensory motor learning material)—ওয়েব কাগজের উপর রেখা টেনে কতকগুলি ধাঁধা তৈরী করেন তারপর নির্দেশ দিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষার্থীকে নক্সার উপর হাত চালিয়ে অনুশীলন করতে বলেন। এরপর অনুশীলনের প্রভাব দেখার জন্য অন্য নক্সার উপর হাত চালিয়ে শিক্ষার্থীকে পথনির্দেশ করতে বলেন। পরীক্ষা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে সংগ্রাহক ও যন্ত্রের (Sensory and motor learning) সমন্বয়মূলক কাজের শিখনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থায় শতকরা ১৯ থেকে ৭৭ ভাগ ধনাত্মক শিখন সঞ্চালন (Positive Transfer হয়।

(২) **প্রত্যক্ষণমূলক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু** (Perceptual learning material)—থর্নডাইক ও উডওয়ার্থ শুধুমাত্র চোখে দেখে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে শেখান। ক্ষেত্রফল নির্ণয় ক্ষমতা কতটা সঞ্চালিত হয়েছে তা জানার জন্য অনুরূপভাবে অন্য কতকগুলি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলেন। পরীক্ষার পর তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে (ক) শিখনের সঞ্চালন সার্বজনীন নয়। (খ) শিখন সঞ্চালনের পরিমাণ বিভিন্ন শিখন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন।

(৩) **স্মৃতি সংক্রান্ত শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু** (Memory Materials)—ইংরেজ মনোবিজ্ঞানী স্লাইট (Sleight) মুখস্থ করার ক্ষমতা কিভাবে সঞ্চালিত হয় তার পরীক্ষা করেন। তিনি তাঁর পরীক্ষার্থীদের গদ্য, পদ্য, চিঠি, অর্থহীন শব্দ, রাশিবিজ্ঞান ব্যবহৃত ছক ইত্যাদি নানান জিনিস মুখস্থ করান এবং তাদের পারস্পরিক ক্ষেত্রে কি পরিমাণে সঞ্চালিত হয় তা নির্ণয় করেন। তিনি শেষে

এই সিদ্ধান্ত করেন যে (১) স্মৃতির সঞ্চালন মানসিক শৃঙ্খলাবাদের উপর নির্ভরশীল নয়। (২) অনুশীলনের দ্বারা স্মরণ করার ক্ষমতা বাড়ান যায় না।

(৪) যুক্তি ক্ষমতার সঞ্চালন (Transfer of Reasoning)—মনোবিদ উইঞ্চ (Winch) বিদ্যালয়ে দু'দল ছাত্রের সাহায্যে এই পরীক্ষা করেন ; প্রথমে একটা যুক্তির অভীক্ষা প্রয়োগ করে তাদের প্রাথমিক যুক্তিক্ষমতা দেখে নেন। পরে এক দলকে ১০ সপ্তাহ যত্ন করে পাটীগণিত অনুশীলন করানো হয়; অন্য দলকে স্বাভাবিক পাঠ্যসূচী অনুসরণ করতে বলা হয়। শেষে পরীক্ষায় দেখা গেল, যে দল পাটীগণিত অনুশীলন করেছিল তারা শতকরা ৩০ ভাগ বেশী নম্বর পেল। এর থেকে উইঞ্চ সিদ্ধান্ত করলেন—গাণিতিক যুক্তির অনুশীলন অন্যান্য যে-কোন সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয়।

(৫) আদর্শের সঞ্চালন (Transfer of Ideals)—আদর্শ কিভাবে সঞ্চালিত হয় তার বিবরণ দিয়েছেন মনোবিজ্ঞানী বাগ্‌লে (Bagly)। তিনি একদল ছাত্রকে অঙ্ক খাতা পরিষ্কার রাখার নির্দেশ দেন এবং বার বার এ বিষয়ে তাদের সতর্ক করেন। পরে দেখা গেল তাদের অন্যান্য খাতাগুলোও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাঁর মতে যে-কোন মানসিক ক্রিয়া আদর্শের স্তরে উন্নীত হলে, যে কোন পরিস্থিতিতে তা সঞ্চালিত হয়।

বিভিন্ন স্কুলপাঠ্য বিষয়ের উপর পরীক্ষা।

বিদ্যালয়ে যে সব বিষয় পড়ান হয় তাদের মধ্যে কিভাবে সঞ্চালন হয় তা জানার জন্য অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। যেমন—

(ক) ব্যাকরণ শিক্ষার সঞ্চালন মূল্য—ব্যাকরণ শিক্ষা কিভাবে ভাষা শিক্ষাকে প্রভাবিত করে তা জানার জন্য ব্রিগস (Briggs) দু' দল ছাত্রকে নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। যে দল ব্যাকরণ পড়েছিল সে দল ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল।

(খ) পাটীগণিত শিক্ষার সঞ্চালন মূল্য—উইঞ্চ পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন গাণিতিক যুক্তিও ৩০% সঞ্চালিত হয়।

(গ) জ্যামিতি শিক্ষার সঞ্চালন মূল্য—মনোবিজ্ঞানী রাগ্‌ (Rugg) দেখিয়েছেন যে জ্যামিতির প্রশিক্ষণ অন্যান্য সমাধানের ক্ষেত্রে ৩২% সঞ্চালিত হয়।

(ঘ) ল্যাটিন শিক্ষার সঞ্চালন মূল্য—ইংরেজী ভাষার উপর ল্যাটিনের

প্রভাব দেখিয়েছেন মনোবিদ কক্স (Coxe)। অবশ্য কেবলমাত্র ল্যাটিন উদ্ভূত ইংরেজী শব্দগুলোকে তাড়াতাড়ি শিখতে সাহায্য করে। কাজেই এর মানসিক শৃঙ্খলাগত বিশেষ সার্বজনীন মূল্য নেই।

(ঙ) **উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষার সঞ্চালন মূল্য**—হিউইন্স (Hewins) নামে একজন মনোবিজ্ঞানী উদ্ভিদ বিদ্যার সঞ্চালন মূল্য কতখানি তা দেখিয়েছেন। উদ্ভিদবিদ্যার জ্ঞান উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয় পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ৩৩% ও সাধারণ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে মাত্র ৪'৫% সঞ্চালিত হয়।

বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের আপেক্ষিক সঞ্চালন মূল্য—থর্নডাইক একবছরে নানান বিষয়ে পরীক্ষা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে আসেন যে বিদ্যালয়ের শিখন সাধারণভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ২৩% সঞ্চালিত হয়। তিনি আরও বলেন যে বুদ্ধিমান ছাত্ররা বেশী পরিমাণে সঞ্চালিত করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে সঞ্চালনের পরিমাণ শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির উপর অনেকখানি নির্ভর করে।

সঞ্চালন কিভাবে ঘটে ?

এখন আমরা দেখব সঞ্চালন কিভাবে ঘটে।

(১) **বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য**—থর্নডাইক বিশ্বাস করেন যে দুটি বিষয়ের মধ্যে যদি খুব সাদৃশ্য থাকে তবে সঞ্চালন ধনাত্মক (Positive) হয়। যেমন বাংলা ব্যাকরণ ভালভাবে আয়ত্ত করলে ইংরেজী ও সংস্কৃত ব্যাকরণও ভালভাবে জানতে সাহায্য করে।

(২) **পদ্ধতির সাদৃশ্য**—শিখন পদ্ধতির মধ্যে যদি মিল থাকে তবে শিক্ষাফল সঞ্চালিত হয়। যোগ অঙ্ক আর গুণ অঙ্কের মধ্যে পদ্ধতিগত মিল আছে বলে কোন ছাত্র ভাল যোগ পারলে ভাল গুণও পারবে।

(৩) **লক্ষ্যগত সাদৃশ্য**—ব্যাগলি বলেন, দুটি শিক্ষার বিষয়ের যদি লক্ষ্য একরকম হয় তবে পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু এক না হলেও উল্লেখযোগ্য সঞ্চালন ঘটবে।

(৪) **জাডের অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ**—জাড বলেন সঞ্চালন নির্ভর করে কোন ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতার কতটা সামান্যীকরণ করতে পারল তার উপর। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরাও এই সামানীকরণের উপর খুব গুরুত্ব দেন।

(৫) **স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উৎপাদক তত্ত্ব**—স্পীয়ারম্যান বলেছেন আমাদের বুদ্ধির মধ্যে দুটি উপাদান আছে "g" ও "s"—প্রথমটি সমস্ত জিনিস

শেখার ক্ষমতা এবং অন্যটা বিশেষ জিনিস শেখার ক্ষমতা। "g" যার মধ্যে বেশী তার ক্ষেত্রে শিক্ষার সঞ্চালনও বেশী।

(৬) **গেষ্টাল্ট সঞ্চালন মতবাদ**—গেষ্টালদের মতে শিখন হোল অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে মোকাবিলা করতে জানা। এইভাবে শিখন ঘটে বলে শিখন সঞ্চালিত হয়। শিক্ষার্থী যদি প্রথম শিখন পরিস্থিতিতে সমগ্র ও অংশের সংযোগটা অনুধাবন করতে পারে তবে সেই জ্ঞান দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার নামই সঞ্চালন।

অনেকে বলেন, যে সব বিষয় খানিকটা যান্ত্রিকভাবে শেখা হয়, যারমধ্যে সেন্সারী ও মোটর নার্ভের কাজ বেশী থাকে সেসব ক্ষেত্রে সঞ্চালন ভাল হয়। যেমন সাইকেল চালাতে জানলে রিক্সা চালান খুব সহজ হয়, টাইপ করতে জানলে ব্যাঞ্জো বাজান সহজ হয়। মানসিক শক্তির ক্ষেত্রে এতটা সঞ্চালন সম্ভব কিনা এ সম্বন্ধে আজকের দিনে অনেকের মনেই জিজ্ঞাসা আছে। যাঁরা ভাল অভিনয় করেন তাঁরা তো কত বড় বড় উক্তি মুখস্থ রাখেন কিন্তু পরীক্ষায় তাঁরা খুব ভাল করেন বলে আমাদের জানা নেই। কাজেই একটা জিনিস ভাল জানলে অনুরূপ আর একটা জিনিস ভাল জানবে, সব সময় সে কথা প্রযোজ্য নয়। এই সঞ্চালন তত্ত্ব অনুসারে বলা হয় যে, যে কোন একটা ভাষায় ভাল হলে অন্য ভাষায়ও ভাল হবে। কিন্তু বাংলায় ভাল ইংরেজীতে পাশ করতে অসুবিধা বোধ করে অথবা ইংরেজীতে ভাল বাংলায় পাশ করতে হিমসিম খায় সেরকম উদাহরণ বিরল নয়। কাজেই শিখন ও সঞ্চালন সবক্ষেত্রে ঠিক একভাবে কার্যকরী হয় না একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

শিখন-সঞ্চালনের শিক্ষাগত মূল্য—এখন আমরা দেখব শিখন-সঞ্চালনের শিক্ষাগত মূল্য কি। বিদ্যালয়ের শিক্ষা শিক্ষার্থীরা বৃহত্তর জীবনে সঞ্চালিত করে। শিক্ষার্থীর মধ্যে এমন কতকগুলি নমনীয় আচরণ ধারা দিয়ে দেওয়া উচিত যার পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে তারা জীবনের যে-কোন সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

শিখন-সঞ্চালনের আর একটা গুরুত্ব হচ্ছে এই যন্ত্র-সভ্যতার যুগে আমরা অল্প শক্তি ব্যয় করে বেশী কাজ করতে চাই। কাজেই মানসিক শক্তির অপচয় বন্ধ করে আমরা যত তাড়াতাড়ি নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজন করতে পারব তত তাড়াতাড়ি আমরা জীবনপথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হব। শিখন-সঞ্চালনের ফলে মানসিক শক্তির অযথা অপচয় অনেকখানি কমে যাবে।

শিখন-সঞ্চালনকে শিক্ষাক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে হ'লে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে তা করতে হ'বে। যেমন—

(১) আমরা জানি উদ্দেশ্যহীন যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির দ্বারাও শিখন হয় কিন্তু সে শিখনের সঞ্চালন হয় না। তাই বর্তমান শিখন পরিস্থিতির উপযোগিতা ছাত্রদের জানাতে হবে তবেই শিখন-সঞ্চালন সম্ভব হবে।

(২) শিখন-সঞ্চালন শিক্ষার্থীর বোধগম্যতার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। এই বোধগম্যতা আবার শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। বুদ্ধি হয়তো বাড়ান যায় না কিন্তু বুদ্ধির সীমার মধ্যে থাকলে নানান কৌশল অবলম্বন করা যায়। যেমন কমবুদ্ধি যাদের তাদের মূর্ত জিনিসের মাধ্যমে পড়ালে তারা সহজে বুঝতে পারে। তার ফলে হয়তো তাদের সঞ্চালনের মাত্রা বাড়ে।

(৩) অভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে সঞ্চালন সহজে হয়। তাই সঞ্চালন বাড়াতে-হলে শিক্ষককে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে যে মিল আছে তা ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। তাদের মধ্যে অভিন্ন উপাদান খুঁজে পাওয়ার অভ্যাস গঠন করতে হবে।

(৪) শিখন-সঞ্চালন বিশেষভাবে বিষয়বস্তুর মূল তত্ত্বের উপর নির্ভর করে। অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের জন্য শিক্ষক বিভিন্ন সমজাতীয় বস্তু উপস্থিত ক'রে তার থেকে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করতে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করবেন। এই সাধারণ সূত্রের জ্ঞান কেমন করে অন্য পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে হয় তাও শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের শিখিয়ে দেবেন।

(৫) ব্যক্তিজীবনের আদর্শের সঙ্গে শিখনকে যুক্ত করতে পারলেও শিখন সঞ্চালন ত্বরান্বিত হয়। কতকগুলো এমন আদর্শ আছে যেগুলো শিখনকেই সাহায্য করে। যেমন—জ্ঞানার্জনের আকাঙ্খা, শিক্ষার প্রতি অনুরাগ, অন্যমতের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি। বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমের মধ্যে দিয়ে শিক্ষক এমন কতক-গুলো ছোট ছোট আদর্শ গড়ে তুলবেন যা শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করবে। যেমন—(ক) সামাজিক সংহতির আদর্শ, (খ) সঙ্গীত, চিত্রকলা ইত্যাদি সুকুমার বিষয়ের রসোপলব্ধির আদর্শ। (গ) কাজ-এর প্রতি মনোভাবের আদর্শ (ঘ) পরমত সহিষ্ণুতার আদর্শ ইত্যাদি।

আধুনিক পাঠ্যসূচী শিখন-সঞ্চালনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। আমারা জানি শিখন-সঞ্চালন সার্বজনীন নয়; অনেক ক্ষেত্রে

এটা ধনাত্মক হলেও সঞ্চালনের পরিমাণ বেশী নয়। তাই পাঠ্যসূচীতে শৃঙ্খলার কথা চিন্তা করে কয়েকটি মাত্র বিষয় রাখলে চলবে না। কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে দিয়ে ছাত্ররা সবরকম কৌশল শিখতে পারবে না। আজকাল তাই পাঠ্যক্রমিক ও সহপাঠ্যক্রমিক পাঠ্যসূচীর মধ্যে সমস্ত বিষয় আনার কথা বলা হয়েছে। সঞ্চালনের জন্য শিক্ষা, সঞ্চালনের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা, সঞ্চালনের জন্য পাঠদান ইত্যাদির কথা শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। এগুলো সার্থক করতে না পারলে বিদ্যালয়ের শিক্ষা আদর্শচ্যুত হয়ে পড়বে।

প্রশ্নাবলী

1. What is meant by Transfer of Training? When does transfer take place? Discuss how to ensure Transfer from class room situation to life? (C. U. B. T. '66)

2. Should Mathematics be taught only for its disciplinary value? Discuss in the light of recent experimental findings on transfer of training. (C. U. B. T. 1970)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিখনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া

সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ (Sensation and Perception)।

আমাদের চারপাশে বিশ্বজগতের নানান জিনিস ছড়ান রয়েছে—তারা সবসময় আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করছে, সেই প্রভাবে আমরা সাড়া দিচ্ছি, তার ফলে আমাদের মধ্যে একটা চেতনা ও অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে—একেই আমরা বলি সংবেদন (Sensation) আর বাইরের জিনিস আমাদের মধ্যে সাড়া জাগালে আমরা তাকে বলি উদ্দীপক (Stimulus)। মনোবিজ্ঞানী স্যালি (Sully) সংবেদনের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন—'কোন অন্তর্মুখী স্নায়ুর বহিঃপ্রান্ত উদ্দীপিত হ'লে যখন এই উদ্দীপনা মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হয় তখন তার দ্বারা সৃষ্ট মানসিক প্রক্রিয়ার নাম সংবেদন'।

আমরা আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাইরের জগত থেকে জ্ঞান আহরণ করি। প্রথমে বাইরের কোন বস্তু সম্বন্ধে আমাদের মনে অনুভূতি জন্মায়, সেই অনুভূতিটা পরে অর্থপূর্ণ হয়। যেমন ধরা যাক দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছে—প্রথমে একটা শব্দ সম্বন্ধে আমাদের মনে অনুভূতি জাগল—এর নাম সংবেদন। কিন্তু যখন শব্দটা আমার কাছে অর্থপূর্ণ হোল অর্থাৎ আমি জানলাম এটা একটা ঘণ্টার শব্দ তখন আর এটা সংবেদন স্তরে থাকল না, এটা হয়ে গেল প্রত্যক্ষণ (Perception)।

অনেকে বলেন সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ একই মানসিক প্রক্রিয়ার দুটি ভিন্ন রূপ—এদের আলাদা কোন সত্তা নেই। ডঃ ওয়ার্ড বলেন বিশুদ্ধ সংবেদন মনোবিদ্যার দিক থেকে অলীক বস্তু। কেবলমাত্র সদ্যোজাত শিশুর ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ সংবেদন হয়। যদিও মানসিক প্রক্রিয়া হিসাবে আগে সংবেদন পরে প্রত্যক্ষণ আসে কিন্তু দুটোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান এতই কম যে বিশুদ্ধ সংবেদনের অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। কারণ কোন জিনিস সম্বন্ধে অনুভূতি হলেই প্রায় সেটা সঙ্গে সঙ্গে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। মনোবিজ্ঞানী স্টাউট বলেছেন—হাঁটতে হাঁটতে দূর থেকে ভেসে আসা একটা শব্দ অন্যমনস্কভাবে শুনে চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে বুঝলাম এটা পাশের বাড়ীর পিয়ানোর শব্দ। প্রথম মানসিক অবস্থাটা হ'ল প্রত্যক্ষণবিহীন সংবেদন। কাজেই বিশুদ্ধ সংবেদনের একটা স্তর আছে।

সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ হলেও দুটো এক বস্তু নয়। সংবেদন ছাড়া প্রত্যক্ষণ হ'তে পারে না কিন্তু প্রত্যক্ষণ ছাড়া সংবেদন হয়। কাজেই দ্বিতীয়টি প্রথমটির উপর নির্ভরশীল হোলেও প্রথমটি দ্বিতীয়টির উপর নির্ভরশীল নয়।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যে অনুভূতি পাই সেইগুলিই হোল সংবেদন। ইন্দ্রিয়ানুভূতি সাধারণতঃ পাঁচ রকমের—দেখা, শোনা, আঘ্রাণ করা, আস্বাদ করা ও স্পর্শ করা।

সংবেদন হ'তে গেলে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন (১) উদ্দীপক (২) স্নায়ুতন্ত্র (৩) মন।

এখন আমরা দেখব সংবেদনের বৈশিষ্ট্য কি ?—

(১) সংবেদন হচ্ছে জ্ঞানের সরলতম উপাদান। বিশ্বজগতকে আমরা প্রথমে এই সংবেদনের মাধ্যমেই জানি।

(২) উদ্দীপক না থাকলে সংবেদন হয় না। তবে উদ্দীপক বাহ্যিক ও মানসিক দুইই হোতে পারে।

(৩) সংবেদন একরকম মানসিক অনুভূতি। কিন্তু এই অনুভূতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও বস্তুকেন্দ্রিক হতে পারে।

(৪) সংবেদন যখন মনের মধ্যে আসে তখন মন নিষ্ক্রিয় থাকে।

(৫) সংবেদন জোর করেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

সংবেদনের ধর্ম (Attributes of Sensation)।

সংবেদনগুলোকে পরস্পর পরস্পরের থেকে পৃথক করার জন্ত মনোবিজ্ঞানীরা সংবেদনের তিন প্রকার গুণের কথা বলেছেন—গুণগত ধর্ম, পরিমাণগত ধর্ম ও স্থানগত ধর্ম।

গুণগত ধর্ম—দেখার সংবেদন শোনার সংবেদন থেকে আলাদা। এটি জাতিগত গুণের তফাৎ। কিন্তু একই ধরনের সংবেদনের মধ্যে যেমন লাল রং দেখার সংবেদন ও সবুজ রঙ দেখার সংবেদনও আলাদা, একে বলা হয় উপজাতিগত গুণের তফাৎ।

পরিমাণগত ধর্ম—মোমবাতির আলো চোখে দেখা ও ইলেকট্রিকের জোরালো আলো দেখার মধ্যে পরিমাণগত তফাৎ রয়ে গেছে।

স্থানগত ধর্ম—দেহের বিভিন্ন অংশের স্পর্শ একরকম নয় ফলে সংবেদনও ভিন্ন ভিন্ন হয়। আঙুলের ডগার স্পর্শ খুব তীক্ষ্ণ, দেহের অন্ত অংশের স্পর্শের চেয়ে আলাদা।

কোন কোন মনোবিজ্ঞানী বলেন সংবেদনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল অনুভূতি। এই অনুভূতি আবার ভাললাগা বা মন্দলাগার মধ্যে বিভক্ত। গান এমনিতে ভাল লাগে কিন্তু বিপদের সময় ভাল লাগে না।

প্রত্যক্ষণ।

এখন আমরা দেখব প্রত্যক্ষণের প্রকৃত স্বরূপ কি। একটি সংবেদন যখন অর্থপূর্ণ হয় তখন সেটাকে প্রত্যক্ষণ বলা হয়। প্রথমে একটা শব্দ শুনে এগিয়ে গেলাম একটু পরে জানলাম এটা একটা গাড়ীর শব্দ এটা হ'ল প্রত্যক্ষণ (Perception)।

প্রত্যক্ষণের স্তর বিভাগ—প্রত্যক্ষণের মধ্যে কয়েকটি স্তর হ'ল—

(১) **পৃথকীকরণ** (Discrimination)—বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সংবেদন

থেকে যে প্রত্যক্ষণ হয় তাও বিভিন্ন ধরনের। দৃষ্টিগত ও স্পর্শগত প্রত্যক্ষণের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাকেই পৃথকীকরণ বলা হচ্ছে।

(২) সাদৃশ্যকরণ (Assimilation)—আগেকার কোন প্রত্যক্ষণের সঙ্গে বর্তমানের কোন প্রত্যক্ষণের মিল খুঁজে বার করা।

(৩) অনুষঙ্গ স্থাপন ও পুনরুজ্জীবন (Association and Reproduction)—আগে বরফ ধরে দেখেছি খুব ঠাণ্ডা। পরে কেবলমাত্র বরফ দেখলেই অনুভূতি হবে ওটা ঠাণ্ডা।

(৪) বস্তু-চেতনা ও স্থান নির্ণয় (Objectification and Localisation)—প্রথমে একটা আলো দেখলাম কিন্তু আলোটা কোথা থেকে আসছে ও ওটা কিসের আলো বোঝার পরে প্রত্যক্ষণের বস্তুচেতনা ও স্থান নির্ণয় হ'ল।

(৫) বিশ্বাস (Belief)—একটা সংবেদন অর্থপূর্ণ হলেই আমরা তাতে বিশ্বাস করি ও সেইমত কাজ করি। শব্দ শুনে গাড়ীর শব্দ বুঝে ফেললেই আমরা হয়তো এগিয়ে যাই অথবা ঘরদোর ঠিকঠাক করি।

প্রত্যক্ষণের এইসব স্তর থেকেই আমরা প্রত্যক্ষণের স্বরূপ নির্ণয় করতে পারি। যেমন—(ক) প্রত্যক্ষণ হ'ল একটা উপস্থাপনমূলক পুনরুজ্জীবন (খ) প্রত্যক্ষণ হ'ল জানা ও চেনার একটা যৌথ প্রক্রিয়া (গ) প্রত্যক্ষণ হ'ল একটা সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া—কারণ অতীতের ও বর্তমানের সংযোগ স্থাপন করে প্রত্যক্ষণ। (ঘ) প্রত্যক্ষণ একটা অভ্যাস সাপেক্ষ ব্যাপার।

প্রত্যক্ষণের আরও দুটি দিক আছে—ব্যক্তিগত ও বস্তুগত। কখনও কখনও কোন প্রত্যক্ষণ সকলের কাছে একরকম হয় তখন তাকে বলা যায় বস্তুগত প্রত্যক্ষণ। কিন্তু একটা জিনিস প্রত্যক্ষণের মধ্যে যখন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে সেটি ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষণ।

গেষ্টাল্টবাদীরা বলেন—সমগ্রতার দিকে একটা মানসিক প্রবণতা থাকার জন্য প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে যদি ফাঁক থাকে তবে তা কল্পনার সাহায্যে পূরণ করা হয়। আমরা বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ করার সময় একক হিসাবে প্রত্যক্ষ করি। কারণ হিসাবে তাঁরা বলেন—

(১) সান্নিধ্য (Proximity)—বিভিন্ন বস্তু কিংবা একরকম বস্তু পরস্পর নিকটে থাকলে একটা সমগ্রতার সৃষ্টি হয়। রাতের আকাশে যে সব নক্ষত্র কাছাকাছি থাকে তারা কালপুরুষ, সপ্তর্ষিমণ্ডল ইত্যাদি নাম নিয়ে এক একটা সমগ্রতার সৃষ্টি করেছে।

(২) সাদৃশ্য (Similarity)—যে সমস্ত বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আছে সেগুলি প্রত্যক্ষকরার সময় তারা একটা দল গঠন করে। একই মাঠে গরু, ছাগল, ভেড়া চরলে আমরা প্রথমে একটা বড় দল হিসাবে দেখি পরে তাদের মধ্যে আবার গরুর দল, ছাগলের দল, ভেড়ার দল ইত্যাদি ভাগ করি।

(৩) নিরবচ্ছিন্নতা (Continuity)—যে বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ করি সেগুলির মধ্যে যদি নিরবচ্ছিন্নতা থাকে অর্থাৎ একটার পর একটা আসে তবে সেগুলিকে প্রত্যক্ষ করার সময় তারা দলবদ্ধ হয়ে যায়। যেমন কতকগুলি বাল্ব যদি পর পর জলে তবে তাদের মধ্যে একটা গতি এসে যায় ও তাদের সামগ্রিক রূপটা ধরা পড়ে।

(৪) আন্তর্বেষ্টন (Inclusiveness)—প্রত্যক্ষণের বস্তু যদি কোন একটি নকশা বা প্যাটার্নের অন্তর্ভুক্ত থাকে তবে তা সামগ্রিকভবে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়।

(৫) সম্পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য (Completeness and Symmetry)—অসম্পূর্ণ ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ বস্তুর চেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সম্পূর্ণ বস্তু সহজ ও স্বাভাবিকভাবে প্রত্যক্ষণের মধ্যে আসে।

(৬) পরিচিতি (Familiarity)—কোন বস্তুর সঙ্গে আমাদের পরিচিতি থাকলে প্রথমেই সেই বস্তুর প্রত্যক্ষণ হয়।

এসব আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে আমরা যখন কোন মানুষকে প্রত্যক্ষণ করি তখন তার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আলাদা আলাদা ভাবে দেখি না. মানুষের দেহের অংশগুলির মধ্যে সান্নিধ্য, সাদৃশ্য, সংবহতা, সম্পূর্ণতা, সামঞ্জস্য ইত্যাদি সবগুলিই বিদ্যমান।

সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের সম্বন্ধ (Relation between Sensation and Perception)।

সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে। কিন্তু তাই বলে দুটি প্রক্রিয়া একেবারে এক নয়—দুটির মধ্যে পার্থক্যও কিছু আছে। প্রথমে দেখব সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের মধ্যে সাদৃশ্য কি। (১) উভয়েই ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে, (২) সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ উভয়েই বহির্মুখী প্রক্রিয়া কারণ বাইরের জগত থেকে উদ্দীপনা এলে তবেই সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ সম্ভব।

বৈসাদৃশ্য—(১) সংবেদন হোলো একটা উদ্দীপনার প্রাথমিক বোধ, কিন্তু প্রত্যক্ষণ হোলো অর্থযুক্ত উদ্দীপনা।

(২) সংবেদন জ্ঞানের উপাদানমাত্র কিন্তু প্রত্যক্ষণ হ'ল কোন জিনিস সম্বন্ধে জ্ঞান।

(৩) সংবেদন হ'ল কোন জিনিসের গুণবিশেষের চেতনা, আর প্রত্যক্ষণ হ'ল বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে চেতনা।

(৪) সংবেদনের সময় মন কম সক্রিয় থাকে কিন্তু প্রত্যক্ষণের সময় এই সক্রিয়তা অনেকখানি বেড়ে যায়।

(৫) সংবেদন কেবলমাত্র বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত। প্রত্যক্ষণ কেবলমাত্র বর্তমান নয় অতীত অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগায়।

(৬) সংবেদনের সাহায্যে আমরা কোন জিনিসের পূর্ণরূপ পাই না, কিন্তু প্রত্যক্ষণের সাহায্যে পূর্ণরূপ পাই।

(৭) সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ উভয়েই দৈহিক প্রক্রিয়া হলেও দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দৈহিক পার্থক্য আছে।

(৮) সংবেদনের কাজ হ'ল জ্ঞানের উপাদান সংগ্রহ করা ও প্রত্যক্ষণের কাজ হ'ল সেই উপাদানগুলিকে অর্থপূর্ণ করা।

(৯) সংবেদনের মধ্যে কল্পনা করার সুযোগ আছে কিন্তু প্রত্যক্ষণ হ'ল একান্তভাবে বাস্তব।

স্থান ও কালের প্রত্যক্ষণ (Preception of Space and Time)।

স্থান ও কাল দুটিই বিমূর্ত জিনিস—কাজেই এ দুটি কেমন করে প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তু হোতে পারে একথা ভাবলে একটু ধাঁধা লাগে।

শিশু জন্মের পর থেকে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানের ধারণা করে। সংবেদনের ব্যাপ্তি থেকে স্থানের ধারণা হয় যেমন একটা সরলরেখা যখন দেখি তখন পাশাপাশি অবস্থিত কতগুলি বিন্দু দেখি, এর সঙ্গে থাকে অঙ্গ সঞ্চালনের গতি যেমন দৃষ্টি ক্রমশঃ প্রসারিত হয়।

আবার একটা সংবেদনের স্থায়িত্ব থেকেই আমাদের সময়ের জ্ঞান জন্মায়। যে সংবেদন কিছুক্ষণ আগে ছিল এখন নেই, তাকে বলি অতীত, যে সংবেদন এখনও আছে তাকে বলি বর্তমান, সেই রকম যে সংবেদন কিছুক্ষণ পরে ঘটবে তাকে বলি ভবিষ্যত।

এখন দেখব একটা জিনিসের ঘনত্ব (dimension), দূরত্ব আমরা কেমন করে প্রত্যক্ষ করি? ঘনত্ব প্রত্যক্ষণের জন্ত একচক্ষুমূলক ও দ্বিচক্ষুমূলক কারণ থাকে।

(ক) একটা জিনিস কত বড় হয় এটা যদি আমাদের জানা থাকে তবে তার থেকে ছোট দেখালে আমরা আন্দাজ করতে পারি জিনিসটা দূরে আছে। (খ) কোন জিনিসের খানিকটা অংশ যদি আড়ালে থাকে তবে বোঝা যায় সেটি দূরে আছে। (গ) দুটো সমান্তরাল রেখা দূরে গেলেই একটা রেখা হয়ে যায়। (ঘ) কোন জিনিস অস্পষ্ট দেখালে বুঝতে হবে দূরে আছে। (ঙ) কোন জিনিষের উপরে আলোছায়ার খেলা দেখে বোঝা যায় জিনিসটা দূরে না কাছে। (চ) যখন আমরা গাড়ী চড়ে খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই তখন দেখি পাশের গাছপালাগুলো উল্টোদিকে ছুটছে কিন্তু অনেক দূরের পাশের গাছপালা, পাহাড় পর্বত আমাদের সঙ্গে একই দিকে ছুটছে। (ছ) কাছের জিনিস হ'লে এক সঙ্গে কম সংখ্যক বিভিন্ন প্রকারের জিনিস প্রত্যক্ষণ করা যায় কিন্তু দূরের জিনিসের বেলায় এই সংখ্যা অনেক গু. বেশী হয়। (জ) কাছের জিনিস দেখার সময় চোখের লেন্সটা গোলাকার হয়ে যায় আর দূরের জিনিস দেখার সময় এটি সমতল হয়ে পড়ে।

দ্বিচক্ষুমূলক কারণ—(ক) কেন্দ্রীভবণ—কোন জিনিষকে ভাল করে দেখতে হলে দু চোখের ফোভিয়ার সমরেখায় দেখতে হবে। (খ) চোখে একটা জিনিসের যখন দুটো প্রতিচ্ছবি পড়ে তখন তারা একেবারে এক নয় বলে আলাদাভাবে থাকার ফলে ঘনত্ব চোখে পড়ে।

ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ ও অলীক প্রত্যক্ষণ (Illusion & Hallucination)।

বস্তুর প্রত্যক্ষণ আমাদের সব সময় সঠিক হয় না। এই ভুল দেখাকে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ (illusion) বলা হয়। এই ভুল দেখাটা ব্যক্তিগত হোতে পারে আবার সার্বজনীনও হতে পারে। একটা জিনিসের সঙ্গে আর একটা জিনিসের মিল থাকলে ব্যক্তিগত ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণের সম্ভাবনা থাকে। যেমন অন্ধকারে একটা দড়িকে সাপ ভেবে ভয় পাওয়া।

কিন্তু একটা জিনিসকে সবাই যখন ভুল প্রত্যক্ষ করে তখন তাকে সার্বজনীন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বলা হয়। যেমন একই মাপের দুটি ঘর—প্রথমটার জানালা ভিতরে ও দ্বিতীয়টির জানালা বাইরে। কিন্তু কোনটা ছোট বা বড় জিজ্ঞাসা করলে সবাই বলবে প্রথমটা ছোট দ্বিতীয়টা বড়। এই ভুল দেখাটা সার্বজনীন। চক্ষু সঞ্চালন, মানসিক অবস্থা ও সামগ্রিকতার জন্যই সবাই ভুল দেখে।

অলীক প্রত্যক্ষণের বেলায় কোন জিনিসের বাস্তব অস্তিত্ব থাকে না কিন্তু কল্পনায় তা মূর্ত হয়ে উঠে; একেই ইংরেজীতে Hallucination বলে। সেক্সপীয়ারের লেডী ম্যাকবেথের হাতে রক্ত নেই, তবুও তিনি রক্ত ধুয়ে ফেলার জন্ম বার বার হাত ধুতে চাইছেন। রক্তের গন্ধ তার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছে। তিনি বলছেন—"All the perfumes of Arabia will not sweeten this empty little hand." নানাপ্রকার আকাঙ্খা, গভীর চিন্তা, দেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থার জন্য এই অলীক প্রত্যক্ষণ ঘটে।

সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের শিক্ষাগত মূল্য নিতান্ত কম নয়। এই দুটি শিশুর জ্ঞানের প্রাথমিক সোপান। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এগুলি শিখনের ক্ষেত্রে স্থান পেয়েছে। বর্তমানের শিক্ষকদের কর্তব্য হওয়া উচিত ইন্দ্রিয়-মাধ্যম জ্ঞানগুলির উন্নতি সাধন করা।

প্রশ্নাবলী

1. Mention the different classifications of Sensation. Discuss the attributes of Sensation.

2. Distinguish between Sensation and Perception, Illusion and Hallucination.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কল্পনা—(Imagination)

কল্পনা এক জাতীয় মানসিক প্রক্রিয়া। কেমন করে? সমগ্র বিশ্ব চরাচর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয় সংবেদনের মাধ্যমে। কোন উদ্দীপকের সামনে আমরা সাড়া দিলে সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ হয়—এর ফলে মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে। কোন জিনিস দেখাটা যখন অর্থপূর্ণ হয় তখন জিনিসটা সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা জন্মায়; এই ধারণাটা কিন্তু নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে না। কোন দিন নির্জনে বসলে হয়তো চোখের সামনে সেই জিনিসের ছবি ভেসে উঠবে। এই ছবি কেবল যে চোখে দেখলে তবে ভেসে উঠবে এমন কথা বলা যায় না—অন্য ইন্দ্রিয়কে কেন্দ্র করেও এই ছবি হ'তে পারে তবে তা সংখ্যায় বেশ কম। অতীতের কোন ঘটনার ছবি যখন মানসিক ক্রিয়ার ফলে আমাদের মনে ভেসে ওঠে তখন আমরা তাকে ভাবমূর্তি বা প্রতিরূপ (Image) বলি। এই প্রতিরূপগুলোকে সংযুক্ত বা বিযুক্ত করে যে মানসিক চিত্র মনের সামনে তুলে ধরা হয় তাকেই কল্পনা বলা হয়। কল্প বা প্রতিরূপের সাহায্যে যে জ্ঞান হয় তাই কল্পনা। আমরা যখন সোনার পাহাড় কল্পনা করি তখন কিন্তু আমরা কেবলমাত্র অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ সংযুক্ত করেই ক্ষান্ত হচ্ছি না। তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু করছি। আগে আমরা সোনা দেখেছি, পাহাড় সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা আছে। সেক্ষেত্রে আমরা সোনাগুলোকে যখন পাথরের মত করে মনে মনে সাজালাম—(এই ধারণাটা অতীতে ছিল না) তখন নতুন কিছু করলাম; কাজেই কল্পনাকে সব সময় অতীত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি বলা যায় না।

কল্পনা অনেকটা সৃষ্টিধর্মী (creative)। ঠিক যেমনটি আমরা দেখি তেমনটি আমাদের মনে উদয় হয় না। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার প্রতিরূপকে নানাভাবে সাজায় কল্পনা।

"Imagination is a device for attaining unattainable goals." —Murphy.

"Imagination is the thinking of remote objects." —Mc Dougall.

"Clear insight into the remote, the absent, the obscure is its aim."

—Dewey.

কল্পনার বৈশিষ্ট্য—কল্পনার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো তাকে অন্যান্য মানসিক ক্রিয়া থেকে আলাদা করেছে। যেমন—(১) কল্পনা অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। (২) কল্পনা সক্রিয় মানসিক প্রক্রিয়া। (৩) অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে মালমশলা সংগ্রহ করলেও এগুলোকে নতুন ভাবে সাজিয়ে নেয় কল্পনা। (৪) কল্পনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আছে কিন্তু সে স্বাধীনতা অবাধ নয়। (৫) প্রত্যক্ষণের সঙ্গে কল্পনার যোগসূত্র আছে। (৬) স্মৃতিশক্তি কল্পনাকে অনেকটা প্রভাবিত করতে পারে।

কল্পনার শ্রেণীবিভাগ—কল্পনা নানা রকমের হ'তে পারে। ইচ্ছা, মৌলিকতা, উদ্দেশ্য ও বিশ্বাস—এই চারটি বিষয়কে কেন্দ্র করে কল্পনা গড়ে ওঠে। কল্পনার ভাগগুলি হ'ল—

(ক) **নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় কল্পনা** (Passive and Active Imagination)—কল্পনা সাধারণভাবে ইচ্ছাশক্তির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। কিন্তু ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ছাড়া কল্পনা যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা দেয় তখন তাকে নিষ্ক্রিয় কল্পনা বলা হয়। এ সময় প্রতিরূপগুলো আপনা থেকেই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক নতুন ছবির সৃষ্টি করে। আমাদের জীবনে অলস মুহূর্তে কত অলীক কল্পনা আমরা করি। প্রতিভাবান মানুষের কল্পনাও স্বতঃস্ফূর্ত, তবে, তাঁদের বেলায় নিষ্ক্রিয় কল্পনার সাথে সক্রিয় কল্পনাও মিশে যায়। শিশুদের কল্পনার ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় কল্পনা বেশী পরিমাণে থাকে।

সক্রিয় কল্পনার বেলায় দেখা যায়—এটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হ'য়ে ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান নিয়ে নতুনভাবে সাজিয়ে এক নতুন ছবি মনের সামনে তুলে ধরে।

(খ) **সৃজনশীল ও গ্রহণক্ষম কল্পনা** (Creative and Receptive Imagination)—মৌলিকতার ভিত্তিতে কল্পনাকে সৃজনশীল ও গ্রহণক্ষম কল্পনা এই দুইভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হ'য়ে থাকে। মৌলিক কল্পনার ক্ষেত্রে যে প্রতিরূপগুলো সৃষ্টি করা হয় সেগুলো কারও কাছ থেকে পাওয়া নয়, সম্পূর্ণ নিজস্ব, অর্থাৎ যখন কেউ নিজের মন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে, নতুন কোন মানসিক চিত্র কল্পনা করে তখন কল্পনাকে বলা হয় সৃজনশীল কল্পনা। যেমন কবি, লেখক, নাট্যকার ইত্যাদির কল্পনা প্রধানতঃ সৃজনশীল ও মৌলিক কল্পনা। মেঘদূত কাব্য কবি কালিদাসের মৌলিক সৃজনশীল কল্পনার অপূর্ব উদাহরণ।

আবার যখন আমরা নিজের মন থেকে উপাদান সংগ্রহ না করে অন্যের কাল্পনিক চিত্রকে নিজেদের মনে প্রতিফলিত করি তখন সে কল্পনাকে গ্রহণক্ষম কল্পনা বলি। মেঘদূত পড়তে পড়তে কখন যেন আমরা বিরহী যক্ষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই—কালিদাসের কল্পনা ও আমাদের কল্পনা মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

(গ) বুদ্ধিবিষয়ক, সৌন্দর্যবিষয়ক ও ব্যবহারিক কল্পনা (Intellectual, Aesthetic and Practical Imagination)—বুদ্ধিবিষয়ক কল্পনা—কোন জিনিষের গূঢ় অর্থ বুঝবার জন্য যখন কল্পনা বুদ্ধিকে সাহায্য করে অর্থাৎ সত্যের সন্ধানে ও জ্ঞানের অগ্রগতিতে কল্পনা যখন বুদ্ধির সাথী হয় তখনই তাকে বুদ্ধিবিষয়ক কল্পনা বলা হয়। যে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে মানসিক প্রক্রিয়া কল্পনা স্তরে থাকে, তারপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যেমন প্রথমে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু কল্পনা করেন গাছের অনুভূতি আছে, প্রাণ আছে—এর পর তিনি এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করেন, প্রমাণ করেন।

সৌন্দর্যবিষয়ক কল্পনা—কোন সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করার জন্য আমাদের মানসিক চেতনা কল্পনাকে আশ্রয় করে। এই কল্পনা সৃজনশীল বা গ্রহণক্ষম যে কোনরকম হ'তে পারে। ভাস্কর বা চিত্রশিল্পী যখন নতুন কিছু সৃষ্টির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তখন এই চিন্তার মধ্যে তাঁর মৌলিক চিন্তাও থাকতে পারে আবার অন্যের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিতও তিনি হ'তে পারেন। কিন্তু আমাদের কল্পনা যখন সুন্দর জিনিষের রসোপলব্ধি করতে থাকে তখন সেটি হোল গ্রহণক্ষম কল্পনা।

ব্যবহারিক কল্পনা—আমাদের যে কল্পনা ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সফল করে তাকেই ব্যবহারিক কল্পনা বলা হয়। যেমন ইঞ্জিনিয়ার যখন কোন বাড়ী করার জন্য পরিকল্পনা করেন।

(ঘ) বিশ্বাসযুক্ত ও বিশ্বাসহীন কল্পনা (Imagination with Belief and Imagination without Belief)—যদি কল্পিত বস্তুর উপর আমাদের বিশ্বাস থাকে তবে সেই কল্পনাকে আমরা বিশ্বাসযুক্ত কল্পনা বলতে পারি। যেমন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, অনু পরমাণুর অস্তিত্বে বিশ্বাস ইত্যাদি।

আর যে কল্পনা একেবারে অলীক, অবাস্তব তার উপর আমাদের বিশ্বাস টলে যায়। রূপকথার গল্প শুনতে শুনতে আমাদের মন যখন কল্পনার পাখা

মেলে রূপকথার রাজ্যে বিচরণ করে তখন সেই কল্পনায় আমাদের বিশ্বাস থাকে না।

কল্পনার সঙ্গে স্মৃতির সম্বন্ধ (Relation of Imagination to Memory)।

অতীত অভিজ্ঞতার যথাযথ পুনরুদ্রেক ঘটলে তাকে স্মৃতি বলা হয়। আর অতীত অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিরূপগুলোকে নতুন করে সাজিয়ে যে মানসিক চিত্র গঠন করা হয় তাকে আমরা কল্পনা বলি।

স্মৃতি ও কল্পনার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। দুটির মধ্যে কিছু সাদৃশ্য যেমন আছে কিছু বৈসাদৃশ্যও একেবারে যে নেই এমন নয়।

স্মৃতি ও কল্পনার সাদৃশ্য—স্মৃতি ও কল্পনা উভয়েই অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। কল্পনা অনেক সময় দেখা যায় স্মৃতির উপর নির্ভরশীল। তবে যে জিনিস সম্বন্ধে কোনরকম অভিজ্ঞতা থাকে না, সে জিনিস সম্বন্ধে কল্পনা করা একটু কষ্টকর। যেমন জন্মান্ধ মানুষের রঙ সম্বন্ধে ধারণা নেই—সেখানে রঙের কল্পনা প্রায় অসম্ভব।

কল্পনা ও স্মৃতির চিন্তার মূলনীতি প্রায় একরকম। উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের অভিজ্ঞতা কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ থাকে। দুই ক্ষেত্রেই আমরা বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ করার সময় স্থান, কাল, পাত্র ও গুণের ভিত্তিতে বিচার করে তবেই প্রত্যক্ষ করি।

বৈসাদৃশ্য—স্মৃতি হোল অতীত অভিজ্ঞতার হুবহু এক প্রতিচ্ছবি, কিন্তু কল্পনার বেলায় অতীত বিষয়গুলির পুনর্বিন্যাস দেখা যায়।

স্মৃতির ক্ষেত্রে দেখা যায় যা মনে ভেসে ওঠে তাকে চিনে নিতে হয় কিন্তু কল্পনার ক্ষেত্রে এরকম কোন সুযোগ নেই।

স্মৃতির সবটাই প্রায় অতীত ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর কল্পনা অনেকটা মুক্ত ও স্বাধীন।

স্মৃতি ও কল্পনা উভয়েই অতীত ঘটনার প্রতিরূপের উপর নির্ভরশীল। তবে স্মৃতির প্রতিরূপ পরিবর্তনশীল কিন্তু কল্পনার প্রতিরূপ হ'ল স্থির।

স্মৃতি ও কল্পনার সংমিশ্রণ—আমাদের মানসিক জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্মৃতি ও কল্পনা মিশে গেছে। একই ঘটনা দেখে কয়েকজনকে পুনরাবৃত্তি করতে বললে দেখা যায়—প্রত্যেকের বর্ণনা বেশ কিছু কিছু আলাদা হয়ে গেছে। এতেই বোঝা যায় স্মৃতি ও কল্পনা মিশে একাকার হয়ে যায়।

প্রতিরূপ (Image)—এখন আমরা দেখব প্রতিরূপ কাকে বলে। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর মানস প্রতিচ্ছবিকেই আমরা প্রতিরূপ বলে থাকি। সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের জাগতিক বস্তু সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মায়, এবং এটা আমাদের মনে সঞ্চিত থাকে। যখন প্রয়োজন হয় এই ধারণার প্রতিচ্ছবি আমাদের মনে ভেসে ওঠে—একেই প্রতিরূপ বলা হয়ে থাকে।

প্রতিরূপ ও ধারণা—প্রতিরূপ ও ধারণার মধ্যে মিল থাকলেও পার্থক্য আছে যথেষ্ট। সংবেদন যেমন অর্থপূর্ণ হলে প্রত্যক্ষণ হয় তেমনি প্রতিরূপ অর্থপূর্ণ হলে তবে ধারণা জন্মায়।

বস্তুর প্রত্যক্ষরূপ থেকে প্রতিরূপে রূপান্তর (Transition from Percept to Image)

যখন কোন জিনিস আমাদের ইন্দ্রিয়ের সামনে থাকে তখন সেই বস্তুর সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ হয়। কিন্তু সেই বস্তুটিকে সরিয়ে নিলে প্রত্যক্ষণ বন্ধ হয়ে যায়। তবু তার প্রত্যক্ষরূপ আমাদের চেতনায় ভেসে ওঠে—এটাই তখন প্রত্যক্ষ থেকে প্রতিরূপে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তখন বস্তুটির প্রতিরূপ সহজে আমাদের চেতনায় আসে না। তখন স্মৃতির সাহায্যে প্রতিরূপকে চেতনায় আনতে হয়—একে বলা হয় স্মৃতি-প্রতিরূপ (Memory Image).

প্রতিরূপের প্রকার ভেদ (Types of Imagery)

(ক) **ইন্দ্রিয়গত প্রতিরূপ** (Sensual Image)—আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা পাঁচরকমের সংবেদন গ্রহণ করি। কাজেই ইন্দ্রিয়গত প্রতিরূপও হবে এই পাঁচরকমের। আমরা চোখ দিয়ে সুন্দর ফুল দেখলাম তারপর কল্পনায় সেই ফুলের প্রতিচ্ছবি চোখের সামনে তুলে ধরলাম। এটা হল দর্শনগত প্রতিরূপ। একটা ভাল গান শোনার পর ঐ সুর যখন আবার কল্পনায়ও শুনি তখন হয় শ্রবণগত প্রতিরূপ। জিভ দিয়ে আচারের স্বাদ গ্রহণের পর কল্পনায় সেই স্বাদ আবার যখন আস্বাদন করি তখন তাকে বলি স্বাদগত প্রতিরূপ। ফুলের মিষ্টি গন্ধ নাক দিয়ে শুঁকে পরে কল্পনায় সেই গন্ধ পেলে তাকে ঘ্রাণগত প্রতিরূপ বলা হয়। কোন সময় হয়তো দেহে আঘাত লেগেছিল—সেই বেদনাবোধ আবার কল্পনায় জাগ্রত হলে তাকে স্পর্শগত প্রতিরূপ বলে।

(খ) **উত্তর-প্রতিরূপ** (After Image)—উদ্দীপক ছাড়া অনেক সময় সংবেদন হয়—তার থেকে কল্পনায় যে প্রতিরূপ তৈরী হয় তাকে উত্তর-প্রতিরূপ বলে। এই প্রতিরূপ আবার দু রকমের হ'তে পারে—(১) সবর্ণ উত্তর-প্রতিরূপ ও (২) অসবর্ণ উত্তর-প্রতিরূপ।

(১) ভোরবেলার সূর্যের দিকে কিছুক্ষণ তাকাবার পর যদি ঘরের সাদা দেওয়ালের দিকে তাকান যায় তাহলে জলজ্বলে সূর্যের প্রতিরূপ চোখের সামনে ভেসে উঠবে। এটা হ'ল সবর্ণ উত্তর-প্রতিরূপ।

(২) অসবর্ণ উত্তর-প্রতিরূপ হ'ল, যখন কোন জিনিসের সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের পর তার বিপরীত প্রতিরূপ চোখের সামনে ভাসে। যেমন একটুকরো লাল কাগজ দেখার পর যদি সাদা দেওয়ালের দিকে তাকান যায় তবে দেওয়ালে সবুজ রঙের সমান মাপের প্রতিরূপ দেখা যায়।

(গ) **পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ** (Recurrent Image)—প্রত্যক্ষ জিনিস অপসারিত হওয়ার পরও যদি তার প্রতিরূপ বার বার মানসচোখে ভেসে ওঠে তবে তাকে পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ বলা হয়। যেমন আমরা কোন প্রিয়জনকে বিদায় জানানর পর তার মুখের ছবি বার বার আমাদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ ও স্মৃতি প্রতিরূপ কিন্তু এক জিনিস নয়। সময়ের ব্যবধানে পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ লুপ্ত হয়ে যায় কিন্তু দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও স্মৃতি প্রতিরূপ প্রায় একইভাবে থাকে।

উত্তর-প্রতিরূপ ও পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের মধ্যেও পার্থক্য আছে। উত্তর-প্রতিরূপ অবিরাম ও পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ সবিরামভাবে চলতে থাকে।

(ঘ) **প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপ** (Primary Memory Image)—কখনও কখনও স্মৃতি-প্রতিরূপ প্রায় প্রত্যক্ষিত জিনিসের মত স্পষ্ট ও সজীব হয়ে ওঠে। তখন সেই প্রতিরূপকে স্মরণ করার জন্য কোন ইচ্ছাকৃত চেষ্টার প্রয়োজন হয় না—এইরকম প্রতিরূপকেই প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপ বলা হয়। যেমন দুটো জিনিসের ওজন তুলনা করার সময় জিনিস দুটি হাতে নেওয়ার পর, রেখে দিলে তাদের প্রতিরূপ খুব সহজে ভেসে ওঠে।

(ঙ) **যথার্থ স্মৃতি-প্রতিরূপ** (Memory Image Proper)—কোন জিনিসকে যথাযথভাবে প্রত্যক্ষ করার পর তার প্রতিরূপ যখন স্মৃতির সাহায্যে মানসচোখে তুলে ধরা হয় তখন তাকে যথার্থ স্মৃতি-প্রতিরূপ বলা হয়। যে বন্ধু

অনেক দূরে আছে তার কথা চিন্তা করতে গেলে তার মুখের ছবি স্মরণপথে এসে চোখের সামনে ভাসে—এটাই হোল যথার্থ স্মৃতি-প্রতিরূপ।

(চ) **ভাব-প্রতিরূপ** (Eidetic Image)—ভাব প্রতিরূপ হচ্ছে এমন একটা দৃষ্টি সম্পর্কিত প্রতিরূপ যাকে বাস্তব প্রত্যক্ষ থেকে প্রায় আলাদা করাই যায় না। কিশোর কিশোরীদের মনে এইরূপ প্রতিরূপের প্রভাব বেশী দেখা যায়। ১২/১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের একটা ছবির দিকে খুব ভাল করে তাকাতে বলা হোল ; তারপর সাদা পর্দার দিকে তাদের দৃষ্টি ফেরাতে বললে দেখা যাবে তারা ছবিটার হুবহু বর্ণনা দিচ্ছে—সাদা পর্দার ছবিটা যেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এই রকম প্রতিরূপই হোল ভাব-প্রতিরূপ।

স্বপ্ন (Dream)

সচেতন জাগ্রত অবস্থা ও গভীর অচেতন নিদ্রিত অবস্থার মাঝামাঝি স্তরে প্রত্যক্ষের স্পষ্টতা ও বাস্তবতা নিয়ে যে নিষ্ক্রিয় কল্পনার উদয় হয় তাকেই আমরা স্বপ্ন বলি। স্বপ্নে আমরা একেবারে জেগে আছি—এমন কথা যেমন বলা যায় না, তেমনি একেবারে অচেতন হয়ে আছি একথাও বলা কঠিন। আসলে স্বপ্ন হ'ল নিদ্রাকালীন চেতন অবস্থা। স্বপ্নের মধ্যে অধ্যাস (Illusion) ও অমূল প্রত্যক্ষণের (Hallucination) এর সংযোগ ঘটে।

যদিও আমরা প্রত্যেকেই স্বপ্ন দেখি তবুও স্বপ্নের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। স্বপ্নের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ করে আমরা এর স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করতে পারি—

(১) আমরা যখন ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি তখন কতকগুলো প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ করি। এই প্রতিরূপগুলো খুব সহজভাবে মনের সচেতন স্তরে আসে। এর জন্য কোন পরিশ্রম করার দরকার হয় না। আমরা যখন স্বপ্ন দেখি তখন আমাদের মন থেকে ইচ্ছা, বিচারশক্তি ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে যায় ; প্রতিরূপগুলো অতি সহজে একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে যায়।

(২) ঘুমের মধ্যে বিচারশক্তি খুব শিথিল হ'য়ে পড়ে তাই প্রতিরূপগুলো পরস্পর সংযুক্ত হয়ে এক উদ্ভট আকারপ পরিগ্রহ করে। যেমন অনেকে স্বপ্ন দেখে কোন মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছে, বাতাসে উড়ছে, কেউ তাড়া করছে এবং সে দৌড়বার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না, কোন ভয়ঙ্কর জিনিস দেখে চীৎকার করতে চাইছে, কিন্তু পারছে না ইত্যাদি।

(৩) স্বপ্নে আমরা যে প্রতিরূপগুলো দেখি সেগুলো তখনকার মত আমরা বিশ্বাস করি। যতক্ষণ না আমাদের ঘুম ভেঙে যায়, বিচারশক্তি সক্রিয় হয় ততক্ষণ স্বপ্নের বিষয়বস্তু আমাদের মিথ্যা বা অবাস্তব বলে মনে হয় না।

(৪) স্বপ্নের প্রতিরূপগুলো এত স্পষ্ট ও সজীব হয় যে সেগুলোকে অনেক সময় প্রত্যক্ষরূপ (Percepts) বলে মনে করা হয়, অবাস্তব বলে মনেই হয় না। এর কারণ কি? (ক) স্বপ্নের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষণ হয় না, ফলে প্রতিরূপগুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে সেগুলোকে সজীব মনে হয়। (খ) তাছাড়া স্বপ্নের প্রতিরূপ ও বাস্তব জগতের প্রতিরূপের মধ্যে তুলনা করা যায় না বলে কাল্পনিক প্রতিরূপগুলোকে বাস্তব বলে মনে হয়।

স্বপ্নের কারণ—এখন আমরা দেখব স্বপ্নের কারণ কি?

(১) কখনও কখনও কোন উদ্ভট স্বপ্নের কারণ হিসেবে কোন উদ্দীপকের অস্তিত্ব আমরা খুঁজে পাই। যেমন কেউ হয়তো স্বপ্ন দেখল তাকে গিলোটিন করা হচ্ছে—ঘুম ভাঙলে দেখা গেল খাটের ষ্ট্যাণ্ড তার গলার উপর পড়েছে। আবার কেউ বা স্বপ্ন দেখল খুব স্নান করছে—পরে দেখা গেল জানালা দিয়ে বৃষ্টির জল এসে তার বালিশ ভিজিয়ে দিয়েছে। ঘুমন্ত অবস্থায় কারুর চোখে আলো পড়েছে—সে স্বপ্ন দেখল ঘরে আগুন লেগেছে।

(২) অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার স্বপ্নের কারণ হিসাবে শরীরতত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দেন। তাঁরা বলেন, হজমের গোলমাল, শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন, রক্তচলাচল বাধা পেলে অনেক সময় মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখে। বুকের উপর হাত রেখে ঘুমোলে শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধা হয়। তখন হয়তো কেউ স্বপ্ন দেখে অতিকায় বীভৎস মূর্তি তাকে তাড়া করছে।

(৩) চিন্তা, অবদমিত ইচ্ছা, আবেগ প্রভৃতিও স্বপ্নের কারণ হ'তে পারে। ঘুমবার আগে যার সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করা হয় তাকে অনেক সময় স্বপ্নে দেখা যায়। একজন স্বপ্ন দেখল যে তার বাবা মারা গেছেন, আর ডাক্তার-বদ্যি, আত্মীয়-স্বজন সবাই এসেছেন। এটা বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে যে —ঐ ডাক্তার, বদ্যি ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সে কাউকে মনে মনে ভালবাসে—কিন্তু সাধারণভাবে তার সঙ্গে দেখার কোন সুযোগ নেই—তাই বাবার মৃত্যুকে উপলক্ষ করে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। জেগে থাকা অবস্থায় যে সব কামনা বাসনা অপূর্ণ থাকে সেগুলো স্বপ্নে পূর্ণতা প্রাপ্ত করে।

সমালোচনা—স্বপ্ন এমনই রহস্যজনক যে এক ব্যাখ্যা সব স্বপ্নকে

বিশ্লেষণ করতে পারে না। একই ধরনের উদ্দীপক বিভিন্ন জনের মধ্যে বিভিন্ন স্বপ্নের সৃষ্টি করে। এতে বোঝা যায় প্রত্যেক ব্যক্তির মানসিক অবস্থাও স্বপ্নের বিভিন্নতার জন্য দায়ী।

স্বপ্ন সম্বন্ধে ফ্রয়েডের ধারণা—মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁর "The Interpretation of Dreams" বইতে স্বপ্ন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন আমাদের অতৃপ্ত কামনা-বাসনাই স্বপ্নে পরিতৃপ্তি খোঁজে। বাস্তব জীবনে যে ইচ্ছাগুলো পূরণ হতে পারে না সেগুলোই স্বপ্নের মধ্যে পূরণ হয়।

ফ্রয়েড স্বপ্নকে—শিশুদের স্বপ্ন ও বয়স্কদের স্বপ্ন—এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

শিশুদের মনে নানারকম ইচ্ছা জাগে—সব ইচ্ছাই তার বাস্তবে পূরণ হয় না—কিন্তু তাই বলে সেই ইচ্ছাগুলোকে সে তার অবচেতন মনে সঞ্চয় করে রাখে না—এগুলো তার সজ্ঞান (conscious) মনের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে তারই আশে পাশেই থাকে। এই অপূর্ণ ইচ্ছাগুলো ঘুমের মধ্যে চেতনার স্তরে উঠে আসে—এখানে ইচ্ছাগুলো বিশেষ ছদ্মবেশে আসে না।

বয়স্ক মানুষের স্বপ্ন কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। পরিণত বয়সে মানুষের মনে এমন অনেক কামনা বাসনা থাকে যেগুলো সমাজ অনুমোদিত বাঞ্ছিত পথে পূরণ হওয়া অসম্ভব। কাজেই সেরকম কামনা বাসনাগুলোকে সে অবদমন করতে বাধ্য হয় অর্থাৎ ঐ ইচ্ছাগুলোকে সে চেতন (conscious) মন থেকে সরিয়ে দেয়। তাহলেই কিন্তু ইচ্ছাগুলো মন থেকে একেবারে মুছে যায় না; তারা গিয়ে মনের অবচেতন (Sub-conscious) ও নির্জ্ঞান (Un-conscious) স্তরে আশ্রয় নেয় ও সেখান থেকে সজ্ঞান মনের স্তরে উঠে কেবলই পরিতৃপ্তির উপায় খুঁজতে থাকে।

বয়স্ক ব্যক্তিদের জাগ্রত অবস্থায় নীতিবুদ্ধি বিবেক ইত্যাদি কড়া প্রহরী থাকে, ফলে বিবেকের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে অবদমিত কামনা বাসনাগুলো চেতন মনে উঠে আসতে পারে না; কিন্তু ঘুমের মধ্যে এই প্রহরীদের সতর্ক দৃষ্টি খানিকটা শিথিল হয়ে যায়, ফলে এইসময় তারা সরাসরি চেতন মনে উঠে এসে স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে পরিতৃপ্তি খোঁজে। বাবা হয়তো ছেলেকে খুব শাসন করেন কিন্তু ছেলের তা পছন্দ হয় না; সে তখন মনে মনে বাবার মৃত্যুকামনা করে—কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় এই কামনাকে সে মনে স্থান দিতে চায় না—নিজের কাছেই নিজেকে অপরাধী মনে হয়। তখন একদিন সে স্বপ্ন দেখল যে তার বাবা মারা গেছেন, সে নানান দায়িত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে

দৌড়াদৌড়িও করছে ; তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তার অবদমিত ইচ্ছা সরাসরি পরিতৃপ্ত হচ্ছে (Direct fulfilment of repressed wishes)।

কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের অসামাজিক কামনা বাসনাগুলি সর্বদা সরাসরিভাবে পরিতৃপ্ত হয় না। কারণ নীতি ও বিবেকের সতর্কদৃষ্টি কিছুটা ঘুমের মধ্যে শিথিল হলেও একেবারে শিথিল হয় না। ফলে অবদমিত বাসনাগুলি—যেগুলি মনের নির্জ্ঞান স্তরে আশ্রয় নিয়েছিল সেগুলি সজ্ঞান স্তরে আসার জন্য নানারকম ছদ্মবেশ ধারণ করে। যেমন ঐ ব্যক্তি এখন হয়তো স্বপ্ন দেখল যে অপরিচিত ধনী ব্যক্তির মৃত্যুশয্যার পাশে সে বসে আছে এবং ব্যক্তিটি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দিয়ে গেছেন। এই স্বপ্নটা আপাত দৃষ্টিতে অসংলগ্ন মনে হলেও এটা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবার অব্যক্ত রূপ—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ফ্রয়েডের মতে পরিণত বয়সে কোন ব্যক্তি যে সব কামনা অবদমিত করে সেগুলো যৌন কামনা। স্বপ্নের বিশ্লেষণ করে ফ্রয়েড দেখিয়েছেন যে এর পেছনে কোন না কোন যৌন ইচ্ছার প্রেরণা আছে। এ ছাড়া ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদির মত দৈহিক প্রবৃত্তিও স্বপ্নের মধ্যে চরিতার্থ হয়।

স্বপ্ন নানা কৌশলে ছদ্মবেশ ধারণ করে ; যে সব কৌশল অবলম্বন করে নির্জ্ঞান মনের অবদমিত ইচ্ছা সজ্ঞান মনে প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে একটা হ'ল প্রতীকতা (Symbolism)। ফ্রয়েড প্রতীকের দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন, যেমন বাড়ী মানুষের প্রতীক, রাজারাণী বাবা মায়ের প্রতীক, শিশু ভাইবোনের প্রতীক, জলের দৃশ্য জন্মের প্রতীক ইত্যাদি।

প্রতীক ছাড়াও সংক্ষেপণ (Condensation) অভিক্রান্তি (displacement) নাটকীকরণ (dramatisation) বর্জন (omission) ইত্যাদির মাধ্যমেও স্বপ্নের অব্যক্তরূপ প্রকাশিত হয়।

ফ্রয়েডের মতবাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে অনেক সত্য থাকলেও পুরোপুরি এই মতকে গ্রহণ করা যায় না। যৌন আকাঙ্ক্ষার উপর তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অ্যাড্‌লারের মতে স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কোন ব্যাহত আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তির পূরণ হয়। ইয়ুং বলেন স্বপ্নের মধ্যে ব্যক্তির জীবনের সমস্যা, কখনও অলীক কল্পনা, কখনও অবদমিত ইচ্ছা প্রকাশ পায়। অনেক ইচ্ছাই সম্পূর্ণ নির্দোষ ও তার সঙ্গে যৌন কামনার সংযোগ নেই।

দিবাস্বপ্ন (Reverie or Day Dream)—জেগে জেগেও মানুষ অনেক সময় স্বপ্ন দেখে। অর্থাৎ স্বপ্নের মতো নিষ্ক্রিয় কল্পনা এখানে কাজ করে। দিবা-স্বপ্ন উদ্দেশ্যবিহীন নয়। যে সব কামনা বাসনা ব্যক্তির জীবনে বাস্তবে চরিতার্থ হয় না, সেগুলি বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এক কাল্পনিক জগতে প্রকাশ পেতে চায়। ব্যক্তির গভীর আশা, আকাঙ্ক্ষা ও সুনির্দিষ্ট প্রেরণার সঙ্গে যুক্ত এই দিবাস্বপ্ন। এই দিক থেকে বিচার করলে হয়তো স্বপ্নের সাথে দিবাস্বপ্নের মিল দেখা যাবে। কিন্তু তাই বলে স্বপ্ন ও দিবাস্বপ্ন সম্পূর্ণ এক জিনিস নয়।

স্বপ্ন ও দিবাস্বপ্ন এ দুটির মধ্যে পার্থক্যও আছে। স্বপ্নের প্রতিরূপ সজীব ও স্পষ্ট এবং প্রতিরূপগুলিতে ব্যক্তি বিশ্বাস করে। কিন্তু দিবাস্বপ্নে এগুলি হয় না। দিবাস্বপ্নের নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন—

(১) কোন ব্যক্তির সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক যদি খুব ঘনিষ্ঠ না হয় তবে সে দিবাস্বপ্নের আশ্রয় নেয়। (২) দিবাস্বপ্ন বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আনন্দদায়ক কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে সুখ দুঃখের অনুভূতি থাকে। (৩) দিবাস্বপ্ন ব্যক্তির উন্নতির পক্ষে সহায়ক। (৪) দিবাস্বপ্নের একমাত্র নায়ক স্বপ্নদর্শনকারী ব্যক্তি নিজে।

দিবাস্বপ্ন তিন রকমের হ'তে পারে। (১) স্বপ্নদর্শনকারী নিজেকে নায়কের ভূমিকায় রাখে এবং সবরকমের বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করে দুঃসাহসিক কাজ করার স্বপ্ন দেখে। দিবাস্বপ্নে কল্পনাই প্রধান অংশ গ্রহণ করে। (২) আবার অনেক স্বপ্নদর্শনকারী নিজে দুঃখের মধ্যে আছে—এই কল্পনা করে অন্যের সহানুভূতি আদায় করতে চায়। (৩) স্বপ্নদর্শনকারী কখনও কখনও ভাবে যে দুঃখ কষ্ট কেবল তার জীবনেই আছে, ফলে তার মনে সবসময় চিন্তা ও উদ্বেগ দেখা যায়। এরকম দিবাস্বপ্ন ব্যক্তিজীবনের পক্ষে উপকারী তো নয়ই বরং ক্ষতিকর। কারণ অত্যধিক কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজে না পেলেই কল্পনাকারীর দুঃখ দিগুণ হ'য়ে দেখা দেয়। তার ফলে তার মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়।

1. What is the nature of Imagination? (C. U. 63)

2. What is Imagination? What do you understand by abnormal imagination? Illustrate the different forms of abnormal imagination. (C. U. Hons. 1969)

3. What is Dream? Is Dream a fulfilment of wish? (C. U. 1967)

4. Offer briefly your own view—Is susceptibility to free imagination harmful for mind? (C. U. Hons. 1966)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্মরণ ও বিস্মরণ (Memory & Forgetfulness)।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেক জিনিস প্রত্যক্ষ করি; এদের সবগুলি আমাদের মনে সমানভাবে রেখাপাত করে না। কতকগুলি দেখার পরই আমাদের মন থেকে মুছে যায় কিন্তু কতকগুলি জিনিসের ছবি আমাদের মনের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থেকে যায়, এবং ভবিষ্যতে সুযোগ বুঝে তারা মানসিক আলেখ্য বা প্রতিরূপের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। অতীতের অভিজ্ঞতাকে যতদূর সম্ভব প্রতিরূপের আকারে পুনরুজ্জীবিত করাকে স্মরণ করা বা স্মৃতি বলা হয়।

প্রাচীনকালে মনে করা হত স্মৃতি একটা মানসিক শক্তি, কেউ বা বলতেন স্মৃতি হল অতীত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে রাখার একটা ভাণ্ডার। প্রাচীনপন্থীরা মনে করতেন, মন হল চিন্তা করা, কল্পনা করা, স্মরণ করা, বিচার করা ও মনোযোগ দেওয়া ইত্যাদির সমষ্টিমাত্র। চর্চা করলে এই শক্তিগুলি বাড়ে আর চর্চার অভাবে এগুলো হীনবল হ'য়ে পড়ে। এই মতবাদে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের শক্তিবাদী মনোবিজ্ঞানী (Faculty Psychologists) বলা হয়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বলেন মনের মধ্যে 'আছে সাতটি মৌলিক শক্তি, তাদের মধ্যে স্মৃতি একটা। স্মৃতিকে মনের উপাদান বলা যুক্তিসঙ্গত; কারণ এর কর্মপরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। প্রাচীন শক্তিগুলির কর্ম পরিধি ছিল নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ।

বর্তমান কালে বলা হয় স্মৃতি, অতীত অভিজ্ঞতার অবিকল পুনরুদ্রেক। মনোবিজ্ঞানী স্টাউট বলেছিলেন—"পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে আদর্শভাবে তার পুনরুদ্রেক করার প্রক্রিয়া হল স্মৃতি। আমেরিকান মনো-

---

(1) "Memory is a direct use of what has been learnt," —Woodworth.

(2) "A memory is a new experience determined by the disposition laid down by previous experiences the relation between the two being clearly apprehended." —J. S. Ross.

(3) "Memory is the ideal revival in which the objects of the past experience are re-instated as far as possible in the order and manner of their original occurence." —Stout.

বিজ্ঞানীরা স্মৃতি কথাটার ব্যবহার না ক'রে, শিখন প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে এটিকে ব্যবহার করেছেন। টেলফোর্ড বলেছেন—শিখনের দ্বারা আচরণের পরিবর্তন হয় আর স্মৃতির সাহায্যে আমরা সেই পরিবর্তনকে ধরে রাখতে পারি। ক্লসমিয়ার (Klausmeier)-এর মতে স্মৃতি শিখনের সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু এই মতকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করা যায় না। কারণ সাধারণভাবে দেখা যায় কোন কিছু শেখার পরে আবার যখন সেই কাজ একইভাবে সম্পন্ন করা হয়, তাকে বলা হয় স্মরণ করা।

এখন আমরা দেখব স্মরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে কি কি উপাদান আছে। উপাদানগুলি হল—

(ক) অভিজ্ঞতালাভ ও শিখন (Acquisition & Learning) (খ) ধারণ বা সংরক্ষণ (Retention) (গ) উজ্জীবন বা পুনরুদ্রেক (Recall) (ঘ) চেনা বা প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition)।

(ক) অভিজ্ঞতালাভ ও শিখন (Acquisition & Learning)—স্মৃতির প্রথম স্তরে আছে শিখন। আমরা যা কিছু দেখি শুনি, স্পর্শ করি, আস্বাদ গ্রহন করি ও ঘ্রাণ নিই, তার প্রতিচ্ছবি আমাদের মনের উপর পড়ে। উপযুক্ত উদ্দীপকের সংস্পর্শে এলে এই ছবিগুলি আবার আমাদের মনে ভেসে উঠে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে জিনিস সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন অভিজ্ঞতা নেই অথবা কখনও আমরা শিখিনি সে জিনিসের স্মৃতি সম্ভব নয়। যেমন আমরা যদি হায়দ্রাবাদের নিজামের রাজপ্রাসাদ না দেখে থাকি তবে ঐ প্রাসাদের স্মৃতি সম্ভব হবে না। আমরা যদি অতীতে টাইপ করতে না শিখে থাকি তবে ঐ টাইপ করার স্মৃতি হতে পারে না।

শিখন আবার অনেকগুলি সর্তের উপর নির্ভর করে। যেমন—শিখনের বিষয়বস্তু; বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার, শিক্ষার্থীর বয়স, শিক্ষার্থীর শিক্ষা, প্রেষণা, শিখনের তৃপ্তি ও অতৃপ্তি, শিখনের হার ও গতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ইত্যাদি।

শিখনের যে বিষয়বস্তু অর্থপূর্ণ ও অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত সেই বিষয়টি অর্থহীন বিষয়ের চেয়ে বেশী মনে থাকে। কাজেই শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের পড়াবার সময় অর্থপূর্ণ করে জিনিসটি পরিবেশন করার চেষ্টা করবেন।

---

(4) Memory is the characteristic of living organism, in virtue of which what they experience leaves behind effects which modify future experience and behaviour, in virtue of which they have a history and that history, is regarded in themselves.. —James Drever.

এক একজন শিক্ষার্থী এক একটা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বেশী মনে রাখতে পারে; যেমন কেউ শুনে মনে রাখতে পারে বেশী, আবার কেউ বা দেখে মনে রাখতে পারে বেশী। যে যেভাবে মনে রাখতে পারে তাকে সেভাবে সাহায্য করা শিক্ষকের কাজ। তবে যত বেশী ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন জিনিস শেখার চেষ্টা করা হয় শেখাটা তত তাড়াতাড়ি হয় ও অনেক দিন পর্যন্ত মনে থাকে।

(৩) শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স কত তা আগে জানা উচিত ও সেই মত বিষয়বস্তুর পরিমাণ হওয়া উচিত। ১০—২০ বছর বয়স পর্যন্ত শিখন ক্ষমতা খুব বেশী থাকে। ২০—২৩ বছর পর্যন্ত শিখনের গতি হয় মন্থর। তারপর ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিখন ক্ষমতা আস্তে আস্তে কমতে থাকে। ৪৫ বছরের পর থেকে শিখন ক্ষমতার দ্রুত অবনতি ঘটে।

(৪) প্রেষণা—শিখনের জন্য যদি শিক্ষার্থীর মনে প্রেষণা জাগে তবে শিখন খুব সহজে হয় ও স্মরণ করার পক্ষেও সহজ হয়।

(৫) শিক্ষার্থীর পছন্দ-অপছন্দের উপরও শিখন অনেকখানি নির্ভর করে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানা গেছে যে শিখনের বিষয় আনন্দদায়ক হলে শিখন খুব তাড়াতাড়ি ও সহজ হয়।

(৬) যদি কোন শিক্ষার্থীর নিজের শেখার গতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকে তবে তার শেখাটা ভাল হয়।

(খ) সংরক্ষণ (Retention)—স্মৃতির দ্বিতীয় উপাদান হল সংরক্ষণ। একবার যা শেখা হয়েছে তা মনের মধ্যে ধরে রাখার নামই হল সংরক্ষণ। যখন আমরা কোন জিনিস শিখি তখন তা আমাদের মনের চেতন স্তরে থাকে কিন্তু শেখা হয়ে গেলে তা অবচেতন স্তরে চলে যায়, পরে উত্তেজকের সংস্পর্শে এলে সেই জিনিস আবার মনের মধ্যে ভেসে উঠে।

একবার শেখা জিনিস মনের মধ্যে কিভাবে সংরক্ষিত হয় তার জন্য দুটো মতবাদ আছে—একটি শরীরতত্ত্বমূলক, অপরটি মনস্তত্ত্বমূলক।

শরীরতত্ত্বমূলক মতবাদ—এই মতবাদে বিশ্বাস করেন জেমস্, মিল, কার্পেণ্টার ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানী। তাঁরা বলেন যখন আমরা কোন জিনিস প্রত্যক্ষ করি তখন মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হ'য়ে কাঁপতে থাকে; প্রত্যক্ষণ শেষ হয়ে গেলেও এই কম্পন চলতে থাকে। এই কম্পন যত দ্রুত ও তীব্র হবে স্মৃতিও তত স্পষ্ট হবে।

জেমস্ বলেন অভিজ্ঞতাগুলো মস্তিষ্কের কিছু পরিবর্তন ঘটায় কাজেই এটা দৈহিক প্রক্রিয়া। মূলার বলেন একটা স্মৃতিছাপ (memory trace)। প্রকৃতপক্ষে দেখা যাচ্ছে মস্তিষ্কে যা সংরক্ষিত হয় তা একটা বিশেষ সংগঠন (brain structure)।

মনস্তত্ত্বমূলক মতবাদ—এই মতবাদে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা স্মৃতিকে দৈহিক প্রক্রিয়া বলে মনে করেন না; তাঁরা বলেন এটি একটি মানসিক প্রক্রিয়া। প্রতিরূপগুলোর অবচেতন স্তর থেকে চেতনের স্তরে আত্মপ্রকাশ করাকেই অভিজ্ঞতার স্মরণ বলা হয়; প্রতিরূপগুলো মিশে একটা ছাপজট (engram complex) তৈরী করে। এই ছাপজট প্রথমে এলোমেলো থাকে; মন এগুলোকে ঠিকমত সাজানোর কাজ করে; এরই নাম সংরক্ষণ।

সংরক্ষণ কতকগুলি উপাদানের উপর নির্ভর করে। সাধারণত সুস্থ দেহ, সজীব মস্তিষ্ক, [illegible] মন, আগ্রহ, চিন্তন, তীব্র সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট উদ্দীপক, উদ্দীপকের স্থায়িত্ব, পুনরাবৃত্তি, সাম্প্রতিকতা, মনোযোগ, বিষয়বস্তুর উপলব্ধি, সংরক্ষণের ইচ্ছা ইত্যাদির উপর সংরক্ষণ অনেকখানি নির্ভর করে।

(গ) উজ্জীবন (Recall)—আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষিত প্রতিরূপ ব্যক্ত করার মানসিক ক্রিয়াকে উজ্জীবন বলা হয়। কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন তো অনেক; কোন কিছু স্মরণ করতে হলে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে মাত্র একটাকে বেছে নিতে হয়। কোন একটা উপযুক্ত উদ্দীপকের সংস্পর্শে এসে যখন একটা প্রতিরূপ উজ্জীবিত হয় তখ নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতাটা আমাদের মনের আয়নায় ভেসে উঠে।

মনের এই উজ্জীবন প্রক্রিয়া কতকগুলি সর্তের উপর নির্ভর করে।

(১) সন্নিহিত স্থান ও সময় (Law of Contiguity)—দুটি জিনিষকে আমরা যখন পাশাপাশি দেখি অথবা দুটি ঘটনাকে একসঙ্গে বা পর পর ঘটতে দেখি তখন তাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করে ফেলি। ফলে ভবিষ্যতে একটা জিনিস দেখলে অন্যটার কথা আপনা থেকেই মনে পড়ে। যেমন চেয়ার, টেব্‌ল যদি সব সময় একসঙ্গে থাকে তবে চেয়ার দেখলেই আমাদের টেব্‌লের কথা মনে পড়বে। দুই বন্ধুকে সব সময় একসঙ্গে দেখলে—একজনকে দেখার পর আর একজনের কথা মনে পড়বে।

সাদৃশ্য (Similarity)—অভিজ্ঞতাগুলি একই ধরণের হলে তাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। যেমন একই ধরনের ফুল, একই ধরনের ফল ইত্যাদি।

(৩) বৈপরীত্য (Contrast)—দুটি বিপরীতধর্মী অভিজ্ঞতা হলেও তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠে। অনেক সময় লম্বা লোক দেখলে বেঁটে লোকের কথা মনে হয়।

(৪) আগ্রহ ও মনোযোগ—আমাদের সামনের বস্তুগুলির মধ্যে যে জিনিসের প্রতি আমাদের আগ্রহ বেশী থাকে আমরা সেগুলিতে মনোযোগ দিয়ে থাকি। খবরের কাগজ খুলেই রাজনীতিবিদ্ রাজনীতির খবর দেখেন, খেলোয়াড় খেলার খবর দেখেন, কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা পাত্র-পাত্রীর খবর দেখেন, সিনেমা প্রেমিক সিনেমার খবর দেখেন, সাহিত্যিক সাহিত্যের পৃষ্ঠা দেখেন ইত্যাদি।

এছাড়া আরও কতকগুলি ছোটখাট নিয়ম আছে। যেমন—

(১) প্রাথমিকতা (Primacy)—কোন ব্যক্তির সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনের অভিজ্ঞতা সাধারণতঃ সহজে স্মরণ করা যায়।

(২) সাম্প্রতিকতা (Recency)—যে অভিজ্ঞতা সবেমাত্র সঞ্চিত হয়েছে সেটি স্মরণ করা খুব সহজ। যে চিড়িয়াখানায় গিয়ে সাদা বাঘ সবেমাত্র দেখে এসেছে, তার কাছে সাদা বাঘ স্মরণ করা মোটেই শক্ত নয়।

(৩) পৌনঃপুনিকতা (Frequency)—কোন অভিজ্ঞতা যদি বার বার ঘটে তবে তা সহজে মনে আসে। যে রোজ আসে সে যদি সামনে নাও থাকে তবু তার নাম চট্‌পট্ মনে পড়বে।

(৪) তীব্রতা (Vividness)—কারও যদি কোন প্রচণ্ড দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতা থাকে তবে দুর্ঘটনার কথা বললেই দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতাগুলো সামান্য চেষ্টায় ছবির মত তার মনের পর্দায় ভেসে উঠবে।

এসবের পরেও আমরা বলতে পারি মানসিক প্রস্তুতি, প্রক্ষোভ, অনুরাগ, আগ্রহ ইত্যাদি উজ্জীবনকে অনেকখানি সাহায্য করে।

(ঘ) চেনা (Recognition)—স্মরণ প্রক্রিয়ার শেষ স্তর হোল চেনা। রাস্তায় যেতে যেতে হঠাৎ একজনকে দেখে যখন আমরা থমকে দাঁড়াই—মনের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকি কোথায় যেন দেখেছি—হঠাৎ মনে পড়ে যায় একসঙ্গে পড়েছি—তখন মনের এই কাজটি হোল চেনা।

চেনা কাজটি সহজ হলেও এতে ভুল হয় না এমন কথা বলা যায় না। পরিচিত জন অনেক সময় সামনে দিয়ে চলে গেলে—তারপর আমাদের মনে

পড়ে লোকটি অমুক। আবার আমরা অচেনা লোককেও কখনও কখনও চেনা বলে মনে করে কথা বলতে যাই—গিয়ে দেখি অচেনা।

উত্তম স্মরণশক্তি

আমাদের সকলের স্মরণ ক্ষমতা আছে তবে কমবেশী। কারণ স্মরণ করার ক্ষমতা সকলের সমান নয়। স্মৃতির ও বিস্মৃতির হার অনুযায়ী স্মরণক্ষমতাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন চেরচেরা, চেরবেগা, বেগচেরা, বেগবেগা। চেরচেরা যারা—তারা কোন জিনিস অনেকদিন ধরে শেখে ও অনেকদিন মনে রাখতে পারে। চেরবেগা যারা, তারা অনেকদিন ধরে শেখে কিন্তু বেগে অর্থাৎ তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। বেগচেরা যারা, তারা খুব তাড়াতাড়ি শেখে ও অনেকদিন মনে রাখতে পারে আর বেগবেগা যারা, তারা তাড়াতাড়ি শেখে ও তাড়াতাড়ি ভুলে যায়।

এই চার রকম স্মরণ শক্তির মধ্যে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কোন স্মরণশক্তিটি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। বেগচেরা যারা তারাই উত্তম স্মরণশক্তির অধিকারী ; কারণ তারা তাড়াতাড়ি শেখে ও দেরীতে ভোলে।

এখন আমরা দেখব উত্তম স্মরণশক্তির অন্যান্য লক্ষণ কি :

(ক) **অল্প আয়াসে বিষয় আয়ত্তীকরণ**—যার স্মৃতি খুব প্রখর সে অল্প আয়াসে কোন বিষয় আয়ত্ত করতে পারে। কেউ চার লাইন কবিতা দশ বার পড়ে মুখস্থ করতে পারে আবার কেউ দু বার পড়ে মুখস্থ করতে পারে। দ্বিতীয় জনকে প্রখর স্মৃতির অধিকারী বলা যায়।

(খ) **বিষয়বস্তুর দীর্ঘ স্থায়িত্ব**—কোন জিনিস একবার শিখলেই স্মৃতির কাজ শেষ হয়ে যায় না। চর্চা না করেও দীর্ঘ দিন মনে রাখা দরকার। যে দীর্ঘ দিন কোন অতীত বিষয় মনে রাখতে পারে সে উত্তম স্মৃতির অধিকারী।

(গ) **প্রয়োজন অনুসারে পুনর্জনন**—কেউ যদি মনে করতে চেষ্টা করলে শেখা জিনিসটা খুব তাড়াতাড়ি মনে করতে পারে তবে তার স্মৃতিকে উত্তম স্মৃতি বলা হবে।

(ঘ) **নির্ভুল পুনর্জনন**—শুধু তাড়াতাড়ি মনে করতে পারলেই হবে না, শেখা জিনিসটা নির্ভুলভাবে মনে করতে হবে।

(ঙ) **অপ্রয়োজনীয় জিনিস বিস্মরণ**—কেবলমাত্র স্মরণ করাকেই ভাল স্মৃতি বললে সবটা বলা হয় না। কিছু অপ্রয়োজনীয় জিনিস যদি কেউ ভুলে যেতে পারে তবেই স্মৃতির পাতায় প্রয়োজনীয় জিনিস সংরক্ষণের স্থান প্রশস্ত হবে।

স্মৃতি এক না বহু? (Is there a memory or memories ?)

এখন প্রশ্ন হ'ল আমাদের স্মৃতি একটি না অনেকগুলি? আমাদের ব্যবহারিক জীবনে দেখা যায় আমরা এক একজন একটা জিনিস খুব ভালভাবে মনে রাখতে পারি—কেউ কবিতা ভাল মনে রাখতে পারি, কেউ গানের সুর ভাল মনে রাখতে পারি, কেউ গাড়ীর নাম্বার ভাল মনে রাখতে পারি, কেউ ইতিহাসের গল্প ভাল মনে রাখতে পারি ইত্যাদি—এই সমস্ত কারণে মনে প্রশ্ন জাগে স্মৃতি এক না বহু? আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বলেন স্মৃতি বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যেমন—

(১) **ব্যক্তিগত স্মৃতি** (Personal Memory)—আমরা যখন কোন ব্যক্তিগত ঘটনা মনে রাখি তখন তাকে ব্যক্তিগত স্মৃতি বলি।

(২) **নৈর্ব্যক্তিক স্মৃতি** (Impersonal Memory)—স্মৃতির বিষয়বস্তু যখন ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন হয় তখন তাকে নৈর্ব্যক্তিক স্মৃতি বলা হয়।

(৩) **তাৎক্ষণিক স্মৃতি** (Immediate Memory)—কোন কিছু শেখার পরেই যদি কেউ সেটাকে হুবহু একভাবে স্মরণ করতে পারে তবে তাকে তাৎক্ষণিক স্মৃতি বলা হয়।

(৪) **স্থায়ী স্মৃতি** (Permanent Memory)—শেখার পরে অনেক দিন পর্যন্ত যদি কোন জিনিস মনে রাখা যায় তবে তাকে এই জাতীয় স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৫) **সক্রিয় স্মৃতি** (Active Memory)—আগের শেখা জিনিসকে যখন চেষ্টা করে মনে রাখতে হয় তখন তাকে সক্রিয় স্মৃতি বলা হয়।

(৬) **নিষ্ক্রিয় স্মৃতি** (Passive Memory)—চেষ্টা না করেই যদি কোন জিনিস মনের উপর ভেসে উঠে তবে সেইটি হবে এই জাতীয় স্মৃতি।

(৭) **যান্ত্রিক স্মৃতি** (Rote Memory)—কোন জিনিসের গূঢ় অর্থ না বুঝেই যখন আমরা সেটা মুখস্থ করার চেষ্টা করি তখন হয় যান্ত্রিক স্মৃতি।

(৮) **যুক্তিপূর্ণ স্মৃতি** (Logical Memory)—যখন শিক্ষণীয় বিষয়টির একটি অংশের সঙ্গে অন্য অংশের সম্বন্ধ ইত্যাদি বুঝে একটা অর্থপূর্ণ ধারণা নিয়ে স্মরণ করার চেষ্টা করা হয় তখন এরূপ স্মৃতি হয়।

(৯) **ইন্দ্রিয়জাত স্মৃতি** (Sense Impression Memory)—চোখ, কান, নাক ইত্যাদির সাহায্যে আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করি তা থেকে

আমাদের শিখন সমৃদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়ের নাম অনুসারে স্মৃতিরও নাম দেওয়া যেতে পারে যেমন চাক্ষুষ, শ্রাবণ, স্বাদজ, ঘ্রাণজ ও স্পর্শজ স্মৃতি।

(১০) **অভ্যাস গত স্মৃতি** (Habit Memory)—পুরোহিত যখন মন্ত্র উচ্চারণ করেন তখন অনেকটা অভ্যাসের বশেই মন্ত্রগুলি স্মরণ পথে আসে।

(১১) **শারীরবৃত্তীয় স্মৃতি** (Physiological Memory)—টাইপ করা, সাঁতার কাটা, সাইকেল চড়া ইত্যাদির স্মৃতি এই স্মৃতির মধ্যে পড়ে।

(১২) **মনস্তাত্ত্বিক স্মৃতি** (Psychological Memory)—যখন কোন বিষয় নিয়ম মত আমাদের মনে উদয় হয়, তখন তাকেই আমরা মনস্তাত্ত্বিক স্মৃতি বলি। এই স্মৃতিকেই মনোবিজ্ঞানীরা আসল স্মৃতি বলে মনে করেন।

স্মৃতি প্রখরতার সর্তাবলী (Favourable conditions of good Memory)

আমরা যা কিছু শিখি তা মনে রাখতে পারি বলেই আমাদের পক্ষে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়। এমনিতে দেখা যায় কোন জিনিস অভিন্ন আগ্রহ সহকারে ও মনোযোগ দিয়ে শিখলে, শেখার সময় একাধিক ইন্দ্রিয় ব্যবহার করলে, কাজটি মাঝে মাঝে অভ্যাস করলে—শেখার পরেও অনেক দিন আমাদের মনে থাকে।

তাছাড়া আমরা দেখেছি শিখনের জন্য, সংরক্ষণের জন্য, উজ্জীবনের জন্য ও চেনার জন্য বিশেষ বিশেষ কতকগুলি সর্ত আছে। এই সর্তগুলিকে মেনে চললে স্মরণক্রিয়ার পক্ষে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এখন আমরা দেখব সেই সর্তগুলি কি কি।

(১) **শারীরিক**—শরীরের সঙ্গে মনের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। শরীর ভাল না থাকলে মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে সংরক্ষণ ভাল হয় না। কাজেই স্মরণ-ক্রিয়ার জন্য শারীরিক অবস্থা ভাল থাকা চাই।

(২) **মানসিক**—কোন জিনিস ভালভাবে স্মরণ করতে গেলে আগ্রহ, মনোযোগ, সংবোধন ইত্যাদির প্রয়োজন; আর এগুলো মানসিক সুস্থতার উপরে অনেকখানি নির্ভর করে।

(৩) **পদ্ধতিমূলক**—কোন শিক্ষণীয় বিষয় মুখস্থ করার সময় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বার বার পড়ে সেটিকে মুখস্থ করা যায়। এই পদ্ধতিতে সমগ্র পদ্ধতি (whole method) বলা হয়।

সমগ্র পদ্ধতি—শিক্ষণীয় বিষয়টির বিভিন্ন অংশের মধ্যে যদি সম্পর্ক ও

সংহতি থাকে তবে বিষয়টি শিখনের জন্য সমগ্র পদ্ধতিই প্রকৃষ্ট উপায়। যেখানে বিষয়বস্তুটিকে উপলব্ধি করতে হয়, রস গ্রহণ করতে হয় (যেমন কবিতা মুখস্থ করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে) সেখানে সমগ্র পদ্ধতিই বেশী কার্যকরী। তাছাড়া যে বিষয়বস্তু আয়ত্ত করার জন্য বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না সেক্ষেত্রে সমগ্র পদ্ধতি ভাল। যেখানে অনেকগুলি বিষয় শিখতে হয় সেখানে এক একটা বিষয় সমগ্রভাবে শিখে নিতে হয়। অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তু আয়ত্ত করার জন্য সমগ্র পদ্ধতি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।

অংশ পদ্ধতি (Part Method)—যখন কোন শিক্ষণীয় বিষয়কে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিয়ে শিখতে হয় তখন সেখানে অংশপদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ বিষয়বস্তুটি যদি বড় হয়, অর্থহীন হয় ও যান্ত্রিক হয় তবে অংশ পদ্ধতির প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া যায়। যেমন গাড়ী চালাতে শেখা, টাইপ করতে শেখা, হাতের লেখা ভাল করতে শেখা ইত্যাদি।

মধ্যগ পদ্ধতি (Mediating Method)—শিক্ষণীয় বিষয়টি যদি ছোট হয় তবে সমগ্র পদ্ধতিতে শেখা ভাল। কিন্তু বিষয়টি যদি অত্যন্ত দীর্ঘ হয় তবে সে ক্ষেত্রে সমগ্র পদ্ধতিতে শেখা তেমন ভাল নয়; আবার হয়তো দেখা যাবে সে ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতিতে শিখনও তেমন কার্যকরী নয়। তখন আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা আর একটা পদ্ধতির সন্ধান দিয়েছেন যার নাম মধ্যগ পদ্ধতি।

এই পদ্ধতিতে কোন বিষয় মুখস্থ করতে আরম্ভ করে পরে অংশ পদ্ধতিতে শেখা যায়। তা না হলে দীর্ঘ বিষয় সমগ্র পদ্ধতিতে শিখতে গিয়ে দেখা যায় প্রথম আর শেষভাগে শেখা হয় কিন্তু মাঝখানটা ফাঁক থাকে অর্থাৎ কম শেখা হয়। তাই দীর্ঘ বিষয় শিখনের ক্ষেত্রে মধ্যগ পদ্ধতি বিশেষভাবে কার্যকরী। কারণ বিশেষ বিশেষ অংশ শেখার জন্য অংশ পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া যায়।

(৪) **আবৃত্তি পদ্ধতি** (Recitation Method)—শিক্ষণীয় বিষয় যতক্ষণ না সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় ততক্ষণ সেটিকে বার বার পড়া হয় (Reading Method)। কিন্তু বিষয়টি কিছুক্ষণ পড়ার পর বই বন্ধ করে যদি আবৃত্তি করে দেখা যায় কতখানি মনে আছে তাহলে শেখাটা ভাল হয়; কারণ যেখানে ভুল হবে সেখানটা বই খুলে দেখে নেওয়া যায়, নিজের ভুল নিজেই সংশোধন করা যায়; এইভাবে আবৃত্তি ও সংশোধনের মাধ্যমে শেখাকেই আবৃত্তি পদ্ধতি

বলা হয়। অনেকে বলেন পঠন পদ্ধতির চেয়ে আবৃত্তি পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ। কারণ-গুলি হ'ল—

(১) শিখন কোথায় দুর্বল তা জানা যায় ও সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করা যায়।

(২) ভুলগুলো স্থায়ী হওয়ার আগেই সংশোধিত হ'তে পারে।

(৩) শিখনের প্রতি স্তরেই নিজের অগ্রগতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থী সচেতন হ'তে পারে, ফলে শেখার উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়ে।

(৪) আবৃত্তি পদ্ধতিতে শেখার ফলে শিখন ও প্রয়োগ দুইই এক সঙ্গে হয় ; ফলে ভবিষ্যৎ প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়।

(৫) অর্থপূর্ণ ও অর্থহীন উভয় বিষয়বস্তু শিখনের ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি কার্যকরী।

(৬) এই পদ্ধতিতে সময় ও পরিশ্রম কম লাগে।

(৭) একাধিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার হয় বলে শিখন এখানে দ্রুত হয়।

(৫) **সবিরাম ও অবিরাম পদ্ধতি** (Spaced or Distributed and Massed or Undistributed Methods)—কোন কিছু শিখতে হলে এক টানা কিছুক্ষণ পড়ে বিশ্রাম নিয়ে আবার পড়লে ভাল হয়। এই পদ্ধতিকে স-বিরাম পদ্ধতি বলে। আবার অনেকে কোন কিছু শেখার জন্য একটানা প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়—একে বলা যেতে পারে অ-বিরাম পদ্ধতি।

পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে অবিরাম পদ্ধতির চেয়ে সবিরাম পদ্ধতি অনেক ভাল। পড়ার বা শেখার মাঝে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিলে শেখাটা বেশ সুদৃঢ় হয়—কারণ সময় পেলে ধারণাগুলো মনের মধ্যে গিয়ে দানা বাঁধে। তাছাড়া সবিরাম পদ্ধতিতে শেখার মাঝে বিশ্রাম থাকে বলে পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধ (অর্থাৎ একটা জিনিস শেখার পরেই আর একটা জিনিস শিখলে প্রথম শেখাটা অনেকখানি ভুল হয়ে যেতে পারে) কম হয়। সবিরাম পদ্ধতির বিরতির ফাঁকে শিক্ষার্থী কিছুক্ষণ মনে মনে আবৃত্তি করার সুযোগ পায়, ফলে শিখন ভাল হয়। বিরতি থাকে বলে শিক্ষার্থীর মস্তিষ্ক সহজে ক্লান্ত হয় না। শেখার মাঝে বিশ্রামের সময় শেখা জিনিসটা চেষ্টা না করলেও মনের মধ্যে ভেসে ওঠে।

(৬) **অতি শিখন** (Over learning)—কোন বিষয় শেখার পরও যদি কিছুক্ষণ শিখে যাওয়া যায় তবে তাকে অতি শিখন বলে। অতি শিখন হলে

ভুলে যাওয়াটা খুব সহজ হয় না, এখানে শেখাটা অনেকটা যান্ত্রিক স্মৃতির রূপ নেয়। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের নাম অতি শিখন হয় বলে আমরা সহজে ভুলে যাই না।

(৭) **বুদ্ধিগত শিক্ষা** (Intelligent learning)—কোন বিষয় শেখার সময় তার অর্থ ভাল করে বুঝে একটা ধারণার সাথে অন্য ধারণার যোগসূত্র স্থাপন করতে পারলে শেখাটা সহজ ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা এই ধরণের শিখনকে অন্তর্দৃষ্টিমূলক পদ্ধতি বলার পক্ষপাতী।

(৮) **উদ্দেশ্যমূলক পদ্ধতি** (Purposive learning)—কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন জিনিস শিখলে শেখাটা সহজ ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

(৯) **মানস ছবি** (Image)—কোন কিছু শেখার সময় যদি শিক্ষণীয় বিষয়টির একটা মানস ছবি শিক্ষার্থী মনে মনে এঁকে নিতে পারে তবে সেটা মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে যাবে।

(১০) **ছন্দ ও সুর** (Rhythm)—ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কোন জিনিস মুখস্থ করার সময় সুর ও ছন্দের মাধ্যমে দুলে দুলে মুখস্থ করে। তাতে শেখাটা আনন্দমূলক ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

(১১) **অনুষঙ্গ** (Association)—কোন নতুন বিষয় শেখার সময় পুরাতন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সঙ্গে নতুন জ্ঞানের সংযোগ স্থাপন করলে শিখন সহজ হয়। যেমন পলাশীর যুদ্ধ ও সিপাহী বিদ্রোহের সাল মনে রাখতে হ'লে পলাশীর যুদ্ধের সাল মনে রেখে তার সাথে ১০০ বছর যোগ করলে সিপাহী বিদ্রোহের সাল পাওয়া যাবে। এখানে প্রথম সালটি আর একটি সালের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় মনে রাখা সহজ হয়।

(১২) **শ্রেণী গঠন পদ্ধতি** (Classification)—শিক্ষণীয় বিষয়টিকে যদি কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে শিখন ত্বরান্বিত হবে।

(১৩) **স্মৃতি-সঙ্কেত** (Mnemonic Devicc)—কোন জিনিস ভাল ভাবে মনে রাখার জন্য স্মৃতি সঙ্কেত ব্যবহার করা হয়। কোন কঠিন বানান, বড় বড় টেলিফোন নাম্বার, অনেকগুলি points হয়তো পর পর মনে রাখা দরকার, তখন মনে রাখার জন্য কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। কঠিন বানান শেখার জন্য ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে একটা শব্দ তৈরী করা হয়; যেমন lieutenant শব্দটি মনে রাখার জন্য বলা হয়—"মিথ্যা তুমি দশ পিঁপড়ে"—এই কথা মনে রাখলে

চলবে। কেমন করে হবে? মিথ্যা (lie) তুমি (U) দশ (Ten) পিঁপড়ে (ant); গোপনে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ইংরেজী হ'ল Assassination. এই শব্দটির ইংরাজী বানান মনে রাখার জন্য Assassination শব্দটিকে ভেঙে বলা হয়—গাধার পরে গাধা (ass-এর পর ass) তারপর আমি (i) তারপর জাতি (nation)।

বড় বড় টেলিফোন নাম্বার, গাড়ীর নাম্বার ইত্যাদি মনে রাখার জন্য অনেকে সংখ্যাগুলির যোগফল মনে রাখে।

অনেকগুলি points মনে রাখতে হলে pointsগুলির আগ্যাক্ষর নিয়ে একটা শব্দ তৈরী করে মনে রাখা হয়। যেমন রামধনুর সাতটা রঙ মনে রাখার জন্য আমরা মনে রাখি "বে নী আ স হ ক লা" অর্থাৎ বেগুনি, নীল, আকাশী, সবুজ হলুদ, কমলা ও লাল রঙ। ব্রতচারীর অভিবাদন—"জ. সো. বা"—জয় সোনার বাংলা ইত্যাদি।

(১৪) **দৃঢ় সংকল্প** (Will to learn)—কোন কিছু শেখার জন্য শিক্ষার্থীর মনে একটা দৃঢ় সঙ্কল্প থাকা চাই। কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে শেখাতে চেষ্টা করলে ফল ভালর চেয়ে মন্দই বেশী হয়।

কাজেই কোন বিষয় শেখার সময় উপরোক্ত কথাগুলি মনে রেখে শিখতে চেষ্টা করলে শেখাটা আনন্দময়, সহজ ও দীর্ঘস্থায়ী হয়, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বিস্মৃতি (Forgetfulness)

জীবন পথে চলতে গিয়ে আমরা অনেক কথা মনে রাখি কিন্তু তাই বলে আমরা সব কথা মনে রাখতে পারি না। ভুলে যাওয়া একটা স্বাভাবিক ঘটনা। মস্তিষ্কে যখন অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ হয় তখন তাকে স্মৃতি বলে আর যখন সংরক্ষণের অভাব হয় তখন তাকে বিস্মৃতি বলে। কাজেই বিস্মৃতি, স্মৃতির ঠিক বিপরীত শব্দ।

স্মৃতির প্রয়োজন আছে এটা আমরা বুঝতে পারি—কারণ স্মৃতি না থাকলে আমাদের জ্ঞান অনেক সীমিত হয়ে পড়ত। কিন্তু বিস্মৃতির কিই বা প্রয়োজন থাকতে পারে—আমাদের মনে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। আমরা জানি আমাদের মনের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সমস্ত কিছু মনে রাখা সম্ভব নয়; শেখা জিনিস আমরা যদি কিছুটা না ভুলি তাহলে নতুন কিছু শেখা সম্ভব নয়। আমরা যা

কিছু শিখি তার সবগুলি সমান প্রয়োজনীয় নয়; তাই অনাবশ্যক ও অপ্রিয় জিনিস ভুলে গেলে আমাদের কোন ক্ষতি হয় না বরং নতুন জিনিস শেখার পথ সুগম হয়। মনোবিজ্ঞানী রিবোর্ট বলেন—শেখার জন্যই ভুলে যাওয়া প্রয়োজন।

তাছাড়া আমরা অনেক সময় ভুল জিনিস শিখে ফেলি। সেগুলি ভুলে না গেলে আমরা সঠিক জিনিস শিখব কেমন করে? আমাদের জীবনের এমন অনেক ঘটনা ঘটে যেগুলি বেদনাদায়ক। সেগুলি ভুলতে না পারলে জীবন পরিক্রমা খুব আনন্দদায়ক হবে না। মনের উপর অনেক সময় নানা চিন্তা-ভাবনার, দুঃখের, বেদনার প্রচণ্ড চাপ পড়ে। সেগুলো আমরা ধীরে ধীরে ভুলে যাই বলে মানব-মন সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে।

এখন আমরা জানব—আমরা ভুলে যাই কেন? এর উত্তরে সাধারণভাবে বলা যায়, মনে রাখতে যে নিয়মগুলি মানা উচিত সেগুলি ঠিকমত মেনে না চললে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা ঘটে। ভুলে যাওয়ার দুটি তত্ত্ব আছে—চর্চার অভাবের তত্ত্ব (Atrophy Theory) ও প্রতিরোধ তত্ত্ব (Interference Theory)।

ভুলে যাওয়ার উপর অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। তার মধ্যে এবিংহসের পরীক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি সংরক্ষণ ও বিস্মৃতির হার, বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী বিস্মরণের হার, বিষয়বস্তুর পরিমাণ, মুখস্থ করার সময় ও প্রচেষ্টা, শিখনের মাত্রা ও সংরক্ষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন। তার ফলে মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানা গেছে। এখন ভুলে যাওয়ার কারণগুলিকে এক এক করে আলোচনা করে দেখা যাক।

(১) **বিষয় বস্তুর প্রকৃতি** (Kind of the material)—মনে রাখার বিষয়বস্তুর প্রকৃতির উপর মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া অনেকখানি নির্ভর করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে—অর্থহীন শব্দ আমরা সবচেয়ে বেশী পরিমাণে ভুলি, তারপর গদ্য ভুলে যাই, তারপর পদ্য ভুলে যাই। সবচেয়ে কম ভুলি আমরা অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শেখা জিনিস।

(২) **শিখনের মাত্রা** (Degree of learning)—কোন জিনিস শেখার পরও সেই জিনিসের চর্চা করলে অতি শিখন হয় ফলে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। নামতা, ছড়া ইত্যাদি বেশী শেখা হয়; বলে আমরা কম ভুলি।

(৩) **আঘাত** (Shock Amnesia)—কোন জিনিস শিখলে মস্তিষ্ক

তা সংরক্ষণ করে। কিন্তু এই সংরক্ষণ যন্ত্রটিতে কোনভাবে আঘাত লাগলে সংস্করণ ঠিকমত হয় না। ফলে বিস্মৃতির পরিমাণ বেশী হয়।

(৪) মাদকদ্রব্য (Drugs)—গাঁজা, মদ, আফিং, কোকেন ইত্যাদি অত্যধিক ব্যবহারের ফলে মস্তিষ্কের স্মরণচিহ্নগুলির ছাপ অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। কাজেই সে ক্ষেত্রে স্মৃতি দুর্বল হয়ে পড়ে।

(৫) প্রতিরোধ (Inhibition)—একাধিক বিষয় একসঙ্গে শিখতে গেলে একটা বিষয় শেখার পর বেশ কিছুক্ষণ মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিতে হয়। কিন্তু বিরাম না দিয়ে একটির পর একটি বিষয় শিখতে চেষ্টা করলে শিক্ষার্থী প্রথম বিষয়টির কিছু অংশ ভুলে যায় ও দ্বিতীয় বিষয়টিরও কিছু অংশ ভুলে যায়। যখন প্রথম শেখা বিষয়ের পর আর একটা বিষয় শেখা হয় তখন শেষে শেখা বিষয়টি প্রথম শেখা বিষয়টিকে মনে রাখার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে এবং সেটি পিছিয়ে এসে প্রথম শেখা বিষয়ের কিছু অংশ চাপা দিয়ে দেয়। একে বলা হয় পশ্চাদমুখী প্রতিরোধ (Retroactive Inhibition)। আর আগের শেখা বিষয়টি যদি পরে শেখা বিষয়টির স্মৃতিপথে আসার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে তাকে অগ্রগামী প্রতিরোধ (Proactive Inhibition) বলে। এক্ষেত্রে প্রথম বিষয়টি এগিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় বিষয়টিকে মনে করার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছে। আমাদের জীবনের অধিকাংশ ভুলে যাওয়ার ঘটনা এই দুটি কারণে ঘটে থাকে।

(৬) ঘুম (Sleep)—কোন জিনিস শেখার পর যদি ঘুমান যায় তবে সংরক্ষণ ভাল হয়, কারণ ঘুমের মধ্যে তথ্যপূর্তি (Consolidation) ঘটে। পরীক্ষার আগের রাতে তাই বেশীক্ষণ ঘুমতে বলা হয়।

(৭) আবেগজনিত প্রতিরোধ (Femotional Blocking)—অতিরিক্ত মাত্রায় রাগ, ভয়, আনন্দ ইত্যাদি শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকলে ভাল করে শেখা জিনিসও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে শিক্ষককে ছাত্রছাত্রীরা বেশী ভয় পায় তাঁর ক্লাসে ছাত্রছাত্রীরা পড়া বেশী ভুলে যায়।

(৮) পরিবর্তিত পরিবেশ (Altered Environment)—কোন বিষয় কোন একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে শিখলে পরে পরিবেশ পরিবর্তিত হ'লে ভুল হয়। যেমন দেখা যায় বাড়ীতে ভাল করে শেখা জিনিসও পরীক্ষায় হলে মনে পড়তে চায় না।

(৯) চর্চার অভাব (Disuse)—একবার শেখা জিনিস মাঝে মাঝে

মনে মনে আলোচনা করা দরকার। সময়ের ব্যবধানেও আমরা অনেক জিনিস ভুলে যাই। কিন্তু আসলে এটি চর্চার অভাবে আমরা ভুলি।

(১০) **অবদমন** (Repression)—ভুলে যাওয়াকে মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড দুভাগে ভাগ করেছেন—ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক। ফ্রয়েড বলেন ভুলে যাওয়াটা অনেক ক্ষেত্রে ঐচ্ছিকভাবে ঘটে থাকে। স্মরণ করার অনিচ্ছা থেকে বিস্মৃতির উৎপত্তি। তাই তিনি বলেন আমরা ভুলতে চাই তাই ভুলি। অবশ্য তিনি বলেন কোন কিছু ভুলে যাওয়া মানে সেটিকে চেতন মন থেকে অবদমন করে অচেতন মনে পাঠান।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে কেন তবে আমরা দরকারী কথাও ভুলে যাই? পরীক্ষার পড়া আমরা ভুলি কেন? আবার অনেক জিনিস ভুলতে চাইলেও ভুলি না কেন? ফ্রয়েড এর উত্তরে বলেন, কোনটা ভুলব আর কোনটা মনে রাখব তা ঠিক করে আমাদের অহংসত্তা (Ego)। চেতন মন অনেক সময় ঠিক করতে পারে না কোন জিনিসটা আমাদের মনে রাখা দরকার। শোক, দুঃখ, বেদনা—বার বার আলোচনার ফলে অতিশিক্ষা হ'য়ে যায় বলে বেশীর ভাগ সময় ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না।

ভুলে যাওয়াটা অনেকটাই পছন্দ অপছন্দের উপর নির্ভর করে। যেমন দেখা যায় আমরা দেনাগুলির প্রতি উদাসীন হই কিন্তু পাওনাগুলির কথা ঠিক মনে রাখি।

স্মৃতির উন্নতি সম্ভব কিনা (Can Memory be Improved)?

শিখনের উন্নতি যে সব সর্তের উপর নির্ভর করে সেগুলির উন্নতি করলেই স্মৃতি খানিকটা উন্নত হ'তে পারে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানী জেমস্ বলেন স্মৃতির উন্নতি সম্ভব নয়—কারণ অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন ক্ষমতা মানুষের জন্মগত ও সহজাত। আবার স্টাউট বলেন অনুশীলনের সাহায্যে স্মৃতির স্মরণক্রিয়ার উন্নতি সম্ভব। মস্তিষ্ক সংরক্ষণ করে; পুষ্টিকর খাদ্য, উপযুক্ত বিশ্রাম ইত্যাদিতে সংরক্ষণ কাজ সহজ হয়। উজ্জীবন ও চিনতে পারার সর্তগুলিও স্মৃতি সহায়ক হ'তে পারে। শিখনও বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে উন্নত করা যায়। এসব করলেই স্মৃতি শক্তির খানিকটা উন্নতি করা সম্ভব।

স্মৃতির বিস্তার (Memory Span)—একবার শুনে যতটা মনে রাখা যায় তাকে স্মৃতির বিস্তার (Span) বলা হয়। প্রত্যেকের এই ক্ষমতার একটা

নির্দিষ্ট সীমা আছে। অর্থহীন শব্দের সারি ক্রমশঃ বাড়িয়ে দিয়ে স্মৃতির বিস্তার পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার পরে জানা গেছে সাধারণ লোকের স্মৃতির বিস্তার হোল ৬ বা ৭। প্রতিভাবানদের বেলায় কেবল এর ব্যতিক্রম দেখা যায়।

প্রশ্নাবলী

1. What are the marks of good memory? Can memory be improved by practice? (C. U. Hons 1971)

2. What are the conditions of memory? Is memory an exact reproduction of part experiences? How do emotions and attitudes influence memory? (C.U. Hons 1966)

3. What are the grounds of forgetfulness? Does the unconscious play any part in bringing about forgetfulness?
(C. U. Hons. 1963)

4. State and explain the results of Ebbinghaus' experiments on memory?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মনোযোগ ও অনুরাগ--(Attention & Interest)

প্রাচীনকালে মানসিক শক্তিতে বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানীরা মনোযোগ কথাটিকে মনের একটা গুণ বলেই ব্যাখ্যা করতেন এবং বলতেন অনুশীলনের দ্বারা এর বিকাশ সম্ভব। বর্তমানে এই মত সম্পূর্ণ মানা হয় না। তবু মানা না হলেও মনোযোগ যে কি তা সঠিক বলা কিন্তু একটু অসুবিধাজনক ব্যাপার। অনেকে তাই মনোযোগের বর্ণনা দিয়ে মনোযোগ কি তা বোঝানর চেষ্টা করেছেন। ফরাসী মনোবিজ্ঞানী রিঁবো বলেছেন—'অনুভূতির প্রকাশমূলক দিক হল মনোযোগ'।

মনোযোগ বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি, মনকে কোন কিছুর সাথে একান্তভাবে যুক্ত করা। নদীর প্রবাহের মতই আমাদের চেতনার প্রবাহ গতিশীল। আমাদের পরিবেশে অজস্র জিনিস আমাদের ঘিরে রয়েছে কিন্তু সব জিনিস সম্বন্ধে আমরা এক সঙ্গে সচেতন হতে পারি না। এক এক সময় আমরা এক একটা জিনিস সম্বন্ধে সচেতন হই। একটা বিশেষ জিনিসকে বেছে নিয়ে এই যে চেতনার কেন্দ্রে আসা হল এটাকেই আমরা মনোযোগ বলি।

অবশ্য আধুনিক মনোবিদ্‌গণ বলেন—কেবলমাত্র বস্তু সম্বন্ধে সচেতনতাই মনোযোগ নয়—মনোযোগের মধ্যে একটা ক্রিয়াশীলতাও বিশেষভাবে কাজ করে। মনোবিজ্ঞানী ম্যাক্‌ডুগাল বলেন—'যে মানসিক সক্রিয়তা আমাদের প্রত্যক্ষণের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকেই বলা হয় মনোযোগ।' মনোবিদ্‌ স্টাউটও এই কথার প্রতিধ্বনি তুলে বলেন—'মানুষের জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ার অন্তরালে যে মানসিক সক্রিয়তা কাজ করে তাই হোল মনোযোগ' (Attention is conation, determining congnition)।

মনোযোগ কথাটাকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হ'লেও দেখা যাচ্ছে—এটা

---

1. "Attention is conation, determining congnition"—Stout.

2. Ross Says - 'It is better to say I attend to my work than 'my attention is directed to my work'.

3. 'Attention is an attitude of readiness or preparedness for action' —Woodworth.

4, Titchener says—'The problem of attention centeres in the fact of sensible clearness.'

একটা মানসিক শক্তি, এটা একটা মনের কাজ বা প্রক্রিয়া, মনের কাজ ও বস্তু সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট চেতনা। মনোযোগ এমন একটা মানসিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা আমরা মনকে কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট করি—যার ফলে ঐ বিষয় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আগের থেকে আরও স্পষ্ট হয়। যেমন ঘরের মধ্যে অনেক জিনিস আছে কিন্তু তার মধ্যে থেকে হয়তো যে কোন একটাতে মনোযোগ দিলাম—যেমন রেডিও খুলে গান শুনতে লাগলাম; তার ফলে সেই গানটি সম্বন্ধে আমার আগেকার ধারণা আরও স্পষ্ট হল।

মনোযোগ সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে হলে মনোযোগের বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের জানা দরকার।

(১) মনোযোগ মনের একটা কেন্দ্রানুগ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার ফলে কোন বিশেষ প্রত্যক্ষ্যণের বস্তু আমাদের চেতনার কেন্দ্রস্থলে আসে।

(২) মনোযোগ এক প্রকারের আচরণ।

(৩) মনোযোগ দেওয়ার ফলে অস্পষ্ট জিনিস আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়।

(৪) মনোযোগের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ; ফলে আমরা এক সঙ্গে একটিমাত্র জিনিসের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি।

(৫) মনোযোগ কোন বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে খুব বেশী সময় স্থির থাকতে পারে না, সব সময় এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে স্থানান্তরিত হয়। কোন বস্তুতে মনোযোগ দিতে গিয়ে দেখা যায় কিছুক্ষণ পর পর তার পাশের বস্তুর প্রতি আমাদের মনোযোগ চলে যায়। আমাদের ইচ্ছা থাকা সত্বেও কোন বস্তুকে আমরা চেতনার কেন্দ্রে বেশী ক্ষণ ধরে রাখতে পারি না। কোন বস্তুর প্রতি দু সেকেণ্ডের বেশী মনোযোগ দেওয়া শক্ত। মনোযোগের এই পরিবর্তনশীলতাকে Shifting of attention বলে।

(৬) মনোযোগ হল একটা নির্বাচনী প্রক্রিয়া। অনেক জিনিসের মধ্যে থেকে একটাকে বেছে নিয়ে তাতে মনোযোগ দেওয়া হয়।

(৭) মনোযোগের দুটো দিক আছে—সদর্থক (Positive) ও নঞর্থক (Negative)। কোন জিনিসের প্রতি মনোযোগ দেওয়াকে বলে সদর্থক মনোযোগ আর মনোযোগ কোন বস্তু থেকে সরিয়ে নেওয়াকে বলে নঞর্থক মনোযোগ।

(৮) মনোযোগের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে।

(৯) মনোযোগ হ'ল অনুসন্ধানধর্মী। মনোযোগ দেওয়ার ফলে কোন জিনিসের অনেক নতুন গুণ সম্বন্ধে জানা যায়।

(১০) মনোযোগকে একাধারে বিশ্লেষণমূলক ও সংশ্লেষণমূলক প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে।

(১১) মনোযোগ দেওয়ার সময় শরীরের অনেক পরিবর্তন হয়, যেমন চোখের পলক স্থির হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাস কম পড়ে ইত্যাদি।

(১২) মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা প্রত্যেক ব্যক্তির আলাদা। মনোযোগের সীমাকে span of attention বলা হয়। আজকাল ট্যাচিস্টোস্কোপ নামে এক যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের মনোযোগের পরিসর মাপা যায়। সাধারণ মানুষের মনোযোগের পরিসর চার থেকে পাঁচ এককের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অসাধারণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক সঙ্গে অনেক জনকে অনেকগুলি বইয়ের dictation দিতেন।

মনোযোগর সর্ত (Conditions of Attention)

কোন বস্তুর প্রতি আমাদের মনোযোগ যখন আকৃষ্ট হয় তখন বস্তুর কতকগুলি সর্ত থাকে যেগুলো বস্তুটিকে নির্বাচনে সাহায্য করে। এগুলিকে বস্তুগত সর্ত (objective conditions) বলা হয়। আবার অনেক সময় আমাদের অন্তরের তাগিদেই কোন বিষয়বস্তুকে বেছে নিই তখন তাকে ব্যক্তিগত সর্ত (subjective conditions) বলি।

উদ্দীপকের যে যে বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে আমরা মনোযোগের বিষয়বস্তু নির্বাচন করি সেগুলি হল—

(১) তীব্রতা (Intensity)—উদ্দীপকসমূহের মধ্যে সবচেয়ে তীব্র উদ্দীপককে কেন্দ্র করে আমাদের মনোযোগ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। সব শব্দ আমরা ভাল করে শুনি না; কিন্তু বাজ পড়ার শব্দ সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

(২) বিস্তৃতি (Extensity)—অনেক সময় ছোট জিনিস আমাদের চোখে পড়ে না কিন্তু বড় জিনিস আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। পিঁপড়ে আমরা সহজে দেখতে পাই না, কিন্তু হাতি চলে গেলে আমরা দেখতে বাধ্য হই।

(৩) পুনরাবৃত্তি (Repetition)—খুব ক্ষীণ উত্তেজকও বার বার ঘটায়

ফলে আমরা মনোযোগ দিই। দূর থেকে ভেসে আসা কান্নার শব্দও বার বার শুনলে আমরা মনোযোগ দিতে বাধ্য হই।

(৪) **অভিনবত্ব** (Novelty)—অভিনব জিনিস দেখলে আমরা সাধারণত মনোযোগ দিই। রাস্তায় যদি কাউকে কোন নতুন স্টাইলের জামা কাপড় পরতে দেখা যায় তবে তা আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি।

(৫) **গতিশীলতা** (Movement)—একটা রেলগাড়ী দাঁড়িয়ে থাকলে ততটা মনোযোগ আমরা দিই না কিন্তু মাঠের মাঝখান দিয়ে যখন ছুটে চলে তখন আমরা না দেখতে চাইলেও তা আমাদের চোখে পড়ে।

(৬) **পরিবর্তন** (Change)—উদ্দীপকের যে কোন রকম পরিবর্তন আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন প্রায়ই দেখা যায়—অনেকে রেডিও খুলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন—কিন্তু রেডিওটা বন্ধ করলেই তাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়।

(৭) **আকস্মিকতা** (Suddenness)—পরিবেশের সাম্যাবস্থার মধ্যে হঠাৎ কোন পরিবর্তন হ'লে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। সবাই গল্প করছে এমন সময় যদি কারও হাত থেকে কাঁচের বাসন ঝন্ ঝন্ শব্দে পড়ে যায় তবে সবাই আমরা তাতে মনোযোগ দিই।

(৮) **স্পষ্টতা** (Clarity)—আবছা, অপরিষ্কার হাতের লেখা দেখলে আমরা সহজে তা পড়তে চাই না, কিন্তু ঝক ঝকে, পরিষ্কার লেখা দেখলে আমরা পড়তে মনোযোগী হই।

(৯) **অবস্থিতি** (Location)—ঘরের মাঝখানে কোন জিনিস থাকলে সহজেই তা আমাদের চোখে পড়ে।

(১০) **সুসম্বদ্ধতা** (Symmetry)—একটা সুন্দর ও সুসম্বদ্ধ ছবি আর একটা অসুন্দর ছবি যদি পাশাপাশি রাখা যায় তবে দেখা যাবে সুন্দর ছবি আমাদের মনে রেখাপাত করে।

(১১) **প্রকৃতি** (Kind)—সাদা জিনিসের চেয়ে রঙিন জিনিস বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে।

(১২) **বিচ্ছিন্নতা** (Isolation)—এক জায়গায় অনেকে দাঁড়িয়ে জটলা করছে—একটু দূরে একজন দাঁড়িয়ে আছে—এমন যদি হয় তবে একা মানুষটিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(১৩) **স্থায়িত্ব** (Duration)—গাড়ীর হর্ণ একবার বাজালে আমরা

অনেক সময় খেয়াল করি না কিন্তু হর্ণটা একটানা বাজতে থাকলে আমরা মনোযোগ দিতে বাধ্য হই।

(১৪) বৈসাদৃশ্য (Contrast)—খুব লম্বা রোগা লোকের পাশে বেঁটে মোটা লোক দেখলেই আমাদের মনোযোগ সেই দিকে ধাবিত হয়।

(১৫) গোপনীয়তা (Secrecy)—সকলের মাঝখানে কেউ ফিস্ ফিস্ করে কথা বললে তার দিকে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

এছাড়া কোন ব্যক্তির মানসিক প্রস্তুতি ঠিক করে দেয় কোন্ জিনিসের প্রতি তার মনোযোগ দেওয়া উচিত। যেমন—

(১) কোন ব্যক্তির ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা (Desire or Will)—কোন জিনিসের প্রতি কারও যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে সেই জিনিসের প্রতি তার মনোযোগ সহজেই যাবে। টাকার প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকলে টাকার শব্দ শুনলেই তার মনোযোগ সেই দিকে যাবে।

(২) আগ্রহ (Interest)—যার যে বিষয়ে আগ্রহ থাকে সে বিষয়ে তার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। খবরের কাগজের পৃষ্ঠা খুলেই কেউ সিনেমা পৃষ্ঠা দেখে, কেউ খেলার খবর আবার কেউ বা রাজনীতির খবরে চোখ বুলায়।

(৩) জৈবিক চাহিদা (Organic Drives)—আমাদের জৈবিক চাহিদাগুলি মনোযোগ আকর্ষণে সাহায্য করে। ক্ষিদে পেলে খাবারের দোকান সহজে চোখে পড়ে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌন লিপ্সা, মাতৃত্ব ইত্যাদি জৈবিক চাহিদার মধ্যে পড়ে।

(৪) ভয় (Fear)—যে টিকটিকিকে ভয় করে, ঘরের কোথাও টিকটিকি থাকলে তা তার চোখে পড়বে।

(৫) কৌতূহল (Curiosity)—কোন জিনিস সম্বন্ধে কৌতূহল থাকলে তা সহজে চোখে পড়ে।

(৬) সামাজিক প্রেষণা (Social Motives)—মানুষ সামাজিক জীব বলে মানুষের প্রতি তার আকর্ষণ বেশী। বেশীর ভাগ বিজ্ঞাপনে তাই মানুষের ছবি ব্যবহার করা হয়।

(৭) প্রক্ষোভ (Emotion)—যে জিনিস ভাল লাগে তাতে আমরা মনোযোগ দিই আর ভাল যা না লাগে তা আমরা এড়িয়ে চলি।

(৮) অভিজ্ঞতা (Experience)—কোন কাজের অভিজ্ঞতা কারও থাকলে সেই কাজের প্রতি তার সহজে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

(৯) **অভ্যাস ও শিক্ষা** (Habit and Education)—ঘুম ভাঙলেই যার চা খাওয়ার অভ্যাস তার সকালে রান্নাঘরে চা হচ্ছে কিনা সেই দিকে মনোযোগ যাবে।

(১০) **মানসিক প্রবণতা** (Mental Disposition)—শিল্পীর মন শিল্পকলার দিকে যাবে একথা বলাই বাহুল্য ; কারণ তাঁর মানসিক প্রবণতা শিল্পের দিকেই ঝুঁকে আছে।

মনোযোগ দেওয়া কাজটি ব্যক্তির দেহ, মন ও পরিবেশের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। শারীরিক অবস্থা বলতে বুঝি ইন্দ্রিয়ের কর্মক্ষমতা, শারীরিক সুস্থতা ইত্যাদি। মন বলতে আমরা মানসিক সুস্থতা, স্বাভাবিকতা ইত্যাদি বুঝে থাকি। পরিবেশ মনোযোগকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে। প্রচণ্ড গরম, কন্‌কনে ঠাণ্ডা ইত্যাদি থাকলে পড়াশুনায় মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটে

মনোযোগের শ্রেণী বিভাগ (Types of Attention)।

মনোযোগের প্রকৃতি, বিষয়বস্তু ও স্থায়িত্ব অনুযায়ী মনোযোগকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—

(১) **ঐচ্ছিক** (Voluntary) মনোযোগ—যখন কোন উদ্দীপকের প্রতি জোর করে আমাদের মনোযোগ দিতে হয় তখন তাকে বলা হয় ঐচ্ছিক মনোযোগ। সবাই গল্প করছে—তার মাঝে যদি কাউকে ··ীক্ষার পড়ায় মন দিতে হয় তবে সেটা হবে ঐচ্ছিক মনোযোগ।

(২) **অনৈচ্ছিক** (Non-Voluntary) মনোযোগ—উদ্দীপক নিজেই এখানে মনোযোগ আকর্ষণ করে ; এটা ইচ্ছানিরপেক্ষ ও স্বতঃস্ফূর্ত। উদ্দীপক তীব্র হলে সাধারণতঃ এই ধরণের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন তীব্র গন্ধ, উজ্জ্বল আলো, অসহ্য যন্ত্রণা ইত্যাদি আপনা থেকেই মনোযোগ আকর্ষণ করে।

(৩) **অভ্যাসমূলক** (Habitual) মনোযোগ—যখন কেউ কোন কাজে অভ্যস্ত হ'য়ে যায় তখন সেই কাজটি করার জন্য জোর করে মনোযোগ দিতে হয় না। তবে এমন কতকগুলি বিষয় আছে সেগুলির জন্য প্রথমে মনোযোগ দিতে হ'লে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে হয়, পরে অভ্যাস হয়ে গেলে আর ইচ্ছাশক্তি লাগে না। যেমন টাইপ করার জন্য মনোযোগ।

(৪) **আরোপিত ও স্বাভাবিক** (Enforced and spontaneous) মনোযোগ—অনৈচ্ছিক মনোযোগকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়—

আরোপিত ও স্বাভাবিক মনোযোগ। খিদে পেলে খাবারের প্রতি মনোযোগ হ'ল স্বাভাবিক মনোযোগ। উদ্দীপকের তীব্রতার জন্য যে মনোযোগ তা হ'ল আরোপিত মনোযোগ। কোনো দুঃখের কথা বার বার আমাদের মনে আসে —এটা আরোপিত মনোযোগ।

(৫) অবিভক্ত ও বিভক্ত (Implicit and and Explicit) মনোযোগ —ঐচ্ছিক মনোযোগকে আরও দুটি ভাগ করা যায়—অবিভক্ত ও বিভক্ত। যখন কোন জিনিসে মনোযোগ দেবার জন্য একটা মাত্র ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে বলা হয় অবিভক্ত মনোযোগ। আর যখন মনোযোগকে ধরে রাখার জন্য একাধিক ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে বিভক্ত মনোযোগ বলা হয়।

(৬) তীব্র ও বিভাজক (Intensive and Distributive) মনোযোগ— কোন সময় একটি মাত্র বিষয়ে মনোযোগ দিলে তাকে তীব্র মনোযোগ ও একসঙ্গে একাধিক বিষয়ে মনোযোগ দিলে তাকে বিভাজক মনোযোগ বলা হয়।

(৭) নিশ্চিত ও অনিশ্চিত (Fixating of Fluctuating) মনোযোগ —যে জিনিস চোখের সামনে আছে তাতে ঠিকমত মনঃসংযোগ করাকে নিশ্চিত মনোযোগ বলা হয় আর অনিশ্চিত মনোযোগের বেলায় প্রত্যেক জিনিসের সাথে কল্পনা মিশিয়ে তাতে মনোযোগ দেওয়া হয়।

(৮) অচল ও সচল (Static and Dynamic) মনোযোগ—কোন বিষয় সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত যে মনোযোগ তাকে বলা হয় অচল মনোযোগ। কিন্তু সচল মনোযোগ বিষয়বস্তু থেকে বার বার চলে যায়, জোর করে আবার মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে হয়।

(৯) বস্তুবিষয়ক ও ভাববিষয়ক (Sensory and Ideational) মনোযোগ—ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর প্রতি যখন আমরা মনোযোগ দিই তখন হোল বস্তুবিষয়ক মনোযোগ। কখনও কখনও আমরা কোন ধারণা বা ভাবের প্রতিও মনোযোগ দিই, তখন তাকে আমরা ভাববিষয়ক মনোযোগ বলি।

(১০) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ (Direct and Indirect) মনোযোগ— উদ্দীপক আকর্ষনীয় হ'লে মনোযোগ সরাসরি বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়, একে প্রত্যক্ষ মনোযোগ বলা হয়; আর কম আকর্ষণীয় বস্তুকে অন্য আকর্ষণীয় বস্তুর সাথে যুক্ত করে তবে মনোযোগ দিতে হয়; তখন সেটা হয় পরোক্ষ মনোযোগ।

(১১) **বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষণাত্মক** (Analytical & Syntheti-cal) মনোযোগ—যখন কোন বিষয়কে সামগ্রিকভাবে না দেখে বিভিন্ন অংশের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় তখন তাকে বিশ্লেষণাত্মক মনোযোগ বলা হয়। কিন্তু বিষয়বস্তুটিকে সমগ্রভাবে দেখে তাতে মনোযোগ দিলে তাকে তখন বলা হয় সংশ্লেণাষত্মক মনোযোগ।

(১২) **তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক**—(Theoretical & Practical) মনোযোগ—যখন নিছক জ্ঞানলাভের জন্য আমরা মনোযোগ দিই তখন তাকে বলে তত্ত্বগত মনোযোগ। কিন্তু যখন ফললাভের জন্য ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে মনোযোগ দিই তখন তাকে ব্যবহারিক মনোযোগ বলা হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে মনোযোগের গুরুত্ব ও শিক্ষকের দায়িত্ব—শিক্ষা হ'ল ব্যক্তিজীবনের একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া। শিক্ষার্থীর নিজের চেষ্টা ছাড়া শিক্ষা সম্ভব নয়। মনোযোগও ব্যক্তিজীবনের এক সক্রিয় প্রক্রিয়া। কাজেই শিক্ষাকালে মনোযোগ হ'ল মানসিক সক্রিয়তার একটা অঙ্গ। শিক্ষার্থী যদি কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সমস্যাটির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় কোরে তাতে মনোযোগ দিতে না পারে তবে সহজে সমস্যার সমাধান করতে পারবে না, গেস্টলাট মনোবিজ্ঞানীরা একথা জোর গলায় ঘোষণা করেছেন।

কোন বিষয় ভাল করে বুঝতে গেলেই শিক্ষার্থীকে মনোযোগ দিতে হবে। কাজেই শিক্ষক কোন বিষয়ে পাঠদানের সময় দেখে নেবেন ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ পাঠ্যবিষয়ে আছে কিনা। মনোযোগ না থাকলে যে কোন কৌশলে মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষককে এজন্য নানা বিষয়ে সচেতন হ'তে হবে।

(১) শিক্ষককে জানতে হবে যে শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতাও বাড়ে। প্রাথমিক স্তরে শিশুদের মনোযোগ থাকে ইচ্ছা নিরপেক্ষ; তখন প্রধানতঃ তাদের মনোযোগ প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়। সেই সময় জোর করে শিশুর অন্য জিনিসের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা বৃথা।

এর পরের স্তরে শিশুদের মনে নানা রকম সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে। সেই সেন্টিমেণ্টগুলোকে কাজে লাগিয়ে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

(২) শিশুর বয়স বেশ কিছুটা বাড়লে তবে সে ঐচ্ছিক মনোযোগে অভ্যস্ত হ'তে পারে। প্রথমে শিশুরা বিমূর্ত জিনিসের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে না। শিক্ষকের তাই উচিত হবে প্রথমে মূর্ত জিনিসে মনোযোগ দিতে অভ্যস্ত করে তারপর বিমূর্ত জিনিসের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা। শিশুর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগ সৃষ্টি করতে হবে; তারপর চরিত্র গঠন, সদভ্যাস গঠন ইত্যাদি কাজে ইচ্ছা-প্রণোদিত মনোযোগ-এর সাহায্য নেবেন শিক্ষক।

(৩) মনোযোগকে শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হ'লে মনোযোগের পরিসর সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত ধারণাকে কাজে লাগাতে হবে। বেশীরভাগ শিশু একসঙ্গে অনেক জিনিসে মন দিতে পারে না। কাজেই কোন বিষয় পরিবেশনের সময় শিক্ষককে মনে রাখতে হবে বিষয়ের সংখ্যা যেন বেশী না হয়—শিক্ষার্থীর মনোযোগের সামর্থ্যের বাইরে চলে না যায়।

(৪) মনোযোগের সর্তগুলোকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। বিষয়-বস্তুর তীব্রতা, স্পষ্টতা, বিস্তৃতি ইত্যাদি প্রতিদিন পাঠদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। পাঠ্যপুস্তকের ছাপা, ছবি ইত্যাদি ঠিক আছে কি না দেখতে হবে; বোর্ডে লেখার সময় পরিষ্কার, স্পষ্ট বড় হরফের অক্ষর লিখতে হবে। বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি করতে হবে। শিক্ষক যে সব প্রদীপন (aids) ব্যবহার করবেন সেগুলো যেন অভিনব হ'য়, তার মধ্যে যেন গতিশীলতা থাকে, শিক্ষকের গলার স্বরেও পরিবর্তনশীলতা থাকে অর্থাৎ ওঠানামা বেশ স্পষ্ট হয়। শিক্ষার্থীদের জন্মগত প্রবণতা ও প্রক্ষোভকে কাজে লাগানর চেষ্টাও করতে হবে শিক্ষককে।

(৫) শিক্ষার্থীদের মনোযোগ স্থির নয় একথা শিক্ষককে মনে রাখতে হবে। কোন বয়সের ছেলেমেয়েদের মনোযোগ কতক্ষণ ধরে রাখা যায় সে সম্বন্ধে তাঁকে জানতে হবে। নিম্নশ্রেণীতে তাই কিছুক্ষণ পর পর বিষয়ের পরিবর্তন করা হয়। যারা খুব চঞ্চল তারা কোন জিনিস সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করার আগেই মনোযোগ সরিয়ে নেয়। ফলে কিছুটা কল্পনা করে নেয়; কিন্তু তাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। এদের প্রতি শিক্ষককে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে শিখনের ক্ষেত্রে মনোযোগের একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। মনোযোগকে উপেক্ষা করে কোন শিখনই সম্ভব নয়। মনোবিজ্ঞানী উডওয়ার্থ বলেছেন, "Attention explores and perception discovers"

—কাজেই আবিষ্কার ও গবেষণামূলক শিখনের ক্ষেত্রে মনোযোগই একমাত্র সহায় সম্বল।

অনুরাগ (Interest)

আগ্রহ বা অনুরাগ হ'ল মনোযোগের প্রধান অবধারক। অনুরাগ ও মনোযোগ প্রকৃতপক্ষে একই মুদ্রার দুই পিঠ—যা ভিতরে অনুরাগ তাই বাইরে মনোযোগ।

মনোবিজ্ঞানী স্টাউট অনুরাগকে অভিজ্ঞতার প্রক্ষোভ-প্রতিক্রিয়ামূলক দিক বলেছেন। অনুরাগের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল—"it matters"; অর্থাৎ আমাদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত বস্তুই আমাদের অনুরাগের বস্তু। ক্রো এবং ক্রো (Crow and Crow) বলেছেন অনুরাগ বলতে আমরা ব্যক্তির কোন বিশেষ ব্যক্তি বস্তু বা ক্রিয়ার প্রতি মানসিক আকর্ষণ বুঝি। এইভাবে অনেকেই অনুরাগকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলেছেন।

কিন্তু বর্তমানের মনোবিজ্ঞানীরা অনুরাগকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলতে রাজী নন। অনুরাগ হ'ল এক ধরনের মানসিক প্রবণতা—যাকে আমরা মানসিক সংগঠনও বলতে পারি। ম্যাকডুগাল বলেন, যে-সব জিনিস প্রাণীর প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত সেই সব জিনিসের প্রতি প্রাণীর অনুরাগ জন্মায়। কিন্তু মানুষের অনুরাগ আরও জটিল। এক্ষেত্রে প্রবৃত্তি ছাড়াও অর্জিত অনুরাগ থাকতে পারে। মনোবিদ টেলফোড বলেন—যে সব জিনিস আমাদের তৃপ্তি এনে দেয় তাদের প্রতি আমরা অতি সহজেই অনুরক্ত হই। কাজেই এটা একটা মানসিক সংগঠন ছাড়া আর কিছু নয়।

অনুরাগ ও মনোযোগ—অনুরাগ বাইরের জগতের বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে; অনুরাগের সাহায্যে মানুষের কাজের প্রকৃতি বোঝা যায়, আর এটি মনের একটি স্থায়ী প্রবণতা।

ড্রেভার বলেন, মনোভাবের গতিশীল অবস্থা হল অনুরাগ। হার্বার্ট বলেন, নতুন জ্ঞান আহরণের জন্য মনের যে প্রস্তুতি তাকেই আমরা অনুরাগ বলি।

1. "Interest is latent attention, and attention is interest in action."
—Mc Dougal.

2. "An interest is a disposition in its dynamic aspect." —Drever.

3. "Interest is conative rather than cognitive; the emotions must be organised round the object of interest." —Ross.

মনোযোগও আমাদের নতুন জ্ঞানলাভে একান্তভাবে সাহায্য করে। কিন্তু এ দুটির সম্পর্ক কেমন ?

মনোযোগের পিছনে যে মানসিক প্রবণতা কাজ করে তাই হল অনুরাগ ; অনুরাগ মনোযোগের বস্তু নির্বাচন করে দেয়। মনোযোগ ও অনুরাগ বলতে আমরা প্রায় একই রকম মানসিক বৈশিষ্ট্যকে বুঝি। আমরা মানসিক প্রক্রিয়াকে বলছি মনোযোগ আর যে মানসিক সংগঠন এই প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে তাকে বলছি অনুরাগ। কোন বস্তুতে আমাদের অনুরাগ থাকলে তার প্রতি আমরা মনোযোগ দেবার জন্য প্রস্তুত হই। এই প্রসঙ্গে ম্যাকডুগালের কথা মনে পড়ে, যখন তিনি বলেন 'অনুরাগ হল সুপ্ত মনোযোগ এবং মনোযোগ হল ক্রিয়াশীল অনুরাগ'। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি মনোযোগ ও অনুরাগের মধ্যে একটা নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে। একটিকে বাদ দিয়ে আর একটি অর্থহীন।

অনুরাগের শ্রেণীবিভাগ ও বিকাশ—মানসিক সংগঠনের দিক থেকে বিচার করে অনুরাগের শ্রেণীবিভাগ করা যায়—স্বাভাবিক অনুরাগ ও অর্জিত অনুরাগ। সহজাত প্রবণতার জন্য মানুষের মধ্যে যে অনুরাগ দেখা যায় তা হল স্বাভাবিক অনুরাগ। যেমন শিশুদের কোন কিছু গড়ার প্রতি অনুরাগ। কিন্তু সেণ্টিমেণ্ট, অভ্যাস ইত্যাদির জন্য মানুষের যে অনুরাগ দেখা যায় তাকে বলা হয় অর্জিত অনুরাগ।

জীবনের প্রথম স্তরে শিশু স্বাভাবিক অনুরাগ দ্বারা চালিত হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর অর্জিত অনুরাগের বিকাশ হতে থাকে। এক বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর রঙ, শব্দ ইত্যাদির প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ থাকে। ১—৩ বছর বয়স পর্যন্ত তাদের বিশেষ কোন অনুরাগ বোঝা যায় না। ৩—৫ বছর পর্যন্ত খেলনার উপর ঝোঁক দেখা যায়। ৫—১০ বছর পর্যন্ত ছেলে মেয়েদের অনুরাগ আলাদা হ'য়ে দেখা দেয়। এই সময় মেয়েরা পুতুল খেলা, ছবি আঁকা ইত্যাদি বেশী পছন্দ করে, ছেলেরা পড়াশুনা, খেলাধুলা ইত্যাদিতে বেশী মন দেয়। ১০—১২ বছর বয়সে মেয়েদের মধ্যে নারীসুলভ অনুরাগ ও ছেলেদের মধ্যে পুরুষ সুলভ অনুরাগ দেখা যায়। এইভাবে প্রাপ্ত বয়সে মেয়েদের গৃহকাজের প্রতি অনুরাগ ও ছেলেদের কর্মজীবনের প্রতি অনুরাগ জন্মায়।

অনুরাগ ও শিক্ষা—আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাদর্শের যুগে এটা

বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে শিশুর ব্যক্তিগত আগ্রহকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে না পারলে শিক্ষাদান নিতান্ত যান্ত্রিক হ'য়ে পড়বে। তাই শিক্ষকের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুরাগ সৃষ্টি করতে হ'লে পাঠ্যবিষয়কে জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে তবে উপস্থাপন করতে হবে। বিষয়বস্তু নির্বাচন করার সময় শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতার কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক অনুরাগ কিসে সেদিকে শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে ও শিক্ষাক্ষেত্রে এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে কাজে লাগাতে হবে। স্বাভাবিক প্রবণতার উপরে ভিত্তি করে নতুন নতুন অনুরাগ গড়ে তুলতে হবে।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা, শিক্ষাক্ষেত্রে অনুরাগ সৃষ্টিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে একথা মনে রেখে শিক্ষার্থীদের যতদূর সম্ভব হাতে-কলমে কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক অনুরাগ সৃষ্টির জন্য বিশেষভাবে শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্য বিষয়ে অনুরাগ সৃষ্টির জন্য শিক্ষকের নিজস্ব অনুরাগ অনেকখানি দায়ী। শিক্ষক নিজে যদি পাঠে আগ্রহী না থাকেন তবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনুরাগ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হবেন তাই প্রত্যেক শিক্ষকেরই উচিত নিজের বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত থাকা ও অন্যের মধ্যে অনুরাগ সৃষ্টিতে খুব তৎপর হওয়া।

প্রশ্নাবলী

1. "Interest is latent attention ; and attention is interest in action." Discuss. Indicate the different types of attention.
(C. U. B. T. '59)

2. Discuss the relation between interest and attention. What are the different kinds of attention ? Is volitional attention possible without interest ? (C. U. B. T. '62)

3. Why is attention important in education ? Elucidate the external and internal determiners of attention.
(C. U. B. T. '70)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কাজ ও অবসাদ (Work & Fatigue)

মানুষ যত রকম প্রচেষ্টা করে থাকে, সবার মূলে একরকম মানসিকতা কাজ করে। সাধারণভাবে সভ্যতার মানদণ্ডে মানুষের কর্মক্ষমতাকে বিচার করা হয়। মানুষের শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও মানসিকতাকে বিচার করে দেওয়া হয়; কেউ বা কম পরিশ্রমে তাড়াতাড়ি শেখে আবার কেউ বা একটু দেরীতে শেখে। এই সব দিয়েই বিচার করে দেখা হয় একজনের শিখন ক্ষমতা কেমন।

কোন ব্যক্তির কর্মক্ষমতা তার শিক্ষা কাজকে প্রভাবিত করে। এখন আমরা জানব কাজ কি। পদার্থ বিজ্ঞানীরা বলেন কোন একক (unit) পরিমাণ বস্তুকে একক পরিমাণ দূরত্বে স্থানান্তরিত করার নাম কাজ। শরীর বিজ্ঞানীরা বলেছেন, যে প্রতিক্রিয়ার জন্য আমাদের স্নায়বিক শক্তি খরচ হয় তাই হ'ল কাজ। সাধারণ অর্থে যে সব প্রতিক্রিয়ার সামাজিক মূল্য আছে তাকেই আমরা কাজ বলি। এটা অবশ্য কাজের সঙ্কীর্ণ অর্থ।

প্রকৃতপক্ষে কাজ ও খেলার মধ্যে প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নেই—পার্থক্য কেবল মনোভাবগত। উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কাজকে চেষ্টিত কাজ ও অচেষ্টিত কাজ—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। চেষ্টিত কাজের পিছনে সক্রিয় মানসিক চেষ্টা থাকে কিন্তু অচেষ্টিত কাজের পিছনে তা থাকে না। কাজকে আবার দৈহিক কাজ ও মানসিক কাজেও ভাগ করা যায়। যে কাজে দৈহিক শ্রম ব্যয় হয় তাকে দৈহিক কাজ বলে, যেমন কোদাল চালান। কিন্তু এমন অনেক কাজ আছে যাতে দৈহিক পরিশ্রমের চেয়ে মানসিক শ্রম বেশী ব্যয়িত হয়; তাকে মানসিক কাজ বলে। যেমন—অঙ্ক কষা।

কাজ যেমনই হোক না কেন তার জন্য কোন না কোন শক্তি ক্ষয় হয়। তার ফলে কাজ করতে করতে কাজের ক্ষমতা ক্রমশঃ কমে যায়। দেহের পেশীগুলো আস্তে আস্তে দুর্বল হ'য়ে পড়ে।

এই কর্মক্ষমতা হ্রাসের কারণ কি? মনোবিজ্ঞানীরা বলেন সাধারণতঃ দুটো কারণে কর্মক্ষমতা কমে যায়—(১) প্রেষণার অভাব (২) অবসাদ। কর্মক্ষেত্রে

"The difference between work and play is a matter of attitude toward rather than nature of activity." —Deitze.

ব্যক্তির উৎসাহের অভাব ঘটলে কাজের ক্ষমতা ও হার কমে যায়। কাজের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি ও ব্যক্তির উপর নির্ভর করে এই প্রেষণা কতখানি হবে।

অন্য দিকে অবসাদ হ'ল কর্মক্ষমতা হ্রাসের সার্বজনীন কারণ, একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কাজ করার জন্য ব্যক্তির মধ্যে যে দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাই হচ্ছে অবসাদ। অবসাদ* কথাটার সঙ্গে বর্তমান কর্মের যোগ রয়েছে—এটা কোন স্থায়ী অবস্থা নয় বরং এটাকে সাময়িক ঘটনা বলা চলে। অবসাদকে বিরক্তির (Boredom) সঙ্গে এক করে ভাবলে ভুল হবে। বিরক্তিতে ঠিক কর্ম ক্ষমতা কমে না, কেবলমাত্র কাজ করার ইচ্ছাটা কমে যায়। কিন্তু অবসাদে কাজ করার ইচ্ছা কমে না—কর্ম ক্ষমতাটা কমে যায়।

অবসাদকে অনেক মনোবিজ্ঞানী দৈহিক ও মানসিক—এই দুই ভাগে ভাগ করার পক্ষপাতী। সাধারণতঃ পেশীঘটিত ও ইন্দ্রিয়ঘটিত অবসাদকে দৈহিক অবসাদ বলা হয়। প্রত্যেকের পরিশ্রম করার একটা সীমা আছে—সেটা ছাড়িয়ে গেলেই অবসাদ দেখা যায়। আবার মানসিক কাজও অনেকক্ষণ ধরে করলে দেখা যায় ক্রমশঃ নির্ভুল করার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। একেই মানসিক অবসাদ বলা হয়।

অবসাদের কারণ—দৈহিক ও মানসিক যে কোন রকম অবসাদের পেছনে কতকগুলো কারণ নিশ্চয়ই আছে। কারণগুলোকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়—দৈহিক কারণ, মানসিক কারণ ও পরিবেশগত কারণ

দৈহিক কারণ—কোন কাজ করার জন্য আমাদের স্নায়বিক শক্তির প্রয়োজন হয়। কাজ করতে করতে এই শক্তির ক্ষয় হয়। দেহের অন্য অংশের কাজের মাধ্যমে এই শক্তিক্ষয় স্বাভাবিক নিয়মে পূরণ হয়। কিন্তু একটানা অনেকক্ষণ কাজ করলে ক্ষয় ও ক্ষয়পূরণের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না, ফলে ক্ষয় বেশী হয় ও অবসাদ এসে যায়। স্যাণ্ডিফোর্ড বলেছেন, দেহের স্নায়ুকোষ ও পেশীগুলিতে শক্তিক্ষয় হলে অবসাদ আসে।

কোন কাজ করার ফলে দেহের মধ্যে অপচয়জনিত দূষিত পদার্থকে কিছু সময়ের মধ্যে আবার শোধন করে নেওয়া যায়। কিন্তু একনাগাড়ে কাজ করলে এই সময়ের অভাব ঘটে, ফলে দূষিত পদার্থ স্নায়ুসন্ধিতে জমে অবসাদ সৃষ্টি করে।

*"Fatigue is not an entity; it is convenient name to include different mental and physical phenomena associated with continuous work" Moore.

সাধারণতঃ শর্করাজাতীয় উপাদান দেহের শক্তি জোগায়। এই উপাদান বিশ্লেষণের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। প্রশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন আমরা গ্রহণ করি। কাজ করতে করতে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে তখন অবসাদ আসে।

শরীরের মধ্যে লবণ কমে গেলেও কর্মক্ষমতা কমে যায়। দৈহিক অসুস্থতার জন্যও রোগী অবসন্নবোধ করে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অধিক সঞ্চালনের ফলে অনেক সময় অবসাদ আসে।

মানসিক কারণ—কর্মক্ষেত্রে প্রেষণা ও অনুরাগ কমে গেলে ধীরে ধীরে কর্মপ্রেরণার অবনতি ঘটে। কোন কাজ করার জন্য যদি ভালভাবে মানসিক প্রস্তুতি থাকে তবে সহজে অবসাদ আসে না। বিশেষ করে শিক্ষাকাজে এই প্রস্তুতি একান্তভাবে প্রয়োজন, এই প্রস্তুতির অভাব ঘটলেই কিন্তু শিক্ষায় অবসাদ আসবে।

অভ্যাসের অভাবে অবসাদ আসতে পারে। কোন কাজে অভ্যাস হ'য়ে গেলে স্নায়বিক শক্তির অপচয় কমে যায়। কাজেই অনভ্যস্ত কাজে অবসাদ বেশী হয়।

মানসিক ইচ্ছার অভাব থাকলেও অনেক সময় কর্মে অবসাদ আসে।

এসব কারণ ছাড়াও কিছু পরিবেশগত কারণ আছে যার ফলে অবসাদ দেখা যায়। পরিবেশটি যদি কাজের অনুকূল না হয় তবে খুব স্বাভাবিকভাবে অবসাদ আসে। আলো-বাতাসহীন চুনবালিখসা দেয়ালযুক্ত ঘরে অনেকক্ষণ শিক্ষার্থীদের আটকে রাখলে সহজে অবসাদ আসবে।

কর্মক্ষেত্রের বাইরের পরিবেশও অনেক সময় অবসাদের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। হাটের পাশে বাড়ী হ'লে নিয়ত গোলমালে যে কোন কাজে মনোযোগের অভাব ঘটে, ফলে শীঘ্রই অবসাদ আসে। কাজের প্রকৃতি অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে বিরক্তি উৎপাদন করে এবং ঐ বিরক্তির জন্যও অবসাদ আসে।

আবহাওয়া, জলবায়ুর প্রভাবও অবসাদের আরও একটি কারণ। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের অধিবাসীরা শীতপ্রধান অঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে কম কর্মক্ষম হয়। আবার এও দেখা যায় শীতকালে কর্মক্ষমতা বাড়ে, গ্রীষ্মকালে স্নায়ু ও পেশী সহজেই অবসন্ন হ'য়ে পড়ে।

বিদ্যালয়ে অবসাদ—শিশুরা যখন বিদ্যালয়ে এসে প্রথমেই দিনের কাজ সুরু করে তখন সব কাজেই তাদের গভীর মনোযোগ ও দক্ষতা লক্ষ্য করা

যায়; কিন্তু দিনের শেষে তাদের কর্মক্ষমতা অনেকটাই কমে যায়। এর কারণ কি? এর কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন শিশুদের কর্মক্ষমতা যে কমে যাচ্ছে এটা ঠিক অবসাদের জন্য হচ্ছে না, বিশেষভাবে বিরক্তির জন্য এটা হচ্ছে। শিশুদের মনোযোগ দীর্ঘস্থায়ী নয় একথা আমরা সবাই জানি। কাজেই অনেকক্ষণ ধরে পাঠ্য বিষয়ে তারা মনোযোগ দিতে পারে না। এ সময় তাদের মনোযোগ পাঠ্যবিষয়ের চেয়ে বেশী আকর্ষণীয় অন্য কোন বিষয়ে সরে যায়। এসময় তারা পড়াশুনায় মন দিতে পারে না কিন্তু গান, বাজনা, ছবি আঁকা, খেলাধূলা প্রভৃতিতে ভালভাবে মন দিতে পারে।

মনোবিজ্ঞানী উইঞ্চ পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে যারা দিনের বেলা অন্য জায়গায় কাজ করে, রাতে পড়াশুনা করে, তাদের কর্মক্ষমতা রাতে পড়ার সময় $\frac{1}{3}$ ভাগ কমে যায়। দুপুরে টিফিনের ঠিক আগে শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষমতা সকালের থেকে অনেক কম থাকে। থর্নডাইক, হেক, মার্স প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানী এ বিষয়ে একমত।

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের অবসাদমূল্য নির্ণয় করার জন্য অনেক মনোবিজ্ঞানী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। ওয়াগনার (Wagner) অ্যাসথেসিওমিটার নামক যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে অবসাদমূল্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন:—

(অবসাদের পূর্ণমান ১০০)

বিষয়	অবসাদমূল্য
গণিত	১০০
ভাষা	৯১
ইতিহাস, ভূগোল	৮৫
প্রকৃতি বিজ্ঞান	৮০
অঙ্কন	৭৫
খেলাধূলা ব্যায়াম	৯০

অনেক মনোবিদ্ অবশ্য বলেন কোন বিষয়ের এই ধরনের অবসাদমূল্য নেই। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও পদ্ধতির জন্যই অবসাদের তারতম্য দেখা যায়। শিক্ষার্থীদের প্রেষণা, অনুরাগ ইত্যাদিও অবসাদের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবসাদের দরুণ দৈহিক, মানসিক ও

প্রাক্ষোভিক লক্ষণ কিছু কিছু দেখা যায়। দৈহিক লক্ষণ হলো ক্লান্তি, মাথাধরা, চোখে কম দেখা, কানে কম শোনা, হাইতোলা ইত্যাদি। মানসিক অবসাদের লক্ষণ হলো—মনোযোগের অভাব, ধৈর্যের অভাব, নির্ভুল গণনা শক্তির অভাব, স্মরণ করার ক্ষমতা কমে যাওয়া ইত্যাদি। অবসাদের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিছু কিছু প্রক্ষোভমূলক পরিবর্তনও দেখা যায়। বিমর্ষতা, নিরানন্দ, উত্তেজনা, খিটখিটে মেজাজ প্রভৃতি পরিবর্তন লক্ষণীয়।

অবসাদের কুফল—শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবসাদ দেখা দিলে শিক্ষার কাজ যে ব্যাহত হবে একথা বলাই বাহুল্য। শিখনের জন্য সুস্থ দেহ ও মন প্রয়োজন। কিন্তু অবসাদ দেহ ও মনকে প্রভাবিত করে। অবসাদকে ক্ষয়ের ইঙ্গিত বলা যেতে পারে এবং নতুন শক্তি সঞ্চয়ের জন্য দেহ ও মনের কাছে এটি একটি আবেদন। কিন্তু এই ক্ষয় বেশী হলেই বিপদের আশঙ্কা থাকে। শিক্ষার্থীর দেহ যদি ক্লান্ত হয়, মন অবসন্ন হয় তবে তার কাজে উৎকর্ষতা কমে যাবে, ভুলভ্রান্তি হবে, বেশীক্ষণ কোন কাজে মন দিতে পারবে না। স্মরণ করা, বিচার করা পূর্ববর্তীজ্ঞানের সঙ্গে আভ্যন্তরীন সমন্বয়ন প্রভৃতি ব্যাহত হবে। তাছাড়া অবসন্ন হওয়ার পরেও কাজ চালিয়ে গেলে পেশী, স্নায়ু, কোষ ইত্যাদির বিশেষ ক্ষতিসাধন হ'তে পারে।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের অবসাদ শিক্ষার্থীদের অবসাদের চেয়েও ক্ষতিকর। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের নিজের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। তিনি নিজে যদি একটি জলন্ত প্রদীপ হন তবেই তিনি অন্য প্রদীপ জ্বালাতে পারবেন। প্রবাদ আছে—"শিক্ষক যদি দৌড়ান তবে ছাত্ররা হাঁটবে, শিক্ষক যদি হাঁটেন তবে ছাত্ররা দাঁড়াবে, শিক্ষক যদি দাঁড়ান তবে ছাত্ররা বসবে, শিক্ষক যদি বসেন তবে ছাত্ররা শোবে, শিক্ষক যদি শোন তবে ছাত্ররা ঘুমবে।" অর্থাৎ শিক্ষক যতটা উৎসাহ দেখাবেন ছাত্ররা তার চেয়ে কিছু কম উৎসাহ দেখাবে। কাজেই শিক্ষক নিজেই উৎসাহহীন হ'লে শ্রেণীর পাঠদান ঝিমিয়ে পড়বে। তাই শিক্ষক নিজে অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে পড়লে শ্রেণীর সবাই একান্তভাবে নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়বে; শিক্ষকের মেজাজ খিটখিটে হ'য়ে যাবে; ফলে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি বিরক্ত হবেন। এইভাবে শিক্ষাকাজ প্রতিমুহূর্তে ব্যাহত হবে। পাঠদানে শিক্ষকের আগ্রহ থাকবে না। নতুন জ্ঞান আহরণেও তিনি নিস্পৃহ হ'য়ে যাবেন।

অবশ্য শিক্ষক অনেক সময় অবস্থার চাপে পড়ে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছাড়াও তিনি অন্যত্র ছাত্র পড়ান ও অন্যান্য কাজে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়। এ ছাড়া পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, অসুখে ঔষুধ ও পথ্যের অভাব ইত্যাদিতে জর্জরিত শিক্ষক কেমন করেই বা তাঁর উৎসাহ, কর্মক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখবেন? এ বিষয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের কিছু দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া প্রয়োজন।

অবসাদ দূরীকরণ—অবসাদ দূর করতে হলে অবসাদের পরিমাপ করার জন্য আজকাল নানারকম অভীক্ষার সাহায্য নেওয়া হয়। এছাড়া আছে নানারকম যন্ত্রপাতির ব্যবহার : যেমন ত্বকের স্পর্শানুভূতি মাপার জন্য অ্যাস্থিমিউমিটার, হাতের শক্তি মাপার জন্য ডাইনামোমিটার; হাতের আঙুলের পেশীর অবসাদ মাপার জন্য আরগোগ্রাফ, কাইমোগ্রাফ ইত্যাদি।

অবসাদ যে সব সময় ক্ষতিকর তা নয়। নদীর এক কূল ভাঙলে আর এক কূল গড়ে। অবসাদেও তেমনি ক্ষয় ও ক্ষয়পূরণ সাথে সাথেই চলে। ক্ষয়ের মাত্রা বেশী হলেই কেবল বিপদের আশঙ্কা, বার্ধক্যে গড়ার চেয়ে ভাঙার কাজ বেশী হয়। অন্যান্য বয়সে একটু সতর্ক থাকলে এই ভাঙা গড়ার মধ্যে একটা সমতা আনা যায়।

এখন দেখা যাক কেমন করে অবসাদ দূর করা যায়; দেহ ও মনের পরিশ্রম ছাড়া শিখন সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীদের দেহ ও মনের সামর্থ্য বয়স্কদের মত নয়, ফলে তাদের সহজেই ক্লান্তি আসে। কাজেই শিক্ষাব্যবস্থাকে সার্থক করে তুলতে হ'লে এমনভাবে শিক্ষাব্যবস্থা করতে হবে যাতে ক্লান্তি সহজে না আসে, আর যদিও ক্লান্তি এসে যায় তবে যতশীঘ্র সম্ভব দূর করতে চেষ্টা করা। তবে ক্লান্তি একবার এসে গেলে তা সহজে দূর করা যায় না। কাজেই কান্তি যাতে সহজে না আসে তার চেষ্টা করাই উচিত। যেমন—

(১) কিছুক্ষণ কাজ করার পর বিশ্রাম দিলে শরীরের ক্ষয়পূরণ হয়। ফলে ক্লান্তি দূর হয়।

(২) বিশ্রামের সাথে নিদ্রা যুক্ত হ'লে শরীর ও মনের ক্লান্তি দূর হয়—দেহও মন আবার সতেজ হয়।

(৩) পুষ্টিকর খাদ্য ও পানীয় দিলে ক্লান্তি অনেকটা দূর হয়। দুধ, গ্লুকোজ, চা, কফি, কোকো ইত্যাদি স্নায়ু ও পেশীকে সাময়িকভাবে উত্তেজিত করতে পারে।

(৪) শরীর অসুস্থ থাকলে অতি সহজে ক্লান্তি আসে। শারীরিক সুস্থতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া প্রথমে প্রয়োজন।

(৫) কোন কাজে আগ্রহ থাকলে ক্লান্তি সহজে আসতে পারে না। কাজেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করা শিক্ষকের প্রাথমিক কর্তব্য।

(৬) খুব ধীরে ধীরে কাজ করলে ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক। একটানা কাজ করে শিক্ষার্থীরা যাতে অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে।

(৭) শিখনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করতে হবে। আলো-বাতাস যুক্ত ঘর, শান্ত পরিবেশ প্রভৃতি শিখনের ক্ষেত্রে সহায়ক।

(৮) শিক্ষণীয় বিষয় কঠিন ও নীরস হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহজে ক্লান্তি আসতে পারে। তাই নীরস জিনিসকে আকর্ষণীয় করে পরিবেশন করা দরকার ও কম সময় ধরে পরিবেশন করা উচিত।

(৯) বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে পাঠদান করলে এবং পাঠদানকালে নানারকম প্রদীপন ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও মনোযোগকে অনেকক্ষণ ধরে রাখা যায়। ফলে ক্লান্তি আসতে বিলম্ব হয়।

(১০) পাঠ্যক্রমিক বিষয়ের মাঝে মাঝে সহপাঠ্যক্রমিক বিষয়, হাতের কাজ, নাচ, গান, আঁকা ইত্যাদি শেখার ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়।

(১১) কাজের সাফল্য ক্লান্তি অনেকটা দূর করে। কাজেই শিখনের প্রতি স্তরে শিক্ষার্থীকে তার সাফল্য সম্বন্ধে অবহিত করতে হবে।

(১২) শিক্ষার্থীদের কাজের বোঝা যেন বেশী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সব শেষে বলা যায় শিক্ষকের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রভাব শিক্ষার্থীদের অবসাদ দূর করবে। শিক্ষকের সহানুভূতি, স্নেহ-ভালবাসা, উৎসাহ শিক্ষার্থীদের সব সময় কাজে অনুপ্রাণিত করবে—একথা শিক্ষককে মনে রেখে শিক্ষার কাজ পরিচালনা করতে হবে।

প্রশ্নাবলী

1. What is fatigue? Discuss the various causes of fatigue.

2. Discuss the relation between work and fatigue. Discuss the impact of fatigue on School learning.

সপ্তম অধ্যায়

ব্যক্তিগত বৈষম্য (Individual difference) ।

মনোবিজ্ঞানী অলপোর্ট বলেছেন—পৃথিবীতে যতজন মানুষ আছে, মনোবিজ্ঞানীদের অনুশীলনের পদ্ধতি ও ততরকম। প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রকৃতির সঙ্গে অভিযোজন করে চলেছে। আর এই অভিযোজন করতে গিয়ে সে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি যদি ঠিকমত অনুশীলন করা না যায় তাহলে মানুষ তার জীবনের তাৎপর্য হারিয়ে ফেলবে।

তাই মনোবিজ্ঞান চায় মানব প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে অনুশীলন করতে। মনেবিজ্ঞানীরা মনে করেন ব্যক্তিগত পার্থক্য হলো প্রকৃতির ধর্ম। তাকে অস্বীকার করে মনোবিদ্যা গড়ে উঠতে পারে না। তাই ব্যক্তিগত পার্থক্যের সাধারণ নিয়ম ও কি ভাবে ব্যক্তিতে পার্থক্য হয় তা জানার জন্য "পার্থক্য অনুশীলনকারী মনোবিদ্যা" (Differential psychology) নামে মনোবিদ্যার এক বিশেষ শাখা গড়ে উঠেছে।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Human difference) ।

একজন মানুষের থেকে আর একজন মানুষের পার্থক্য নানান দিক থেকে এসে থাকে। মানুষ জন্মগতভাবে যে সব গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায় তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়—এগুলিকে বলা হয় অনর্জিত পার্থক্য। কিন্তু মানুষ চেষ্টা করে, অভিজ্ঞতার সাহায্যে যে সব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করে; তাদের মধ্যেও অনেক পার্থক্য বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে। এই পার্থক্যকে অবশ্য অর্জিত গুণগত পার্থক্য বলা হয়।

অনর্জিত পার্থক্যের মধ্যে পড়ে দৈহিক পার্থক্য মানসিক পার্থক্য ও মেজাজগত পার্থক্য।

দৈহিক পার্থক্য—অমরা দেখতে পাই প্রত্যেক মানুষেরই দুটোহাত; দুটো পা, দুটো কান, দুটো চোখ আছে কিন্তু তবুও প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে আলাদা। কারণ প্রত্যেকের ওজন, উচ্চতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, দৈহিক শক্তি, কর্মক্ষমতা, স্থৈর্য, সাধারণ অবয়ব গায়ের রঙ, গলার স্বর, অঙ্গ ভঙ্গী ইত্যাদি আর একজনের থেকে আলাদা।

মানবিক বৈষম্য (Mental Difference)।

মনোবিজ্ঞানীরা গালটন ব্যক্তির মধ্যে যে সংবেদনগত পার্থক্য আছে তার উপর পরীক্ষা করেছেন। প্রত্যক্ষণের বিভিন্নতা অনুযায়ী মানুষকে শ্রেণীবিভাগ করারও প্রথা প্রচলিত আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কাউকে মনে হয় বিশ্লেষক প্রকৃতির আবার কাউকে মনে লয় সংশ্লেষক প্রকৃতির। যে সব ব্যক্তি বিশ্লেষক প্রকৃতির তারা সব জিনিসের অংশগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখে। কিন্তু সংশ্লেষক প্রকৃতির ব্যক্তিরা সব জিনিসের একটা সামগ্রিক রূপে দেখে জ্ঞানলাভ করে।

প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত আর একরকম মানসিক ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কোন জিনিষ প্রত্যক্ষ করার ফলে সেই জিনিসের ভাবমূর্তি (Image) তৈরী হয়; বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এই ভাবমূর্তি গড়ে উঠে। কেউ চোখে দেখে, কেউ বা কানে শুনে ভাবমূর্তি গঠন করে। এই ভাবমূর্তি অনুসারে মানুষকে দর্শনধর্মী (Visile) শ্রবণধর্মী (Audile) স্পর্শধর্মী (Tactile) ইত্যাদিতে ভাগ করা যায়।

কোন উদ্দীপক দেখার পর মানুষ প্রতিক্রিয়া করে; উদ্দীপকের উপস্থিতি ও মানুষের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কিছু সময়ের ব্যবধান আছে—এই সময়কে প্রতিক্রিয়া সময় (Reaction Time) বলা হয়। প্রতিক্রিয়া সময়ের দিক বিচার করলে দেখা যায় প্রত্যেক ব্যক্তি আলাদা। যেমন একজন মোটর চালক গাড়ীর সামনে রাস্তায় হঠাৎ কিছু এসে গেলে তৎক্ষণাৎ ব্রেক কষতে পারে, আবার অন্যজনের বেলায় দেখা যায় চেষ্টাকরে ব্রেক কষার আগেই চাপা দিয়ে ফেলে। এই যে দুজনের মধ্যে তফাৎ তা হলো প্রতিক্রিয়া সময়ের জন্য।

আমরা জানি স্মরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে বিভিন্ন দিক আছে; যেমন শিখন (learning) সংরক্ষণ (Retention) পুনরুদ্রেক (Recall) ও প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition)। এইসব দিক থেকেও ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। কেউ তাড়াতাড়ি শিখতে পারে, ও অনেকদিন মনে রাখতে পারে, এবং ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসকে মনের কোন থেকে টেনে বার করতে পারে, কোন আগের দেখা জিনিস দেখলে চিনতে পারে। আবার কেউ বা এর বিপরীত প্রক্রিয়াতে বেশী অভ্যস্ত।

ধারণা গঠন করার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পার্থক্য আছে। ধারণা

গঠন অন্যান্য মানসিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। কোন শিক্ষার্থী পাঠ্যবিষয় থেকে সহজে ধারণা গঠন করতে পারে আবার অনেকে তা পারে না।

বর্তমানে যে সব অনুরাগ অভীক্ষা বেরিয়েছে তা থেকে পরীক্ষা করে জানা গেছে যে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে অনুরাগের পার্থক্য আছে। তাছাড়া বয়সভেদে অনুরাগ বিভিন্ন হয়। কারও সাহিত্যে, কারও শিল্পে, কারও সিনেমায়, কারও বা বিজ্ঞানে অনুরাগ দেখা যায়।

কল্পনা অনুসারে ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্নতা দেখা যায়। কারও মধ্যে দেখা যায় সৃজণাত্মক (Creative) কল্পনা, কারও মধ্যে গ্রহণাত্মক (Receptive) কল্পনা, কারও মধ্যে বৈজ্ঞানিক (Scientific) কল্পনা আবার কারও মধ্যে ঐতিহাসিক (Historical) কল্পনা প্রাধান্য লাভ করেছে দেখা যায়।

মানসিক ব্যক্তিবৈষম্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানসিক ক্ষমতা হলো বুদ্ধি। এই বুদ্ধির উপরই অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়া অনেকাংশে নির্ভর করে। কোন কোন মানুষ উন্নত মানসিক চিন্তা করার ক্ষমতা নিয়ে জন্মান ; আবার কেউ বা কোনরকম বিচার বুদ্ধির কাজ করতে পারে না। আধুনিক কালে নানারকম অভীক্ষার সাহায্যে মনোবিদগণ বুদ্ধি পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছেন ; বুদ্ধির পরিমাণ বোঝানোর জন্য বুদ্ধ্যঙ্ক শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বুদ্ধির মত সাধারণ ক্ষমতা ছাড়াও কতকগুলি বিশেষ মানসিক ক্ষমতার ক্ষেত্রেও ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য থাকে। যেমন কোন ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় সঙ্গীতের ক্ষমতা (Musical ability), কারও মধ্যে যান্ত্রিক ক্ষমতা (Mechanical ability), ইত্যাদি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

মনোযোগের দিক থেকে বিচার করলেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য চোখে পড়ে। মনোযোগের পরিসর (Span), মনোযোগের চঞ্চলতা (Fluctuation) ইত্যাদি প্রত্যেক ব্যক্তির আলাদা।

মেজাজ গত পার্থক্য (Temperamental difference)

মেজাজ কথাটা হাল্কাভাবে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়, যদিও আমরা জানি দুটোর মধ্যে বেশ সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্য আছে বহু। কোন জন্মগত দৈহিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্যক্তিত্বের যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায় তাকেই বলা হয় মেজাজ। কোন ব্যক্তি অন্তর্মুখী (Introvert), কেউ একান্তভাবে বহির্মুখী (extrovert) আবার কেউ বা উভয়মুখী (ambivert)।

অর্জিত গুণগত পার্থক্য—অর্জিত গুণগত পার্থক্যের মধ্যে পড়ে সামাজিক বৈষম্য, কৃষ্টিমূলক বৈষম্য, প্রাক্ষোভিক বৈষম্য, শিক্ষাগত বৈষম্য ইত্যাদি।

সামাজিক বৈষম্য (Social difference)

শিশু সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ও কর্মগ্রহণ করে। শিশুর সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, আচার-আচরণ সমাজের নিয়ম-কানুন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। শিশু যে পরিবারে জন্মায় সেই পরিবারের বয়স্কদের আচরণ শিশুর আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তারপর বিদ্যালয়ের প্রভাবও তাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিচালকদের প্রভাব ও সহপাঠীদের প্রভাব শিশুর জীবনে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এরপর আসে বৃত্তিগ্রহণ ও বৃহত্তর সমাজ। ব্যক্তি ও সমাজ দুই-ই পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের কাজের অভ্যাসেরও পার্থক্য দেখা যায়, অবসর যাপনের পার্থক্য দেখা যায়, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রতি মনোভাবের পার্থক্য দেখা যায়। এগুলিকে সামাজিক বৈষম্য বলা হয়।

কৃষ্টিমূলক বৈষম্য (Cultural difference)

সামাজিক পরিবেশের মত প্রাকৃতিক পরিবেশও আমাদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের জন্য অনেকাংশে দায়ী ; এই পার্থক্য হলো কৃষ্টিমূলক পার্থক্য। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষের পোষাক, খাদ্যাভ্যাস, মানসিক প্রবণতা ইত্যাদি শীতপ্রধান দেশের মানুষদের থেকে আলাদা।

প্রাক্ষোভিক বৈষম্য (Emotional difference)

প্রক্ষোভ ও সেন্টিমেন্ট বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনে বিভিন্নরকম দেখা যায়। কেউ অল্পে কাঁদে, অল্প রেগে যায়, অল্পে আনন্দে গড়িয়ে পড়ে আবার কেউ তা করে না। কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যখন প্রক্ষোভগুলো আবর্তিত হয় তখনই তা সেন্টিমেন্টের রূপ নেয়। বস্তু, ব্যক্তি ও ধারণার জন্যই সেন্টিমেন্ট বিভিন্ন রকমের হয়। কোন বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্র করে একজনের আনন্দ হয় অন্যের আবার রাগ বা দুঃখ হয়।

শিক্ষাগত বৈষম্য (Educational difference)

বিভিন্ন ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা বিভিন্ন হতে বাধ্য। বিদ্যালয়ের একই পাঠ্যক্রমের অধীনে থেকেও বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিন্ন

ভিন্ন রূপ নেয়। অনেক সময় সুযোগের অভাবে শিক্ষাগত পার্থক্য আসে বলে অনেকে মনে করেন, কিন্তু সমান সুযোগ পেলেও সব শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত মান সমান হয় না।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের কারণ (Causes of individual difference)

ব্যক্তিগত বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানী, দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের চিন্তার অন্ত নেই। কেউ কেউ বলেন ব্যক্তিগত বৈষম্যের জন্য বংশগতি (Heredity) দায়ী। আবার কেউ বা বলেন ব্যক্তিগত বৈষম্য নির্ধারণ করে শিশুর পরিবেশ। এই দুই চরম মতবাদীদের তর্কজালে নিজেদের না জড়িয়ে আমরা বলতে পারি মানুষে মানুষে পার্থক্য এই দুই প্রক্রিয়ার পারস্পরিক প্রভাবে ঘটে থাকে।

মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্য, মানসিক বৈশিষ্ট্য, মেজাজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বংশগতি হ'ল প্রাথমিক উপাদান। কিন্তু সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু মানুষকে অনুশীলন করতে গিয়ে দেখা গেছে—এই দুই প্রভাব দিয়ে সব সময় ব্যক্তিগত পার্থক্যের কারণ নির্ণয় করা যাচ্ছে না। যেমন নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্যকে পরিবেশের প্রভাব বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। আবার দেখা যায় একই বংশগতির অধিকারী অথচ তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্য আছে, সেখানে বংশগতির ব্যাখ্যা তেমন ফলপ্রসূ নয়। কাজেই ব্যক্তিবৈষম্যের ঠিক ঠিক কারণ খুঁজে বার করা একটা সমস্যা।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের শিক্ষামূলক তাৎপর্য (Significance of individual difference in education)

মনোবিজ্ঞানের পার্থক্যভিত্তিক শাখা (Differential psychology) মানুষের পার্থক্যের নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করে। আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্যই হলো ব্যক্তিগত পার্থক্যকে স্বীকার করা ও ব্যক্তিগত বৈষম্য অনুসারে শিক্ষার কাজ পরিচালনা করা। শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশে শিক্ষা হবে একমাত্র সহায়ক। কাজেই শিক্ষার্থীর নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী তাকে জীবন-বিকাশে সাহায্য করতে হবে। সুতরাং, এই কাজ করতে গেলে শিক্ষার্থীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কি তা প্রথমে জানতে হবে ও তা অনুশীলন করতে হবে।

শিশু যখন বিদ্যালয়ে প্রথমে আসে তখন তার মধ্যে কতকগুলো অর্জিত ও

কতকগুলো অনর্জিত বৈশিষ্ট্য থাকে। অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলো কি তা শিক্ষক জানার চেষ্টা করবেন। তবেই তিনি সার্থকভাবে তাকে শিক্ষা দিতে পারবেন। আজকাল এই ব্যক্তি বৈষম্যের নীতির বহুল প্রয়োগ শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। এই নীতির উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীর পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতি ঠিক করা হয়ে থাকে।

অতি আধুনিক কালের বহুমুখী পাঠ্যক্রম এই ব্যক্তি বৈষম্যের নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার রুচি, সামর্থ্য, বৈশিষ্ট্য অনুসারে মনের মত বিষয় বেছে নিতে পারে ও তা ভালভাবে অনুশীলন করতে পারে।

শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রেও এই ব্যক্তিবৈষম্যের নীতি নানারকম পরিবর্তন এনেছে। ডাল্টন পদ্ধতি, গবেষণা পদ্ধতি, কার্যসমস্যা পদ্ধতি ইত্যাদিতে শিক্ষার্থীকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, ফলে শিক্ষার্থীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পরিপূর্ণ বিকাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বর্তমানের পাঠ্যক্রমে সহপাঠক্রমিক বিষয়গুলি বিশেষভাবে গুরুত্বলাভ করেছে। খেলাধূলা, গানবাজনা, সাহিত্যচর্চা, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদির মধ্যে দিয়েও শিক্ষার্থী আপন বৈশিষ্ট্য প্রকাশের বিশেষ সুযোগ পেয়ে থাকে।

এখন বিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেকখানি প্রসারিত হয়েছে। কোন শিশুর শিক্ষার ভারই কেবল বিদ্যালয় নেয় না তার বৃত্তিমূলক নির্দেশনাও আজ বিদ্যালয়ের উপরে অর্পিত হয়েছে। কাজেই বিদ্যালয়কে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচনে সাহায্য করতে হবে।

আবার দেখা যায় যন্ত্রসভ্যতার বিজয় যাত্রার ফলে মানুষের মিলেছে কিছু অবসর। এই অবসর যাপন করতে না শিখলে মানুষ তার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে, একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে হাঁপিয়ে উঠবে। তাই অবসর বিনোদন করার জন্যে চাই উপযুক্ত শিক্ষা; আর এই শিক্ষা বিদ্যালয়কেই দিতে হবে। এখানেও তাই প্রত্যেক ব্যক্তির আগ্রহ, অনুরাগ, মনোযোগ ইত্যাদির খবর রাখতে হবে বিদ্যালয়কে।

এইভাবে আমরা দেখছি শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্র আজ ব্যক্তি বৈষম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নীতিকে উপেক্ষা করলে শিক্ষার্থী আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হবে।

প্রশ্নাবলী

(1) Write an essay on individual difference and their educational implications.

(2) What is meant by individnal difference? Discuss the major characteristics in which individuals differ.

অষ্টম অধ্যায়

বুদ্ধি ও তার পরিমাপ

(Intelligence and its measurement)

আমরা সাধারণভাবে দেখতে পাই সমাজের কোন কোন মানুষ খুব সহজভাবে জীবনের সব সমস্যার সমাধান করতে পারে ; নতুন পরিবেশে সহজে মানিয়ে নিতে পারে, এঁদের আমরা বলি বুদ্ধিমান। আবার কাউকে হাজার চেষ্টা করেও স্বাভাবিক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মত কর্মক্ষম ক'রে তোলা যায় না। এদের আমরা বলি নির্বোধ। তবে নির্বোধ বলতে কিন্তু একেবারে বুদ্ধি নেই এমন কথা বলা হচ্ছে না—এদের বুদ্ধি সাধারণ মানুষের . .ের থেকে অনেক কম।

এখন প্রশ্ন হলো বুদ্ধি কি? বুদ্ধি এমন একটা ক্ষমতা যাকে সংজ্ঞায় রূপ দেওয়া কঠিন। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে বুদ্ধির সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বুদ্ধির সংজ্ঞাগুলি মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা হয় যেমন—(১) জৈবিক সংজ্ঞা (Biological definition) (২) শিক্ষামূলক সংজ্ঞা (Educational definition) (৩) মানসিক ক্ষমতা (Faculty definition) (৪) পরীক্ষানির্ভর সংজ্ঞা (Empirical definition).

---

(1) "Intelligence is the power of recognition and hearing"- Galton.

(2) Ebbinghaus—"Intelligence is the capacity to complete the parts into a whole".

3. Stout—"Intelligence is the power of attention."

4. Stern—"Intelligence is capacity to adopt to relatively new situations".

জৈবিক সংজ্ঞা—বুদ্ধির যে সংজ্ঞাগুলিতে মানুষের অভিযোজনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেইগুলিকে জৈবিক সংজ্ঞা বলা হয়। মনোবিজ্ঞানী স্টার্ন বলেন—"জীবনের নতুন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করার ক্ষমতা হলো বুদ্ধি। প্যাটারসান বলেছেন—'বুদ্ধি হ'ল এমন এক জৈবিক কৌশল যার সাহায্যে কোন জটিল উদ্দীপক, নানা পরিস্থিতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এক একটি প্রতিক্রিয়া করে।

(২) শিক্ষামূলক সংজ্ঞা—এই জাতীয় সংজ্ঞাগুলিতে মানুষের শিখন ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মনোবিজ্ঞানী হোলিংওয়ার্থ বলেছেন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার চাহিদা অনুসারে শিখতে পারে। বাকিংহাম বলেন—শিখনের ক্ষমতাই হ'ল' বুদ্ধি।

(৩) মানসিক ক্ষমতা সংক্রান্ত সংজ্ঞা—থর্নডাইক বুদ্ধিকে আদর্শ প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা হিসেবে দেখেছেন। ব্যালার্ড বলেছেন—একই ধরনের অনুরাগ, জ্ঞান ও পরিবেশের মধ্যে মনের আপেক্ষিক ক্ষমতা হ'ল বুদ্ধি। বিনে বলেছেন, বুদ্ধি হ'ল বোধগম্যতার সম্পূর্ণতা, আবিষ্কারের ক্ষমতা, একাগ্রতা ও বিশ্লেষণমূলক চিন্তাক্ষমতার সমবায়ে গঠিত।

(৪) পরীক্ষা নির্ভর সংজ্ঞা—মনোবিজ্ঞানীরা থার্সটোন বলেন, বুদ্ধি হ'ল প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে জীবনযাপনের ক্ষমতা। সিরিল বার্টও এই ধরনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—ব্যক্তির জৈব মানসিক সংগঠনের মধ্যে পুনর্বিন্যাস করে অপেক্ষাকৃত নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ক্ষমতাই হ'ল বুদ্ধি।

সবগুলি সংজ্ঞা থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা গেছে যে কোন সংজ্ঞাই বুদ্ধিকে ঠিকমত প্রকাশ করতে পারে নি। অতি আধুনিক কালের মনোবিজ্ঞানীরা তাই বুদ্ধির সংজ্ঞা নির্ণয় করার থেকে বুদ্ধির বিবরণ দেওয়ার পক্ষপাতী। বুদ্ধির বিবরণ ও সংজ্ঞা থেকে বুদ্ধির কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয়েছে।

5. Terman—"Intelligence is capacity for abstract thinking."

6. Thorndike—"Intelligence is the power of good response from the point of view of truth or fact."

7. Cyril Burt—"Intelligence is a natural inborn and comprehensive mental capability."

(১) বুদ্ধি হল মৌলিক মানসিক শক্তি।

(২) বুদ্ধি পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে সাহায্য করে।

(৩) বুদ্ধি কোন বস্তু বা অবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করে।

(৪) বিমূর্ত চিন্তাশক্তি ও চিন্তাশক্তির উন্নত ব্যবহার করে।

(৫) বুদ্ধি মানসিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

(৬) বুদ্ধি মানসিক কাজ দ্রুত সম্পাদন করে।

(৭) বুদ্ধির উপর বংশগতির প্রভাব আছে।

(৮) বুদ্ধি মানুষের শিখনে সাহায্য করে।

(৯) বুদ্ধি অন্যান্য মানসিক ক্ষমতার চেয়ে অনেক ব্যাপক। বুদ্ধির প্রচেষ্টা বিচিত্রধর্মী ও কর্মপরিধি সীমাহীন।

(১০) বুদ্ধি অতীত জ্ঞানকে বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারে।

মনোবিজ্ঞানী ষ্টডার্ড বুদ্ধির নয়টি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে বুদ্ধির একটা বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বুদ্ধির গুণগুলি হল (১) কাঠিন্য (Difficulty) (২) জটিলতা (Complexity) (৩) বিমূর্ততা (Abstractness) (৪) পরিমিত প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা (Economy) (৫) উদ্দেশ্যমুখী অভিযোজনের ক্ষমতা (Adaptiveness to a goal) (৬) সামাজিক মূল্য (Social value) (৭) সৃজনধর্মিতা (Emergence of original) (৮) একাগ্রতা (Concentration) ও প্রাক্ষোভিক প্রতিরোধ (Emotional resistance)। তাঁর বর্ণনামূলক বিবরণটিকে এইভাবে বলা যায়—কঠিন জটিল পরিস্থিতিতে প্রাক্ষোভিক শক্তির প্রতিরোধকে অতিক্রম করে, একাগ্রতার সঙ্গে স্বল্প শ্রমে সামাজিক মূল্যসম্পন্ন উদ্দেশ্যমুখী সৃজনাত্মক কাজ করার ক্ষমতাই হল বুদ্ধি।

বুদ্ধি সম্পর্কে আধুনিক ধারণা—আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধিকে বিভিন্নভাবে ভাগ করতে চান। যেমন ক্যাটেল বুদ্ধিকে দুভাগে ভাগ করেছেন—তরুণবুদ্ধি (Fluid) ও কেলাসিত বুদ্ধি (Crystalised)। অনেকে আবার বুদ্ধিকে জন্মগত ও প্রকাশ মান—এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। ভার্নন বলেছেন, বুদ্ধির বিভিন্ন অভীক্ষা দ্বারা আমরা যে বুদ্ধিকে সংখ্যাগত পরিমাণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি সেটাকেও বুদ্ধি হিসেবে বুঝি।

বুদ্ধি সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্ব (Different theories of Intelligence)

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধির প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করে নানান

তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। এই তত্ত্বগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) রাজতন্ত্র (Monarchic view) (২) সামন্ততন্ত্র (Oligarchic view) (৩) অরাজকবাদ (Anarchic view)।

রাজতন্ত্রমূলক ধারণা—বুদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে রাজতন্ত্রবাদীরা বলেন—বুদ্ধি এমন একটি কেন্দ্রীয় মানসিক শক্তি যা মানুষের সব কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। বুদ্ধি যেন মনের রাজা, অন্যান্য শক্তি তার প্রজা।

সামন্ততন্ত্রবাদ—এই মতবাদে বুদ্ধির সার্বজনীন একক ক্ষমতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে কতকগুলো বিশেষ মানসিক ক্ষমতা আমাদের বিভিন্ন আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই সব ক্ষমতার সমষ্টিকেই আমরা সাধারণভাবে বুদ্ধি বলি। এই মতবাদের সঙ্গে মানসিক শক্তিবাদের খুব মিল আছে।

অরাজকবাদ—মানুষের মন কতকগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ উপাদানে গঠিত। বুদ্ধি বলতে আমরা কোন একক শক্তিকে বুঝি না; বুদ্ধির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য উপাদান আছে, তারা বিশেষ পরিস্থিতিতে যে ভাবে কাজ করে তাকেই বুদ্ধি বলা হয়।

(ক) স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদানতত্ত্ব (Spearman's Two Factor Theory)

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত বৃটিশ মনোবিজ্ঞানী স্পীয়ারম্যান একটি যুক্তি নির্ভর তত্ত্ব জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন প্রত্যেক ব্যক্তির কাজের পিছনে দুটি ভিন্ন জাতীয় ক্ষমতা আছে—একটি হল সাধারণ ক্ষমতা g (general ability), অন্যটি হল বিশেষ ক্ষমতা s (specific ability)। 'g' শক্তি সমস্ত কাজেই ব্যবহৃত হবে, যদিও তার পরিমাণ সব কাজে এক হবে না। 's' শক্তি হল কোন বিশেষ কাজের উপযুক্ত বিশেষ ক্ষমতা এবং সেই বিশেষ কাজটি ছাড়া 's'-এর প্রয়োগ হবে না। প্রত্যেক কাজের জন্য আলাদা 's' আছে—অঙ্ক কষা কাজের জন্য 's', বিচার করা কাজের জন্য 's', পড়ার কাজের জন্য 's' ইত্যাদি।

কোন একটা কাজের জন্য ব্যক্তি তার 'g'র ভাণ্ডার থেকে 'g'র কিছুটা নেয়, আর সেই বিশেষ কাজটির জন্য 's' নিয়ে তবে কাজটি শেষ করে। ধরা যাক্ অঙ্ক কষা—'g'র কিছু অংশ + অঙ্ক কষা কাজের জন্য 's' লাগে।

দ্বি-উপাদানতত্ত্বের অসম্পূর্ণতা—স্পীয়ারম্যান বলেছেন সব কাজের মধ্যে 'g' থাকে এবং বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ক্ষমতা 's' থাকে। কিন্তু পরে পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে এই দুই শক্তি ছাড়া আরও একরকম শক্তি আছে, যেগুলি 'g'র মত সব কাজে লাগে না, আবার 's'এর মত বিশেষ কাজেও সীমাবদ্ধ নয়। এইগুলি বিশেষ এক শ্রেণীভুক্ত কাজ করার সময় দেখা যায়। একে 'g' ও 's' এর মাঝামাঝি এক রকম শক্তি বলা হয়। এক বিশেষ শ্রেণীর কাজ করার জন্য এই শক্তিগুলি ব্যবহৃত হয় বলে এগুলিকে শ্রেণীমূলক শক্তি (Group factor) বলা হয়। যেমন ভাষামূলক শক্তি (Verbal ability); এটিযে 'g'র মত সব কাজ পাওয়া যায় না বটে তবে ভাষাঘটিত যত কাজ আছে যেমন লেখা, পড়া, মুখস্থ করা, বিচার করা ইত্যাদিতে কিছু না কিছু পরিমানে দেখা যায়। এই রকম আরও কতকগুলো শক্তি হ'ল গাণিতিক শক্তি, যান্ত্রিক শক্তি ইত্যাদি।

(খ) টমসনের বাছাই তত্ত্ব ও অন্যান্য তত্ত্ব (Thompson's sampling theory and other theories)

গডফ্রে টমসন নামে একজন বৃটিশ মনোবিজ্ঞানী কেবলমাত্র দলগত উপাদান দিয়ে বৌদ্ধিক কাজের সহগতিকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের মন কতকগুলো মৌলিক সূক্ষ্ম নিরপেক্ষ উপাদানের সমবায়ে গঠিত। যে কোন কাজ করার জন্য এদের মধ্যে কতকগুলি উপাদানের প্রয়োজন হয়। কি ধরনের মৌলিক উপাদান প্রয়োজন তা নির্ভর করবে কাজটির প্রকৃতির উপর। কোন কাজে কত পরিমাণ এই উপাদান প্রয়োজন হবে ও কোন কোন উপাদান লাগবে তা নির্ভর করবে এই বাছাই নীতির উপর। যখন আমরা কোন মানসিক কাজ করি তখন অসংখ্য শক্তিকণার মধ্যে কতকগুলি একসঙ্গে জোট বাঁধে, ফলে আমরা কাজটা ধরতে পারি।

(গ) থার্ষ্টোনের বহু উপাদান তত্ত্ব (Multiple factor theory of Thurstone)

মার্কিন মনোবিজ্ঞানী থার্ষ্টোন বলেন, বুদ্ধি কতকগুলি মৌলিক শক্তির সম্মিলিত রূপ। প্রত্যেক ব্যক্তির কাজের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক উপাদান থাকে; বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন মৌলিক উপাদান দেখা যায়। থার্ষ্টোন এরকম সাতটি মৌলিক উপাদানের কথা বলেছেন। সেগুলি হচ্ছে—

(১) ভাষাবোধ (Verbal comprehension বা V)
(২) সংখ্যা ব্যবহার (Number facility বা N)
(৩) স্মরণ (Memory বা M)
(৪) আগমনমূলক বিচার করণ (Inductive Reasoning বা R)
(৫) উপলব্ধিমূলক শক্তি (Perceptual Ability বা P)
(৬) অবস্থানমূলক ধারণা (Space-factor বা S)
(৭) ভাষা উৎকর্ষ (Word fluency বা W)

এই সাতটি শক্তি যে সব কাজেতে দরকার হয় তা নয়, সাতটির মধ্যে বিশেষ কয়েকটা শক্তি একত্রিত হয়ে কোন একটি কাজ সম্পন্ন করে, আবার অন্য কয়েকটি শক্তি একত্রিত হয়ে অন্য একটি কাজ করে।

(ঘ) গিলফোর্ডের বুদ্ধির সংগঠন সংক্রান্ত তত্ত্ব (Guilford's theory on the structure of Intellect)

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গিলফোর্ড ১৬ বছর গবেষণা করে ৪০টি বিবরন প্রকাশ করেন। বুদ্ধির উপাদানগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করে বলেন, বুদ্ধির তিনটি মাত্রা (Three-dimension) আছে। মাত্রা তিনটি হ'ল (১) প্রক্রিয়াগত মাত্র (Operational dimension) (২) বিষয়বস্তুগত মাত্রা (Content dimension) এবং (৩) ফলাফলের মাত্রা (Dimension of Product)। গিলফোর্ডের এই তত্ত্বে থার্ষ্টোনের মতবাদকে যেন খানিকটা বিস্তৃত করা হয়েছে। তবে শুধুমাত্র বুদ্ধি নয়। মানুষের সব ক্ষমতাকে এই তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

বুদ্ধির পরিমাপ (Measurement of Intelligence)

বুদ্ধির স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জানার পর স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এই মানসিক ক্ষমতা কিভাবে পরিমাপ করা যায়? বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর মধ্যে বুদ্ধির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি নিয়ে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা গেলেও বুদ্ধি পরিমাপের ব্যাপারে কিন্তু তাঁরা সকলে একমত।

প্রাচীন পন্থীদের ধারণা ছিল মানসিক ক্ষমতা পরিমাপ করা যায় না। তাঁরা মনে করতেন বুদ্ধি ও দৈহিক গঠনের মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। যেমন ফ্রেনোলোজির (Phrenology) মূল বক্তব্য হ'ল মানুষের মাথার খুলির

আকারের সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক আছে। মাথার খুলি বড় হলে বুদ্ধি বেশী হয়। ফিজিয়গ্‌নমি (Physiognomy) বলে, মুখের অবয়ব থেকে মানসিক ক্ষমতা পরিমাপ করা যায়। গ্রাফোলজিতে (Graphology) হাতের লেখা বিশ্লেষণ করে মানসিক ক্ষমতাকে পরিমাপ করার চেষ্টা করা হোতো। কিন্তু এগুলি সবই ছিল অনুমান সাপেক্ষ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মনোবিদ্যাকে পরিপূর্ণভাবে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করা হয়। তখন থেকেই বুদ্ধিকে বিজ্ঞান সম্মতভাবে পরিমাপ করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। বুদ্ধিকে প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে পরিমাপ করার পন্থা বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে; একে বলা হয় বুদ্ধির পরীক্ষা (Intelligence test)।

বিঁনে-সাইমন অভীক্ষা (Binet-Simon scale)।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্যের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা বিশেষ প্রবণতা ও প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল। এই বিষয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে ফরাসী মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড বিঁনে ও তাঁর সহকর্মী ডাক্তারে সাইমন বুদ্ধি পরিমাপের জন্য এক বিজ্ঞান সম্মত অভীক্ষা প্রকাশ করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁরা প্রথম একটি বিজ্ঞান সম্মত স্কেল পরিমাপক অভীক্ষা তৈরী করেন। এতে সম া ছিল ৩০, এগুলি ক্রমকঠিন অনুসারে সাজন ছিল বলে একে স্কেল বলা হয়। ৩ থেকে ১১ বছরের ৫০ জন স্বাভাবিক ছেলেমেয়ে ও কিছু ক্ষীণবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে বিভিন্ন প্রশ্নের কাঠিন্য নির্ণয় করা হয়েছিল। অভীক্ষাটিতে নানা রকমের প্রশ্ন ছিল, কিন্তু বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল বোধশক্তি (comprehension) বিচার করণ (judgment) ও যৌক্তিকতার (reasoning) উপর।

বিঁনে বুঝতে পেরেছিলেন যে বয়স অনুসারে একটা সঠিক মাপকাঠি বা নর্ম (norm) ঠিক করতে না পারলে অভীক্ষাকে ঠিক স্কেল বলা যায় না। বুদ্ধির মাত্রা স্থির করা হবে এই নর্মের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করে। কাজেই বিঁনে-সাইমন ১৯০৮ সালে প্রশ্নগুলোর পরিবর্তন ও সংশোধন করেন ও শিশুদের বয়স অনুসারে প্রশ্নগুলোকে কতকগুলি ভাগে ভাগ করেন। এই অভীক্ষাটিতে ৫৮টি সমস্যা ছিল। এতে ৩—১৩ বছরের শিশুদের বুদ্ধি মাপা যেত। তিন

বছরের শিশুর জন্ম নির্দিষ্ট প্রশ্ন তিন বছরের শিশু সবগুলির উত্তর দিতে পারবে। এইভাবে প্রত্যেক বয়সের জন্ম নির্দিষ্ট প্রশ্ন সেই বয়সের শিশুর সবগুলি পারার কথা। একটি পাঁচ বছরের শিশু যদি পাঁচবছরের শিশুর জন্ম প্রস্তুত সবগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তবে এই শিশুটির মানসিক বয়স পাঁচ—এটা ধরে নিতে হবে। এই অভীক্ষাতে প্রথম মানসিক বয়সের প্রচলন করা হয়েছে। এই অভীক্ষাটি হ'ল একটি স্কেল।

কিন্তু এই স্কেলটিরও নানাভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। কেউ বলেন স্কেলটির নিম্নপ্রান্ত বেশী সহজ ও উচ্চতর প্রান্ত বেশী কঠিন। এতে প্রাপ্ত বয়স্কদের বুদ্ধি মাপা যায় না। ফলে ১৯১১ সালে স্কেলটির আবার সংস্কার সাধন করতে হয়। এই অভীক্ষাতে সমস্যা ছিল ৫৪টি। এগুলির সাহায্যে তিন বছরের শিশু থেকে পূর্ণ বয়স্ক মানুষের বুদ্ধি মাপার জন্ম ব্যবস্থা হয়েছিল। এখানে বিনে একটি নতুন জিনিস সংযোজন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কোন শিশুর মানসিক বয়স (mental age) যদি তার সময়গত বয়সের (chronological age) সমান হয় তবে তার বুদ্ধি স্বাভাবিক, যদি কম হয় তবে সে অল্পবুদ্ধি এবং যদি বেশী হয় তবে সে বুদ্ধিমান বলে বিবেচিত হবে। বুদ্ধির পরিমাপ করা হবে সময়গত বয়স ও মানসিক বয়স—এই দুই বয়সের পার্থক্য অনুসারে।

১১১৯ সালের সমস্যার উদাহরণ

১। তিন বছরের শিশুর জন্য নির্দিষ্ট সমস্যা।

(ক) নাক, মুখ, চোখ দেখাও।

(খ) নিজের পদবী বল।

(গ) কোন ছবির বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা দাও।

২। ছয় বছর শিশুদের জন্য সমস্যা।

(ক) সকাল ও বিকালে পার্থক্য কোথায়?

(খ) একখণ্ড হীরে দেখে তার আকার নকল করা।

৩। পনর বছরের কিশোরের জন্য সমস্যা।

(ক) সাত অঙ্ক বিশিষ্ট একটা সংখ্যা শুণে তা বলতে বলা।

(খ) প্রদত্ত কোন ঘটনার ব্যাখ্যা করতে বলা।

(গ) কোন ছবির ব্যাখ্যা করতে বলা।

(ঘ) তারিখ, মাস ও বছর বলতে বলা ইত্যাদি

স্ট্যানফোর্ড বিঁনে বুদ্ধি অভীক্ষা (Stanford Binet Intelligence Test)

১৯১৬ সালে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টারম্যান বিঁনের অভীক্ষায় কিছু দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য করে সেগুলোকে সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। এটিকেই স্ট্যানফোর্ড-বিঁনে পরীক্ষা বা স্ট্যানফোর্ড সংস্করণ বলা হয়। এতে মোট ৯০টি সমস্যা ছিল। পুরনো অনেক সমস্যা বাদ দিয়ে এতে নতুন অনেক সমস্যা যোগ করা হয়। প্রত্যেক সমস্যার জন্যে স্কোর ছিল ২ মাস, ৩ মাস, ৪ মাস করে। প্রশ্ন সংখ্যা ও স্কোর পদ্ধতি হলো নিম্নরূপ :—

৩ বৎসর থেকে ১০ বৎসর	@ ৬টি	৬ × ৮ = ৪৮টি
১১ ও ১২ বৎসর	৮টি	৮টি
১৩ ও ১৪ বৎসর	৬টি	৬টি
সাধারণ পূর্ণ বয়স্কদের জন্য	৬টি	৬টি
উন্নত বয়স্কের	৬টি	৬টি
বিভিন্ন বয়সের অতিরিক্ত	১৬টি	১৬টি

প্রায় ১০০০ হাজার ছাত্রছাত্রীর উপর এই অভীক্ষা প্রয়োগ করে প্রশ্নগুলি নির্বাচন করেন। ১৯১৬ সালে ট্যারম্যান প্রথম মানসিক বুদ্ধির সংখ্যামান নির্ণয় করার জন্য বুদ্ধ্যঙ্ক (Intelligence Quotient) যথাযথ প্রয়োগ করেন। বুদ্ধ্যঙ্ক বলতে সাধারণ বয়স ও মানসিক বয়সের অনুপাতকে বোঝায়, তবে সুবিধার জন্য এর অনুপাতকে ১০০ দিয়ে গুণ করা হয়। অর্থাৎ—

$$\text{বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q)} = \frac{\text{মানসিক বয়স (Mental Age)}}{\text{সাধারণ বয়স (Chronological Age)}} \times ১০০$$

$$\text{সংক্ষেপে, বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.)} = \frac{\text{মাঃ বঃ (M. A)}}{\text{সাঃ বঃ (C. A)}} \times ১০০$$

৮ বছরের কোন শিশু যদি ৮ বছর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয় তবে তার মানসিক বয়স হবে ৮। এখন তার বুদ্ধ্যঙ্ক হবে $\frac{৮}{৮} \times ১০০ =$

১০০। এইরকম শিশুকে স্বাভাবিক বুদ্ধি সম্পন্ন শিশু বলা হয়, কিন্তু ৮ বছরের শিশু যদি ৭ বছরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নের সঠিক সমাধান করতে পারে তবে তার মানসিক বয়স হবে ৭ বছর, বুদ্ধ্যঙ্ক হবে $\frac{৭}{৮}\times$ ১০০=৮৮ অর্থাৎ নিম্নবুদ্ধি—স্বাভাবিকের নীচে। আবার ৮ বছরের শিশু যদি ৯ বছরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে তবে তার মানসিক বয়স ৯ বছর, বুদ্ধ্যঙ্ক হবে $\frac{৯}{৮}\times$ ১০০=১১৩ অর্থাৎ উন্নতবুদ্ধি—স্বাভাবিকের উপরে।

১৯৩৭ সালে টারম্যান ও মেরিল-এর সহযোগিতায় এই অভীক্ষাটির আর একবার সংস্করণ হয়। এই অভীক্ষাটির নাম হয় টারম্যান মেরিল সংস্করণ। বর্তমানে ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা হিসাবে এটি পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ব্যবহৃত হয়।

স্কেলটিতে ১২৯টা প্রশ্ন থাকে। নতুন সংস্করণে ২ বছর থেকে শুরু করে উন্নত বয়স্ক ৩ নম্বর পর্যন্ত ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপের চেষ্টা করা হয়েছে—অর্থাৎ বয়সের ভাগকে উপরের দিকে ও নীচের দিকে বাড়ান হয়েছে। অভীক্ষার দুটি সমজাতীয় ফর্ম আছে ; এগুলিকে "L" ফর্ম ও "M" ফর্ম বলা হয়। প্রতি ফর্মেই ১২৯ টা প্রশ্ন আছে।

১৯৩৭ সালের স্কেল

বয়স শ্রেণী	প্রশ্ন সংখ্যা	স্কোর	মোট স্কোর
২, ২½, ৩, ৩½, ৪, ৪½, ৫	প্রত্যেক শ্রেণী—৬ মোট ৬×৭=৪২	প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য ১ মাস	
বিকল্প প্রশ্ন	প্রত্যেক শ্রেণী—১ মোট ৭	" " "	
৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪,	প্রত্যেক শ্রেণী—৬ মোট ৬×৯=৫৪	প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য ২ মাস	এ পর্যন্ত মোট ১৪ বছর
স্বাভাবিক প্রাপ্ত বয়স্ক	৮	প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য ২ মাস	১ বৎসর ৪ মাস
উন্নত বয়স্ক—১ " " —২ " " —৩	প্রত্যেক শ্রেণী—৬ মোট ৬×৩=১৮	উন্নত বয়স্ক ১=৪ মাস " " ২=৫ " " ৩=৬	২ বছর ২ " ৬ মাস ৩ "
	মোট=১২৯		মোট ২২ বছর ১০ মাস

এই স্কেলের বৈশিষ্ট্য হল এখানে আংশিক স্কোর পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। এই অভীক্ষায় এমন একটা বয়সস্তর প্রথমে নির্ণয় করা হয় যেখানে একটি শিশু সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে ; তাকে বলা হয় তার প্রাথমিক বয়স (Basal Age)। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে কাউকে পরীক্ষা করতে হ'লে—পরীক্ষার্থীর সাধারণ বয়সের দু'বছর নীচের প্রশ্ন দিয়ে আরম্ভ করতে হয়।

৬ বছরে ছেলের পরীক্ষা

বছর	সঠিক উত্তর	অভীক্ষাপ্রাপ্ত নম্বর (মাসে)	মোট নম্বর বছর মাস
৪	৬	Basal Age বা প্রাথমিক বয়স সীমা	৪ বছর ০
৪—৬	বিকল্প প্রশ্ন--৫	১ মাস	০ ” ৫ মাস
৫	৩	১ মাস	০ ” ৩ মাস
৬	৩	২ মাস	০ ” ৬ মাস
৭	২	২ মাস	০ ” ৪ মাস
৮	১	২ মাস	০ ” ২ মাস
৯	০	সর্বোচ্চ বয়স সীমা বা (Ceiling Age)।	০ ” ০ ”
			মোট=৪ বছর ২০ মাস বা ৫ বছর ৮ মাস

এই স্কেলের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল বুদ্ধি বৃদ্ধির বয়স সীমা এখানে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই স্কেলে সর্বোচ্চ মানসিক বয়স হতে পারে ১৭১। কোন বয়সের পর বুদ্ধি আর তেমন বাড়ে না সে নিয়ে মতভেদ আছে, তবে এই স্কেলে বলা হয়েছে ১৫ বছরের পর বুদ্ধি আর বাড়ে না। ১৯১৬ সালে এই বয়সসীমা ১৬ ধরা হয়েছিল।

১৯৩৭ সালের অভীক্ষার নমুনা

বয়স সাত

(১) আঙুল গণনা করা।
(২) সরল বাক্য শুনে পুনরাবৃত্তি করা।
(৩) ছবি দেখে বৈসাদৃশ্য খুঁজে বার করা।
(৪) তিনটে অঙ্ক শুনে বিপরীত দিক থেকে পুনরাবৃত্তি করা।
(৫) তিনটে শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরী করা।
(৬) টোকা দিয়ে শব্দ করলে তা গণনা করা।

বয়স নয়

(১) ছবি দেখে পরে মনে করে আঁকা।
(২) বাক্যের এলোমেলো শব্দ ঠিকমত সাজান।
(৩) বিভিন্ন বাক্যের যুক্তির মধ্যে বৈসাদৃশ্য খুঁজে বার করা।
(৪) জোড়া শব্দের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বার করা।
(৫) ছড়া বলা।
(৬) চারটে অঙ্ক শুণে বিপরীত দিক থেকে পুনরাবৃত্তি করা।

বিনে স্কেলের অভীক্ষার সমস্যাবলীর আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত

(১) বস্তু, ছবি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম বলা (**Naming or identifying objects by name**)

কলমের নাম বলা, গরুর ছবি দেখে বলা, হাত, নাক, জিব প্রভৃতি দেখিয়ে বলতে বলা।

(২) স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা (**Memory Test**)

কয়েকটা বাক্য বা গল্প বলে তার থেকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা ও উত্তর দিতে বলা।

(৩) অঙ্কের পুনরাবৃত্তি (**Repeating Digits**)

কতকগুলি সংখ্যা মুখে মুখে বলার পর সেগুলি পরীক্ষার্থীকে পুনরাবৃত্তি করতে বলা। যেমন ৮—৫—৩—৯।

(৪) পার্থক্য নির্ণয় (Difference)

উট আর গাধার মধ্যে তফাৎ কোথায় ?

(৫) বোধ শক্তি (Comprehension)

পথের মাঝে কোন লোককে অজ্ঞান হ'য়ে যেতে দেখলে তুমি কি করবে ?

(৬) তুলনা (Comparison)

একটা ছোট ছেলে ও একটা বড় ছেলের মধ্যে তুলনা করা।

(৭) অসম্ভবতা নির্ণয় (Absurdity)

একজনের দুবার জর হয়েছিল—প্রথমবার জরে সে মারা গিয়েছিল, দ্বিতীয়বার জরে সে সেরে উঠেছিল। এই উক্তির মধ্যে কি অসঙ্গতি আছে ?

(৮) সমস্যামূলক পরিস্থিতি (Problem Situation)

একদিন একটি ছেলে নতুন জামাকাপড় পরে নানারকম খাবার ও পায়েস খেয়ে গুরুজনদের প্রণাম করল। সেদিনটি কি ছিল ?

(৯) উপমান (Analogy)

কাপড় পরে, জামা—(গায়ে দেয়)।

(১০) বিচার করণ (Reasoning)

আমরা খিদে পেলে খাই, না শরীর রাখার জন্য খাই, না লোভে পড়ে খাই, না মোটা হওয়ার জন্য খাই ?

(১১) দিক নির্ণয় (Orientation direction)

কোন দিকে মুখ করে দাঁড়ালে তোমার বাঁ হাত দক্ষিণ দিকে থাকবে ?

(১২) ব্যবহার ঘটিত সমস্যা (Practical Problem)

টুকরা ছবি জুড়ে সম্পূর্ণ ছবি তৈরী করা—ইত্যাদি।

বিনে-সাইমন স্কেলের বৈশিষ্ট্য—বুদ্ধির পরিমাপের ক্ষেত্রে এই স্কেলটি বিশেষ জনপ্রিয়তালাভ করেছে; পৃথিবীর প্রায় সব ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে।

(১) বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে এই স্কেলটি গঠিত।

(২) এই অভীক্ষাটিকে একটি স্কেল বলা হয়।

(৩) এখানকার প্রশ্নগুলি ক্রমকঠিন নীতি অনুসারে সাজান।

(৪) এখানে মানসিক বয়স ব্যবহার করা হয়েছে।

(৫) বুদ্ধ্যাঙ্ক ১০০ কে স্বাভাবিক মানুষের বুদ্ধ্যাঙ্ক বলা হয়েছে।

(৬) প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য অর্জিত জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

(৮) অভীক্ষার সমস্যাগুলি ভাষাভিত্তিক।

(৯) পরীক্ষার্থীর সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষকেরও মনোযোগ প্রয়োজন।

বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির সুবিধা ও অসুবিধা (Uses and Limitations of Intelligence Tests)

বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে আধুনিক কালে জীবনের বহু ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। যেমন—

(১) মনোবিজ্ঞানী রস (Ross) তাঁর "Groundwork of Educational Psychology" বইতে বলেছেন—বুদ্ধি অভীক্ষাগুলি মানুষের মনোপ্রকৃতি ও তার ক্রমোন্নতি সম্পর্কে কতকগুলি মূল্যবান সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে।

(২) অভীক্ষাগুলির সাহায্যে একই বুদ্ধ্যঙ্ক বিশিষ্ট ছেলেমেয়েদের শ্রেণীবিভাগ করার সুবিধা হয়েছে।

(৩) বিদ্যালয়ে পাঠ্যবিষয় নির্বাচনে এই অভীক্ষাগুলি বিশেষভাবে সাহায্য করে।

(৪) অভীক্ষাগুলির সাহায্যে শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা, আগ্রহ, অনুরাগ প্রভৃতির খবর পাওয়া যায়।

(৫) ছাত্রদের ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্বাচনে এগুলি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়।

(৬) ছেলেমেয়েরা পূর্ণ সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করছে কি না—এই অভীক্ষাগুলির সাহায্যে তা জানা যায়।

(৭) স্বল্পবুদ্ধি ও বিকারগ্রস্ত মানুষের বিকারের লক্ষণ নির্ণয় করা যায় এগুলির সাহায্যে।

(৮) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে, সৈন্যবাহিনীতে নতুন ভর্তির সময় এই অভীক্ষাগুলিকে কাজে লাগান হয়।

অভীক্ষাগুলির বহু গুণ থাকলেও একেবারে এগুলি ত্রুটিমুক্ত নয়। অভীক্ষাগুলির সাহায্যে অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায় বটে কিন্তু সব সময় এগুলি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। কারণ কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় মাঝে মাঝে।

(১) এই অভীক্ষাগুলির সাহায্যে সবসময় শিক্ষার্থীর বুদ্ধি যথাযথভাবে পরিমাপ করা যায় না। শিক্ষার সমান সুযোগ না থাকলে বুদ্ধির ঠিক ঠিক তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হয় না।

(২) ভাষামূলক বুদ্ধি অভীক্ষার সাহায্যে অনেক সময় বুদ্ধিকে ঠিকভাবে জানা যায় না।

(৩) বুদ্ধি অভীক্ষা ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করতে অক্ষম।

(৪) অভীক্ষাগুলি যে বুদ্ধি মাপার চেষ্টা করছে সেই বুদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধেই মনোবিজ্ঞানীরা একমত হ'তে পারেন নি।

(৫) বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে আদর্শীকৃত (Standardisation) না করলে শিক্ষার্থীর কর্মজীবন সম্বন্ধে ভালভাবে ভবিষ্যৎ বাণী করা যায় না।

(৬) অনেক সময় দ্রুত চিন্তা বুদ্ধির অভীক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

(৭) এগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।

(৮) যদিও বুদ্ধি সহজাত, তবুও পরিবেশের প্রভাবকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

(৯) শিক্ষার্থীর আবেগ বা মেজাজ অভীক্ষাগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির অসুবিধা কিছু থাকা সত্ত্বেও এগুলির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অভীক্ষাগুলিকে আদর্শীকৃত করে নিলে দোষ ত্রুটি অনেকখানি চলে যায়। পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক খুব সহজ হ'লে অভীক্ষাগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা যায়। অভীক্ষাগুলির সাহায্যে শিক্ষার্থীর 'শিক্ষামূলক প্রবণতা' জানা গেলে শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ জীবনে কতটা উন্নতি করতে পারবে সে সম্বন্ধে খানিকটা আন্দাজ করা যায়।

বিভিন্ন জাতীয় বুদ্ধির অভীক্ষা (Different kinds of Intelligence Tests)

(১) ভাষাভিত্তিক ব্যক্তিগত বুদ্ধির অভীক্ষা (Verbal individual Intelligence Test)—যে সব বুদ্ধি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে উত্তর দিতে হ'লে ভাষার ব্যবহার করতে হয় সেগুলিই ভাষাভিত্তিক বুদ্ধি অভীক্ষা। ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা ব্যক্তিগত ও দলগত দু রকমের হ'তে পারে। তবে বিনে-সাইমন অভীক্ষা হচ্ছে ব্যক্তিগত বুদ্ধি অভীক্ষা। কারণ এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা করে পরীক্ষা করা হয়।

(২) **ভাষাভিত্তিক দলগত অভীক্ষা** (Verbal Group Test)—এই জাতীয় অভীক্ষায় একসঙ্গে এক একটা দলকে পরীক্ষা করা যায়। এতে সময় ও পরিশ্রমের অনেক লাঘব হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনীতে বিভিন্ন কাজের জন্য লোক নেওয়ার সময় দুটি অভীক্ষা "আর্মি আল্‌ফা" ও "আর্মি বিটা"-কে কাজে লাগান হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই দুটি অভীক্ষার সংস্কার করে Army General Classification Test (A. G. C. T) এই নামে একটি অভীক্ষার সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। এই অভীক্ষাতে ভাষাগত, সংখ্যাগত, ব্লক গণনা, অবস্থানমূলক জ্ঞান ইত্যাদি মানসিক ক্ষমতার পরীক্ষা করা হয়েছিল।

(৩) **কার্যসম্পাদনী অভীক্ষা** (Performance Test)—আমরা জানি বিনে-সাইমন অভীক্ষা প্রধানতঃ ভাষাভিত্তিক। কিন্তু অনেক শিশুই ভাষার মাধ্যমে তাদের মনের ভাব ঠিকমত ব্যক্ত করতে পারে না। সুতরাং তাদের বুদ্ধি পরিমাপ করা সহজ কাজ নয়। যারা মূক, বধির, বিদেশী (অন্যের ভাষা জানে না) তাদের বুদ্ধি পমিাপের জন্য নানারকম উপকরণের সাহায্যে কাজ দিয়ে দেখা হয়। এই অভীক্ষাও দলগত ও ব্যক্তিগত হোতে পারে।

কয়েকটা কার্যসম্পাদনী স্কেল

কয়েকটা কার্যসম্পাদনী স্কেল তৈরী করার কাজে প্রথম হাত দেন সেগুইন, হিলি ফারনাল্ড, নক্স প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানী, তবে এই জাতীয় আদর্শীকৃত স্কেল বলতে পিণ্টার পেটারসান (Pinter Paterson) স্কেলকেই বোঝায়। স্কেলটিতে ১৫টি অভীক্ষা আছে। এটি ভাষামূলক বুদ্ধি অভীক্ষার পরিপূরক। অভীক্ষার বয়স সীমা ৪—১৫ বছর পর্যন্ত। এতে আছে—

(১) সেগুইন (Seguin) ফর্ম বোর্ড।

(২) হিলির ছবি সম্পূর্ণ করণ (Healy Picture Completion)।

(৩) ক্যাজুইষ্ট ফর্ম বোর্ড (Casuist Form Board)।

(৪) ঘোটকী ও তার বাচ্চা অভীক্ষা (Mare & Foal Test)।

(৫) দুই চিত্রের বোর্ড।

(৬) পাঁচ চিত্রের বোর্ড।

(৭) ত্রিভুজের অভীক্ষা।

(৮) কর্ম সম্বন্ধীয় অভীক্ষা।

(৯) হিলির ধাঁধা।

(১০) ম্যানিকিন অভীক্ষা।

(১১) ফিচার প্রোফাইল অভীক্ষা।

(১২) জাহাজ অভীক্ষা।

(১৩) ঘন আয়তন অভীক্ষা।

(১৪) অনুকল্প অভীক্ষা।

(১৫) সঙ্গতি সাধক অভীক্ষা।

এই অভীক্ষা ছাড়াও কতকগুলি কার্য সম্পাদনী স্কেল প্রচলিত আছে। যেমন—

(১) ডিয়ারবর্নের ফর্ম বোর্ড। (২) আলেকজাণ্ডারের পাস্ এবং অভীক্ষা। (৩) গুড এনাফের মানুষ আঁকা অভীক্ষা। (৪) পোর্টিয়াসের ধাঁধা। (৫) কর্ণেল ফক্স সম্পাদনী দক্ষতা স্কেল। (৬) আথার সম্পাদনী স্কেল। (৭) কোহ ব্লক ডিজাইন অভীক্ষা (Koh's Block Design Test) ইত্যাদি।

কয়েকটি ভাষা বর্জিত ব্যক্তিগত অভীক্ষার বিবরণ

(১) ফর্মবোর্ড অভীক্ষা—ফর্মবোর্ডের যতগুলি অভীক্ষা আছে তার মধ্যে ডিয়ারবর্নের অভীক্ষাটি সবচেয়ে ভাল। শিক্ষার্থীর সামনে এমন একটা কাঠের
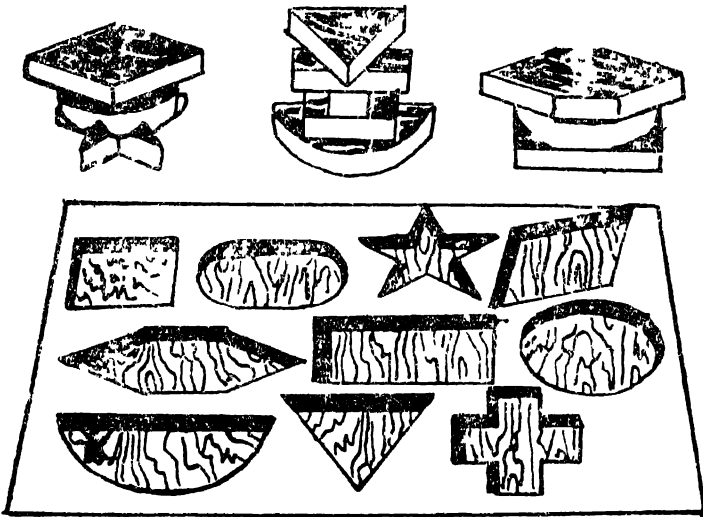
বোর্ড রাখা হয় যাতে নানা আকারের খোপ কাটা (groove) আছে।

ঐ খোপগুলির মধ্যে ঠিকভাবে বসবে এমন কতকগুলি কাঠের টুকরো অভীক্ষার্থীকে দেওয়া হয়। তাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ কাঠের টুকরোগুলিকে নির্দিষ্ট খোপে বসাতে বলা হয়। কাঠের টুকরোগুলি এমনভাবে তৈরী যে ভুল খোপে বসালেই অভীক্ষার্থী নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারবে। কতবার কাঠের টুকরোগুলোর জায়গা বদল ক'রে ঠিকভাবে বসাতে পারল তাও দেখা হয়।

পাস এলং অভীক্ষা—আলেকজাণ্ডারের পাস এলং অভীক্ষা বিখ্যাত। এই অভীক্ষায় একটা ট্রের মত ছোট বাক্স থাকে যার এক প্রান্ত নীল ও অপর প্রান্ত লাল এবং ভিতরে কতকগুলি চৌকো ও আয়তাকার কাঠের অথবা প্লাষ্টিকের ব্লক থাকে। ব্লকগুলো লাল ও নীল রঙের হয়। অভীক্ষার্থীকে কাঠের টুকরোগুলোকে এমনভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয় যাতে বাক্সের নীল প্রান্তের দিকে লাল রঙের ব্লক থাকে ও লাল প্রান্তে নীল রঙের ব্লক থাকে। অভীক্ষার্থীকে ঐ ব্লকগুলি হাত দিয়ে না তুলে ঘসে ঘসে নীল ব্লকগুলো নীল প্রান্তে ও লালগুলোকে লালপ্রান্তে নিয়ে যেতে বলা হয়।

(৩) **ব্লক ডিজাইন অভীক্ষা**—এই অভীক্ষাতে কাঠের কতকগুলি ব্লক থাকে যাতে সাদা, লাল, হলদে, নীল রঙ করা থাকে আর কার্ডে কতকগুলি ক্রমকঠিন অনুসারে ডিজাইন আঁকা থাকে। ঐ কার্ড দেখে দেখে অভীক্ষার্থীকে কাঠের ব্লকগুলো সাজিয়ে সেই ডিজাইনগুলো করতে বলা হয়। এতে কোন্ অভীক্ষার্থীর কত সময় লাগছে তা বিচার করা হয়।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপ—পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধির মাপার জন্য Wechsler Bellevue Intelligence Scale নামে একটা স্কেল ১৯৩৯ সালে প্রচলিত হয়। পরে এটি সংশোধিত হয়ে ১৯৫৫ সালে Wechsler Adult Intelligence Scale নামে প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৬ রকম ভাষামূলক প্রশ্ন ও ৫ রকম কার্য সম্পাদনী প্রশ্ন আছে। যেমন, ভাষামূলক অভীক্ষা হ'ল—

(১) জ্ঞানমূলক প্রশ্ন। (২) বোধশক্তি নির্ণয়। (৩) সাধারণ গণিত। (৪) সামঞ্জস্য নির্ণয়। (৫) অঙ্ক বা সংখ্যাসারি। (৬) ভাষা জ্ঞান।

ভাষাবিহীন অভীক্ষা বা কার্য সম্পাদনী অভীক্ষার পাঁচটি কর্মসম্পাদনী অভীক্ষা হ'ল—

(১) অঙ্ক প্রতীক। (২) ছবি সম্পূর্ণকরণ। (৩) ব্লক ডিজাইন। (৪) পর্যায়ক্রমে ছবি সাজান। (৫) বিভিন্ন বস্তুর সমন্বয়।

বুদ্ধ্যঙ্কের স্থিরতা (Constancy of I. Q.)—বুদ্ধির পরিমাপকে কেন্দ্র করে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই। অনেকে বলেন বুদ্ধিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে বাড়ান যায়। স্মিড, ওয়েলম্যান, স্কিল্‌স প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের এইরকম ধারণা। এই ধারণা অনুসারে বিচার করলে দেখা যাবে যে বয়স ও প্রশিক্ষণ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধ্যঙ্কেরও পরিবর্তন হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে এই সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, বুদ্ধি জন্মগত। কাজেই কোন ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্কও সব বয়সে সমান থাকে।

তবে কোন মানসিক অভীক্ষাই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য এমন কথা বলা যায় না। ফলে ঐসব অভীক্ষার সাহায্যে বুদ্ধি পরিমাপ করলে কখনও বুদ্ধ্যঙ্ক দাঁড়ায় ১০০, কখনও ৯৬, কখনও বা ১০৪। এটা পরীক্ষণের সম্ভাব্য ত্রুটির ফলে হয় বলে ধারণা করা হয়।

এছাড়া আরও কতকগুলি কারণে বুদ্ধ্যঙ্কের পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন—(১) দৈহিক কারণ—পরীক্ষা নেওয়ার সময় পরীক্ষার্থীর শারীরিক কারণ পরীক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করে। (২) প্রক্ষোভগত কারণ—পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থী যদি খুব ভয় পেয়ে যায় বা রেগে যায় তবে এই প্রক্ষোভগুলি তার মানাসক ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। (৩) পরীক্ষক সংক্রান্ত—পরীক্ষকের ব্যক্তিগত ত্রুটির জন্য পরীক্ষার্থীর বুদ্ধ্যঙ্কের পরিবতন হয়। (৪) পরীক্ষা পরিস্থিতি—অনেক সময় দেখা যায় পরীক্ষা পরিস্থিতি আদর্শ না হলে বুদ্ধির পরিমাপ নির্ভুল হয় না। (৫) অভীক্ষার ত্রুটি—অভীক্ষাটির Validity ও Reliability না থাকলে বুদ্ধির পরিমাপ ঠিকমত হয় না।

এছাড়া অভীক্ষার প্রশ্নগুলো সবসময় কৃষ্টিমূলক অভিজ্ঞতা বিবর্জিত (Culture free) হয় না। ফলে কৃষ্টিগত প্রভাব বুদ্ধি অভীক্ষার সমস্যা সমাধানের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বুদ্ধির তাৎপর্য বা বুদ্ধি অভীক্ষার উপযোগিতা

শিক্ষাক্ষেত্রে বুদ্ধির গুরুত্ব সম্পর্কে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্তমানকালে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে বুদ্ধিকে পরিমাপ করার ফলে শিক্ষার কাজে অনেক সুবিধা হয়েছে। বুদ্ধিকে সঠিকভাবে পরিমাপ করে ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে আজকাল শিক্ষকরা শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করেন। বুদ্ধ্যঙ্ক অনুসারে শিক্ষার্থীদের

শ্রেণীবিভাগ করে তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে না পারলে, তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। বুদ্ধ্যঙ্ক অনুযায়ী শিশুদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—উন্নত বুদ্ধি, স্বাভাবিক বুদ্ধি ও ক্ষীণ বুদ্ধি। এই তিন শ্রেণীর শিক্ষার্থীর পৃথক পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র বুদ্ধি অভীক্ষার সাহায্যে। বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে ; যেমন—

(১) শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রগতি তার বুদ্ধির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর বুদ্ধির পরিমাপ করতে পারেন। তবে তার জ্ঞানমূলক অগ্রগতি কতটা হবে সে সম্বন্ধে তিনি ধারণা করতে পারেন।

(২) শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে শিক্ষক পাঠদান করতে পারেন। বুদ্ধ্যঙ্কের ভিত্তিতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই দলবিভাগ করা হয়। এর ফলে শিক্ষক এক এক দলে এক এক পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন ; কারণ একটি দলের বিচার, যুক্তি, স্মৃতি, বুদ্ধি ইত্যাদি মোটামুটি কিরকম তাঁর জানা আছে।

(৩) আধুনিক কালে শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। পাঠদান ছাড়াও শিক্ষামূলক নির্দেশনা এখন শিক্ষার একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। আমরা জানি প্রত্যেক শিশু তার নিজস্ব নিয়মে বিকশিত হয়। কাজেই তাকে বিকশিত হ'তে সাহায্য করতে হ'লে তার মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী বিষয় নির্বাচনে সহায়তা করতে হবে। মানসিক ক্ষমতার মধ্যে প্রধান ক্ষমতা হ'ল বুদ্ধি। কাজেই বুদ্ধিকে জানতে পারলে কোন ব্যক্তির মনের অনেকখানি খবর পাওয়া যায়।

(৪) বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষা অনেকটাই বৃত্তিকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠেছে। আগে মা বাবাই কেবল ছেলেমেয়ের বৃত্তির কথা চিন্তা করতেন ; এখন এই দায়িত্ব শিক্ষকের উপর এসে পড়েছে। কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধি ব্যক্তিকে কর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন কৌশল আয়ত্ত করতে সাহায্য করে ও কর্মপরিবেশে সার্থকভাবে অভিযোজন করতেও সাহায্য করে। তাই শিক্ষার্থীর বুদ্ধি সম্বন্ধে শিক্ষকের ধারণা থাকলে বৃত্তি নির্দেশনায় সুবিধা হয়।

(৫) শিক্ষাক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্র নির্বাচনের জন্য বুদ্ধি অভীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। সকলেই সব শিক্ষার জন্য ও সব কাজের জন্য উপযুক্ত নয়। কাজেই বুদ্ধ্যঙ্কের সাহায্য নিয়ে ব্যক্তি নির্বাচন করতে হয়।

(৬) শিক্ষার্থীরা অনেক সময় মানসিক রোগে ভোগে। বুদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ করে অনেক সময় মানসিক অসুস্থতার কারণ নির্ণয় করা যায়। যেমন যারা প্যারনইয়া নামে মানসিক রোগে ভোগে তারা সম্পাদনা অভীক্ষা উল্টো করে সমাধান করে। মানুষের ছবি আঁকলে মাথাটা নীচের দিকে ও পা দুটো উপরের দিকে আঁকে। এদের জন্য মানসিক বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে হবে।

শিক্ষাকাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে এই বুদ্ধি অভীক্ষা অনেকভাবে সাহায্য করে। শিক্ষক বিচক্ষণতার সঙ্গে এগুলি প্রয়োগ করতে শিখলে অনেক ভাল ফল পাবেন।

প্রশ্নাবলী

1. What is intelligence? Describe any Standardised Intelligence Test that you know and show how intelligence can be measured with it. (C. U. B. T. '66)

2. Discuss the nature of intelligence. Write how intelligence is measured with special reference to Binet scale. (C. U. B. T. '68)

3. Define intelligence and discuss the importance of intelligence Tests in child guidance and class teaching. (C. U. B. A. '64)

4. What is intelligence? Can it be measured? (C. U. B. A. '70)

5. Give a general idea of the intelligence Tests and indicate their importance in educational and vocational guidance? (C. U. B. T. '71)

নবম অধ্যায়

ব্যতিক্রমভাবাপন্ন শিশু (Exceptional Children)

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে একটি নতুন শব্দের ব্যবহার আজ বহুল প্রচলিত হয়েছে। শব্দটি হ'ল ব্যতিক্রম ভাবাপন্ন শিশু (Exceptional Children)। কিন্তু প্রশ্ন জাগে 'এরা আবার কারা? যে সব শিশু দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে সাধারণ শিশুর থেকে আলাদা তাদের ক্ষেত্রেই এই বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। এদিক থেকে বিচার করলে বোবা, কালা, খোঁড়া, তোতলা ও বিকলাঙ্গ শিশুদেরও তো এই দলে ফেলা যায়। কিন্তু না—এদের শারীরিক অক্ষমতায় (Physically handicapped) দলভুক্ত করা হয়। সাধারণভাবে দেখা যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এমন কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী থাকে যারা সব জিনিস শিখতে গিয়ে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের থেকে অনেক এগিয়ে যায়। আবার একদলের ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না—সব সময় পিছিয়ে পড়ছে। এই যে সাধারণের থেকে এগিয়ে বা পিছিয়ে থাকা—এর কারণ কি? এর পিছনে আছে মানসিক ক্ষমতার তারতম্য—বিশেষতঃ বুদ্ধির বেশী কমের জন্যই এটা হ'য়ে থাকে। তাই আজকাল বুদ্ধ্যঙ্কের (I. Q.) পরিমাপ করে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—তাতে শিক্ষার আয়োজন করার অনেকটা সুবিধা হয়। বুদ্ধ্যঙ্কের পরিমাপ স্বাভাবিক বণ্টনের নিয়ম মেনে চলে। এই বণ্টনের মাঝখানের অংশে যারা থাকে তাদের বলা হয় স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন (normal) শিশু। আর যারা এদের দুপাশে থাকে তাদেরকেই ব্যতিক্রম ভাবাপন্ন শিশু (Exceptional Children) বলে অভিহিত করা হয়।

এদের মধ্যে যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক সাধারণের চেয়ে বেশী তাদের উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু (Gifted children) বলা হয় এবং যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক সাধারণের থেকে নীচে তাদের বলা হয় ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু (Feeble minded children)।

বুদ্ধ্যঙ্ক অনুসারে শ্রেণীবিভাগের চিত্র
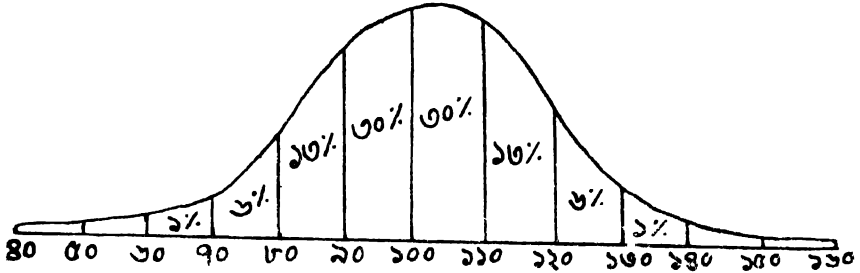
বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী টারম্যানের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বুদ্ধ্যঙ্কের শ্রেণীবিভাগ দেখান যেতে পারে। যেমন—

বুদ্ধ্যঙ্ক	শ্রেণী	শতকরা হার
১৩০ এর উপরে	অতিমানব	১%
১২০—১৩০	অতিপ্রতিভাবান	৬%
১১০—১২০	প্রতিভাবান	১৩%
৯০—১১০	স্বাভাবিক বুদ্ধিমান	৬০%
৮০—৯০	স্বাভাবিকের নীচে	১৩%
৭০—৮০	স্বল্পবুদ্ধি	৬%
৭০ এর নীচে	ক্ষীণ বুদ্ধি	১%

এখানে দেখা যাচ্ছে ৯০—১১০ এর মধ্যে যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তারা স্বাভাবিক বুদ্ধিমান (normal), ১১০ এর উপরে যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তারা হ'ল উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু (gifted children) আর ৯০ বুদ্ধ্যঙ্কের নীচে যারা তারা স্বাভাবিকের নীচে ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন শিশু (Feeble minded children)।

উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু (Gifted Children)।

সাধারণভাবে বলা যায় ১১০-এর উপরে যেসব শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক তারা সাধারণ শিশুর চেয়ে উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন। ১১০—১২০ বুদ্ধ্যঙ্কের শিশুরা বিদ্যালয়ে তেমন কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না। কিন্তু এর উপরে যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তাদের সমস্যা একটু অন্যরকম। আধুনিককালে এইসব শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য আলাদাভাবে চিন্তা করা হচ্ছে।

এখন আমরা দেখব এই উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের বৈশিষ্ট্য কি কি।

(১) ছোট বেলায় উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের দৈহিক বিকাশ তাড়াতাড়ি হয়। যেমন তাড়াতাড়ি বসে, তাড়াতাড়ি হাঁটে, আগে দাঁত ওঠে ইত্যাদি।

(২) এই শিশুদের ভাষার বিকাশও দ্রুত হয়। অল্প বয়সে অনেক কথা শেখে ও যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারে।

(৩) এদের কৌতূহল প্রবৃত্তি প্রবল। আশেপাশের মানুষকে এরা কি, কেন, কবে, কোথায় ইত্যাদি প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে।

(৪) এরা পড়তে, গুণতে ও লিখতে তাড়াতাড়ি শেখে।

(৫) এদের নানান জিনিসের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। বিভিন্ন জিনিস সম্বন্ধে এদের তাড়াতাড়ি পরিষ্কার ধারণা জন্মায়।

(৬) ছোটবেলায় এরা বাড়ীর বিভিন্ন কাজে আগ্রহ দেখায় ও দায়িত্ব দিলে খুশী হয়।

(৭) উন্নতবুদ্ধি শিশুদের সূক্ষ্ম রসবোধ থাকে।

(৮) এদের প্রাক্ষোভিক প্রকাশ অনেক সংযত।

(৯) এরা সমবয়সীদের মধ্যে থেকে নিজেদের মানসিক ক্ষমতা সম্পন্ন সঙ্গী খুঁজে পায় না বলে অনেক সময় বেশী বয়সের ছেলেমেয়ের সাথে বন্ধুত্ব করে।

(১০) উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের মধ্যে যুক্তি-তর্কের ক্ষমতা বেশী থাকে। এদের আচার-আচরণ বিচারবুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

(১১) এরা সব জিনিস তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে ও সুন্দরভাবে কোন জিনিস প্রকাশ করতে পারে।

(১২) এদের মনোযোগের পরিসর অনেকখানি বিস্তৃত; স্থায়িত্বও বেশী হয়।

(১৩) উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন শিশুরা সারাজীবন বুদ্ধির উন্নত মান বজায় রাখে।

উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের মনের বিশেষ কতকগুলি চাহিদা থাকে। সেগুলি নিম্নরূপ :

(১) উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন শিশুরা নিজেদের মতামত সম্বন্ধে খুব সচেতন। সমস্ত রকম কাজে সবাই তাদের মতামতের মর্যাদা দিক এটা তারা চায়। এরা প্রতি কাজে প্রশংসা চায়। যদি তা না পায় তবে এরা দিবাস্বপ্নে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে।

(২) এইসব শিশুরা বড়দের কাছ থেকে বিশেষ করে মা বাবার কাছ

থেকে বেশী নিরাপত্তা চায়। এই নিরাপত্তার কিছুমাত্র অভাব ঘটলে এরা নানারকম অসঙ্গত আচরণ করে।

(৩) এদের মধ্যে জ্ঞান তৃষ্ণা খুব প্রবল হয়। নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য এরা ব্যগ্র হ'য়ে উঠে।

(৪) উন্নতবুদ্ধি শিশুরা সঙ্গী সাথীদের চেয়ে বাবা মায়ের সান্নিধ্য বেশী পছন্দ করে।

(৫) কাজ করার চাহিদা এদের মধ্যে তীব্র হয়ে উঠে। সব সময় কিছু না কিছু করতে চায়।

(৬) এরা যুক্তি দিয়ে সব কিছু গ্রহণ করে, ফলে শুধু উপদেশে এদের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কাজ হয় না। অন্ধ বিশ্বাসের প্রতি এদের আস্থা নেই।

উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের দায়িত্ব—সাধারণ পদ্ধতিতে বিদ্যালয় পরিচালনার ফলে উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুর সব মানসিক চাহিদা পূরণ হয় না; ফলে তারা কিছু কিছু সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই এদের শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হলে কতকগুলি বিশেষ দিকে নজর দেওয়া শিক্ষকের কর্তব্য।

(১) বিদ্যালয়ে এমনভাবে পাঠ্য বিষয় পরিবেশন করতে হবে যাতে উন্নতবুদ্ধি শিশুদের পক্ষে সেটা খুব সহজ না হয়। বিষয়বস্তু অত্যন্ত সহজ হ'লে এই সব শিশুরা আনন্দ পায় না। তাই এদের পাঠ্যক্রম হবে উন্নত ধরনের। এরা হাতে-কলমে কাজ করে জ্ঞান আহরণ করতে চায়। কাজেই সেই মত কাজের ব্যবস্থা করতে না পারলে এরা শ্রেণীশৃঙ্খলা নষ্ট করে।

(২) উন্নতবুদ্ধি শিশুরা আত্মসচেতন বেশী হয়। ফলে এদের মধ্যে একটা অহমিকার ভাব আসে। শিক্ষক খুব সতর্কতার সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করবেন যাতে তারা কাজে অনুপ্রেরণা পায় অথচ সহপাঠীদের মানসিক ক্ষমতা কম হলেও যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়।

(৩) এইসব উন্নতবুদ্ধি শিশুদের মধ্যে আত্মস্বীকৃতি বেশী থাকে। এরা কোন কাজে অন্যের প্রশংসা না পেলে দুঃখিত হয়। বিদ্যালয়ে এরা কাজের মর্যাদা না পেলে বিদ্যালয়ের প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠে ও অনেক বদ অভ্যাসের শিকার হ'য়ে উঠে। তাই এদের কাজের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হ'ল বুদ্ধিমান শিক্ষকের কর্তব্য।

(৪) উন্নতবুদ্ধি শিশুদের সার্বিক বিকাশে সাহায্য করাও শিক্ষকের অন্যতম

কর্তব্য। শারীরিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক, নৈতিক ও সমাজিক বিকাশের জন্য কেবলমাত্র তাত্বিক বিষয় নয়—নানারকম দায়িত্বপূর্ণ কাজেও তাদের নিয়োগ করতে হবে।

এ ছাড়া এদের শিক্ষার জন্য শিক্ষকের আরও কিছু করণীয় আছে। যেমন—

উন্নতবুদ্ধি শিশুদের জন্য পাঠ্যক্রমের মধ্যে এমন কিছু উপাদান সংযোজন করতে হবে যাতে তাদের চাহিদা মিটতে পারে। এদের চাহিদাপূরণের জন্য আজকাল তিনভাবে চিন্তা করা হয়। (১) পাঠ্যসূচীর উন্নতিকরণ (Enrichment of curriculum)। (২) শিক্ষাস্তরে ত্বরণ (Grade Acceleration)। (৩) বিশেষ শ্রেণীকরণ (special class)।

(১) **পাঠ্যসূচির উন্নতি করণ**—উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীর জ্ঞানের চাহিদা অনেক বেশী থাকে; এদের মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী বিকাশে সহায়তা করতে হলে পাঠ্য সূচীর উন্নতিকরণ প্রয়োজন। শিক্ষক এরকম শিক্ষার্থীর কাছে পাঠ্যসূচীর কঠিন সমস্যাগুলি তুলে ধরবেন। ফলে এরা নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করার ও সমস্যা সমাধান করার সুযোগ পাবে। তবে সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত করার জন্য শিক্ষক এদের মধ্যে প্রেষণা জাগাবেন—তা না হলে এদের আগ্রহ ধীরে ধীরে কমে যাবে।

(২) **শিক্ষাস্তরে ত্বরণ**—যে সব শিশুর বুদ্ধি বেশী তারা তাড়াতাড়ি বিভিন্ন বিষয় আয়ত্ত করতে পারে; ফলে তাদের বেশী জিনিষ শেখার সুযোগ দিতে হয়। অনেকে তাই তাদের বয়সের চেয়ে এক বা দু বছর উপরের স্তরের শিশুদের সঙ্গে তাদের পড়ানর পক্ষপাতী। এইজন্য আগেকার দিনে ভাল ছাত্রদের double promotion, triple promotion ইত্যাদি দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু অধুনিক কালে মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন কম বয়সের শিশু বেশী বয়সের শিশুদের সাথে পড়লে শিশুটি যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন তার মানসিক ও সামাজিক বিকাশের ব্যাঘাত ঘটে। তাছাড়া অনেক সময় এরকম শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তুর বোধগম্যতার ত্রুটি শিক্ষকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। ফলে শিক্ষার্থীর পরবর্তী স্তরের শিক্ষা ব্যাহত হয়।

(৩) **বিশেষ শ্রেণীকরণ** (Special class)—অনেক মনোবিদ উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের জন্য পৃথক শ্রেণীতে শিক্ষা ব্যবস্থা করার কথা বলেছেন। এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় ফল অবশ্য ভালই পাওয়া যায়। কারণ

এখানে শিক্ষার্থীদের একই মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম রচনা ও পাঠদান পদ্ধতি নির্বাচন করতে সুবিধা হয়। তবে অসুবিধাও যে একেবারে নেই তা নয়। এদের মনে খুব অহংকার আসে ও অন্যান্য শিক্ষার্থীদের প্রতি এদের অবজ্ঞার মনোভাব দেখা যায়। এরা সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পারে না। ফলে সমাজে আর পাঁচজনের সঙ্গে পরবর্তী জীবনে মিশতে না পারার জন্য এরা অসামাজিক বলে প্রতিপন্ন হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার জন্য যে সব ব্যবস্থা আছে তাদের প্রত্যেকটির মধ্যে সুবিধা অসুবিধা দুটোই আছে। তবে অসুবিধা আছে বলেই শিক্ষক কি নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকবেন? না—মোটেই তা নয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বিদ্যালয়ের অবস্থা, বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীর চাহিদা ইত্যাদির কথা স্মরণ রেখে শিক্ষক যে কোন পদ্ধতি কাজে লাগাতে পারেন। অথবা এই তিনটির সমন্বয়ে নতুন পদ্ধতিও উদ্ভাবন করতে পারেন। এই ধরনের শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক যতটুকু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ততটুকুই লাভ, কারণ গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় এদের বিকাশের প্রতি যথাযথ নজর দেওয়া হয় না।

ক্ষীণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশু (Feeble minded Children)।

যে সব শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক ৭৫ এর নীচে তাদের আমরা সাধারণভাবে ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন শিশু বলে থাকে। এরা সমাজে ও বিদ্যালয়ে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে।

যাদের আমরা ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন শিশু বলি তাদের মধ্যেও আবার শ্রেণীবিভাগ আছে। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ২৫—৩০ এর নীচে তাদের বলা হয় জড়ধী (Idiots)। এদের সংখ্যা অবশ্য খুবই কম; শতকরা ·০৬ জন। এদের মানসিক বয়স ২—৩ বছরের মধ্যে। ভালোভাবে কথাই বলতে পারে না; এদের বোধশক্তি একেবারে নেই বল্লেই চলে। এদের মধ্যে প্রায় কোন না কোন শারীরিক ত্রুটি দেখতে পাওয়া যায়। এরা নিজেদের কাজটুকুও নিজেরা করতে পারে না—এদের খাইয়ে, পরিয়ে, স্নান করিয়ে দিতে হয়। এরা অন্যের বোঝা হয়ে বেঁচে থাকে। তবে এরা খুব বেশী দিন বাঁচে না—শৈশবেই প্রায় মারা যায়।

যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৩০—৫০ বা ৫৫-এর মধ্যে তাদের বলা হয় মন্দধী (Imbecile)।

এদের মানসিক বয়স ৩—৭ বছরের বেশী নয়। এরা নিজেদের মনোভাব ভালভাবে প্রকাশ করতে পারে না। কোন কাজ দিলে নিজেরা ঠিকমত করতে পারে না। খুব সহজ যান্ত্রিক কাজ এরা কোন রকমে করতে পারে। এদের আবেগের স্থিরতা থাকে না।

যে সব শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক ৫০—৭০ এর মধ্যে তাদের স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন (Moron) বলা হয়। এদের মানসিক বয়স ৭—১২ বছরের মধ্যে। প্রতিদিনের কাজ এরা কোন রকমে চালিয়ে নিতে পারে; খুব চেষ্টা করে কিছুটা লেখাপড়াও করতে পারে। নতুন পরিবেশে এরা খাপখাওয়াতে পারে না ও কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে না। তবে যান্ত্রিকভাবে কোন কাজ এরা করতে পারে।

ক্ষীণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুর শিক্ষা (Education of the feeble minded children)

ক্ষীণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুরা স্বাভাবিক শিশুদের মত সাধারণভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু এতদিন ধরে এরা ছিল সমাজে অবহেলিত—এদের জন্য আলাদা কোন শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় এদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে আলাদা শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে।

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেছেন এদের শিক্ষার গতি মন্থর হলেও দৈনন্দিন জীবনে কাজ চালানর মত কৌশল এদের শেখান যায়।

(১) স্বল্পধী শিশুরা—কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম, educable।

(২) মন্দধী শিশুরা—দৈনন্দিন জীবনের কৌশল শিখতে পারে, Trainable।

(৩) জড়ধী শিশুরা—শিক্ষাগ্রহণে ও কৌশল শিখতে অক্ষম—Non educable, non trainable।

এখন ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুর শিক্ষা পরিকল্পনা করার আগে এদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখা যায়—

(১) এদের দৈহিক বিকশের হার সাধারণ শিশুর চেয়ে কম। এদের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।

(২) এই সব শিশুদের ভাষার বিকাশ বেশ ধীরে ধীরে হয়। অনেকের ভাষা উচ্চারণের ত্রুটিও দেখা যায়।

(৩) নতুন জিনিস জানার আগ্রহ এদের বেশ কম। সবকিছুই ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে দেখে।

(৪) সাধারণভাবে লেখাপড়া ও শেখায় এরা সমবয়সী ছেলেমেয়েদের থেকে পিছিয়ে থাকে।

(৫) এদের অনুরাগও খুব সীমাবদ্ধ। সামান্ত দু একটা জিনিসের প্রতি এদের অনুরাগ থাকে তাও বয়স অনুপাতে নয়; অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ছেলেমেয়েদের যে সব জিনিসে অনুরাগ থাকে এদেরও সেই জিনিসে অনুরাগ দেখা যায়।

(৬) ক্ষীণবুদ্ধি শিশুরা কমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে— সমবয়সী ছেলেমেয়ে এদের পছন্দ নয়।

(৭) প্রাক্ষোভিক বিকাশও এদের বয়স অনুপাতে কম।

(৮) কোন একটা জিনিসে এরা বেশীক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে না। কারণ মনোযোগের পরিসর এদের কম।

(৯) এদের মানসিক ক্ষমতাও বয়স অনুপাতে অল্প। পরিবেশের প্রভাবে কারও কারও পরিবর্তন দেখা যায় বটে কিন্তু তা খুব বেশী নয়।

ক্ষীণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা ও শিক্ষকের দায়িত্ব (Education of the Feeble minded and Teachers' responsibilities)

আমরা জানি ক্ষীণ-বুদ্ধি শিশু তিন রকমের—স্বল্পধী (Moron), মন্দধী (Imbecile) ও জড়ধী (Idiots), এদের মধ্যে জড়ধী শিশু শিক্ষা প্রচেষ্টার বাইরে। বাকি দু রকমের শিশুর শিক্ষার সাহায্যে হয়তো কিছু উন্নতি করা চলতে পারে। তাই এদের বলা হয় শিক্ষণক্ষম ক্ষীণ বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশু (Trainable feeble minded)।

সাধারণ বিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যে অনেক ক্ষীণ-বুদ্ধি শিশু দেখা যায়। কিন্তু সকলের একসঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে এদের তেমন উন্নতি করা যায় না। কারণ এরা সাধারণ শিক্ষার্থীর থেকে পিছিয়ে থাকবে এটা খুব স্বাভাবিক। তাই এদের জন্য আলাদা শিক্ষাব্যবস্থা করতে না পারলে, এদের ব্যক্তিসত্তা বিকাশের তেমন সাহায্য হবে না।

শিক্ষকদের তাই প্রধান কর্তব্য হবে এইসব শিশুদের উপযোগী আলাদা শিক্ষায় ব্যবস্থা করা। এদের শিক্ষাব্যবস্থা করতে গিয়ে, আমাদের প্রথম ভাবতে হবে—স্বল্প বুদ্ধি শিশুদের কেমন করে নাগরিকতা শিক্ষা দেওয়া যায় ও কেমন করে এদের সুস্থ জীবনযাপনে সাহায্য করা যায়। এদের যদি আমরা পরিপূর্ণ জীবন বিকাশের কথা চিন্তা করি তাহলে আমরা হয়তো কোনদিনই সে আদর্শে পৌছতে পারব না। এরা যাতে মোটামুটিভাবে স্বাবলম্বী ও পূর্ণবয়স্ক মানুষের দাবী নিয়ে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়—এ রকম একটা কিছুর কথা চিন্তা করাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত। তা করতে হ'লে আমাদের কোন কোন দিকে নজর দিতে হবে ?

(১) স্বল্পবুদ্ধি শিশুরা যাতে তাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজ সহজে করতে পারে সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। নিজের সীমিত ক্ষমতা সম্বন্ধে তাদের সচেতন করতে হবে ও সেই সঙ্গে ভাল গুণের বিকাশে সাহায্য করতে হবে। অন্যের ভাল গুণ দেখে ঈর্ষা না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(২) তাদের সমাজ জীবনের পক্ষে উপযোগী সম্ভাব্য গুণের বিকাশের দিকে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। তারা যাতে সামাজিক আচার-আচরণ শেখে তা দেখতে হবে, না হ লে সমাজ জীবনে তারা অবাঞ্ছিত হয়ে যাবে।

(৩) তারা মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী যে কোন বৃত্তি যাতে বেছে নিয়ে জীবিকা অর্জনে সক্ষম হয় স শিক্ষা দিতে হবে। তার জন্ম অবশ্য বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে ও কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

তাছাড়াও স্বল্পবুদ্ধি শিশুর প্রতি শিক্ষকের ব্যক্তিগত সাহায্য প্রয়োজন। তাই শ্রেণী শিক্ষা এদের পক্ষে তেমন ফলপ্রসূ হয় না। খুব ছোট্ট ছোট দলে অবশ্য ভাগ করে এদের পাঠ পরিচালনা করা উচিত। এরা বিমূর্ত চিন্তা করতে পারে না—সেইজন্ম নানা রকম মূর্ত জিনিসের সাহায্য নিয়ে এদের শিক্ষা দিতে হবে। আজকাল অনেক দৃশ্য-শ্রাব্য-সহায়ক (audio-visual aids) পাওয়া যায় যেগুলো অতি সহজে ব্যবহার করা চলে।

ক্ষীণ-বুদ্ধি শিশুরা একটা বিষয়ে বেশীক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে না, তাই তাদের ঘন ঘন বিষয়ান্তরে নিয়ে গেলে ভাল হয়। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি শিশুকে সক্রিয় করে তোলা প্রয়োজন।

এদের শিক্ষা দেওয়ার জন্ম শিক্ষককে বিশেষ ধৈর্যশীল হ'তে হবে। একই বিষয় বার বার বলতে হবে। এদের উপর সহানুভূতিশীল হ'তে হবে।

ভালবাসা দিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এদের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর করাতে হবে। এদের অনেক সময় দৈহিক অসুস্থতার একটা প্রবণতা দেখা যায় ; সেইজন্য চিকিৎসার প্রয়োজন। এখানেও অবশ্য সহানুভূতি অনেকখানি কাজ করে।

সমস্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে স্বল্পবুদ্ধি শিশুদের সাধারণভাবে লেখাপড়া শেখানর চেষ্টা না করে—তাদের একেবারে আলাদা রকম শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আনা উচিত। অনেক অভিভাবক মনে করেন এতে বোধ হয় লজ্জার কিছু ব্যাপার আছে, কিন্তু আসলে তা নয়। যার যেমন শেখার ক্ষমতা তাকে সেইভাবে শিখতে হবে। আমাদের দেশে অবশ্য এমন শিশুদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা বিদ্যালয় খুব কমই আছে। কাজেই অগত্যা তাদের সাধারণ বিদ্যালয়ে টেনে আনতে হয়। তবে সাধারণ বিদ্যালয়ে এলেও এদের শিক্ষাব্যবস্থা পৃথক হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

(১) এদের কিছু যান্ত্রিক কাজ, আচার-আচরণ যেমন মুখ ধোয়া, কাপড় কাচা, পরিষ্কার থাকা ইত্যাদি শেখান দরকার। (২) এরা দলগত কাজে অংশ নিতে পারে ; কাজেই সে রকম কাজের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। (৩) বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধারণা দেওয়া যায়। (৪) যান্ত্রিক উপায়ে কিছু হস্তশিল্প শেখান যেতে পারে। (৫) সাধারণ কিছু ভাষা শিখে যেন এরা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে তা দেখতে হবে। (৬) সামান্য গান, আবৃত্তি ও খেলার মাধ্যমে কিছু জিনিস শেখান যেতে পারে। এইসব কারণেই শিক্ষককে এদের সঙ্গে থেকে অনেকটা সময় ব্যয় করতে হবে।

প্রশ্নাবলী

1. Who are exceptional children? Discuss how they should be educated? (C. U. B. T. '66)

2. Indicate at length the nature and needs of gifted children? (C. U. B. T. '68)

দশম অধ্যায়

ব্যক্তি জীবনের মূল্যায়ন

(Assessment of Individuals)

আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাক্ষেত্রে নানাভাবে নানা কাজের মূল্যায়ন করার পক্ষপাতী। অবশ্য ব্যক্তির বিভিন্ন গুণের মূল্যায়ন করার রীতি অনেক আগে থেকেই চলে আসছিল। যে সব পদ্ধতিতে এই মূল্যায়ন করা হ'ত সেগুলো সব সময় সঠিক ও যুক্তিযুক্ত হ'ত না। তাই উনবিংশ শতাব্দীতে এই কাজের জন্য নানারকম পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেক ব্যাপক। শিক্ষার দ্বারা আমরা শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মনোভাব, অনুরাগ ইত্যাদিরও বিকাশ করতে চাই। কিন্তু গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতির সাহায্যে ব্যক্তির এইসব বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করার বিশেষ কোন সুযোগ ছিল না। তাই এই পরীক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কাউকেই শিক্ষাকাজে বিশেষ অনুপ্রাণিত করতে পারত না।

বর্তমানকালে শিক্ষাবিদরা মনে করেন শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ পরিমাপ করার জন্য নানা রকম কৌশল প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। এইসব কৌশলকে বলা হয় অভীক্ষা। বস্তুর গুণ পরিমাপ করা যতটা সহজ ব্যক্তির গুণ পরিমাপ করা মোটেই অতটা সহজ নয়। ব্যক্তির গুণ পরিমাপের ক্ষেত্রে অধিকতর দক্ষতা, সাবধানতা, গুণ সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা ইত্যাদির একান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তির গুণাবলীর পরিমাপকে আমরা মোটামুটি ৫ ভাগে ভাগ করতে পারি।

(১) বুদ্ধির পরিমাপ—(Intelligence Test)

(২) ব্যক্তিত্বের পরিমাপ—(Personality Test)

(৩) প্রবণতার পরিমাপ—(Aptitude Test)

(৪) আগ্রহের পরিমাপ—(Test for Interest)

(৫) কৃতিত্বের পরিমাপ—(Achievement Test)

এখন আমরা দেখব অভীক্ষা কাকে বলে। সাধারণতঃ যখন যে কোন পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে আমরা কোন জিনিস পরিমাপ করে থাকি তখন

জিনিসটিকে যন্ত্রের মধ্যে বা পাশে রাখি। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে মানসিক বা শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য এরকম কোন যন্ত্র নেই। তাই এইসব বৈশিষ্ট্যকে আমরা আচরণের মধ্যে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করি। অর্থাৎ কতকগুলি অভীক্ষার সাহায্যে আমরা ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীর সামনে কতকগুলো উদ্দীপক (stimulus) উপস্থাপন করি। স্বাভাবিক নিয়মেই ব্যক্তি এইসব উদ্দীপকের সামনে প্রতিক্রিয়া (response) করে। এই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই তার বিশেষ ধরনের মানসিক ও শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। তাই মানসিক অভীক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানী মার্শাল বলেছেন—কতকগুলো উত্তেজনার সমষ্টি হল মানসিক অভীক্ষা; উত্তেজনাগুলো ব্যক্তির সামনে উপস্থিত করলে সে এমনভাবে সাড়া দিতে উদ্বুদ্ধ হয় যে এই সাড়ার মাধ্যমেই তার বিশেষ মানসিক অবস্থা ধরা পড়ে।*

মানসিক অভীক্ষার মত শিক্ষামূলক অভীক্ষাগুলোও কতকগুলো উত্তেজকের সমবায়। তবে অভীক্ষার মধ্যে যে সব উত্তেজক থাকে তাদের প্রকৃতি বিভিন্ন রকম হ'তে পারে। যেমন—শ্রেণীকরণ অভীক্ষা, উপমান অভীক্ষা ইত্যাদি।

ভাল অভীক্ষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন অভীক্ষাটির যাথার্থ্য (validity) থাকবে, অভীক্ষাটি নির্ভরযোগ্য হবে (reliability), অভীক্ষাটি নৈর্ব্যক্তিক (objectivity) হবে।, অভীক্ষার সাহায্যে কোন কিছু পরিমাপ করতে গিয়ে তার তাৎপর্য নির্ণয়ে ভুল না থাকে তা দেখতে হবে। সেইজন্য অভীক্ষাটির একটা স্থির বিশ্লেষণ পদ্ধতি থাকা দরকার। একে বলা হয় Standardization of Test।

পরীক্ষা ও অভীক্ষার মধ্যে মূলগত পার্থক্য রয়েছে। পরীক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল—

(১) শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করা,

(২) শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের সাফল্য নিরূপণ করা,

(৩) উচ্চ স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রবেশ করা,

(৪) বিভিন্ন কর্ম প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করা,

(৫) সাম্মানিক অর্থ সাহায্যের (scholarship) জন্য ছাত্র নির্বাচন করা,

(৬) ছাত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে হদিশ দেওয়া,

* "A psychological test is a patteen of stimuli selected and organised to elicit responses which will reveal certain psychological characteristics in the person who takes them." - Mursbell.

(৭) ছাত্রের বিশেষ বিষয়ে দুর্বলতা নির্ণয় করা,

(৮) বিদ্যালয়ের সংগঠন কাজে সাহায্য করা,

(৯) শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশ দেওয়া,

(১০) শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা জাগ্রত করা ইত্যাদি।

কিন্তু পরীক্ষার মধ্যে কতকগুলি গুরুতর ত্রুটি লক্ষ্য করে বর্তমানের অনেক শিক্ষাবিদ মন্তব্য করেছেন নানাভাবে। W. H. Ryburn পরীক্ষা পদ্ধতির উপর তীব্র কটাক্ষ করে বলেছেন—"It goes without saying that examination are the enemies of creative work, at least as they are usually educated."

এই পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলতে হয়—

(১) পরীক্ষা একান্তই রচনাধর্মী।

(২) এর কোন স্থির উদ্দেশ্য থাকে না।

(৩) যেমন তেমন করে পরীক্ষায় পাশ করাকেই ছাত্রছাত্রীরা বেশী মূল্য দেয়।

(৪) পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা অনেক কম।

(৫) পরীক্ষার্থীকে অনেক সময় chance বা ভাগ্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

(৬) পরীক্ষার সাহায্যে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীর খণ্ডিত জ্ঞানের পরিমাপ করা হয়। সামগ্রিক পারদর্শিতার উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

(৭) ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে।

(৮) বিভিন্ন শিক্ষার্থীর ফলাফলের তুলনা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

(৯) শিক্ষকের উপর অযথা চাপ পড়ে।

(১০) শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের ঠিকমত পরিমাপ করা যায় না। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর চারিত্রিক গুণগুলির মূল্যায়নে অসমর্থ।

কিন্তু অভীক্ষাগুলির উদ্দেশ্য অনেক ব্যাপক। এটি নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ। এটি পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর উপর নির্ভর করে না। অভীক্ষার একাধিক উত্তর থাকে না—একটিই উত্তর থাকে। সেইজন্য শিক্ষার্থীর ভাগ্য পরীক্ষকের খেয়ালের উপরে নির্ভর করে না। অভীক্ষাগুলি তৈরী করতে সময় লাগলেও এগুলিতে marks দিতে ও ব্যাখ্যা করতে তেমন সময় লাগে না। অভীক্ষা সমগ্র

পাঠ্যপুস্তকের উপর করা হয়। তাই এখানে শিক্ষার্থীর বেছে পড়ার সুযোগ কম। অভীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীর প্রকৃত জ্ঞানের ও চারিত্রিক বিভিন্ন গুণের মূল্যায়ন করা যায়। তাই অভীক্ষার সাহায্যে মূল্যায়ন অনেক উৎকৃষ্ট পন্থা। Clara M. Brown বলেছেন—' Evaluation is essential in the neverending cycle of formulating goals, measuring progress towards them and determining the new goals . ".

এই অভীক্ষা নানা রকমের হ'তে পারে। প্রথমে ধরা যাক, স্মরণ অভীক্ষা। এর মধ্যে আবার ভাগ আছে। যেমন—
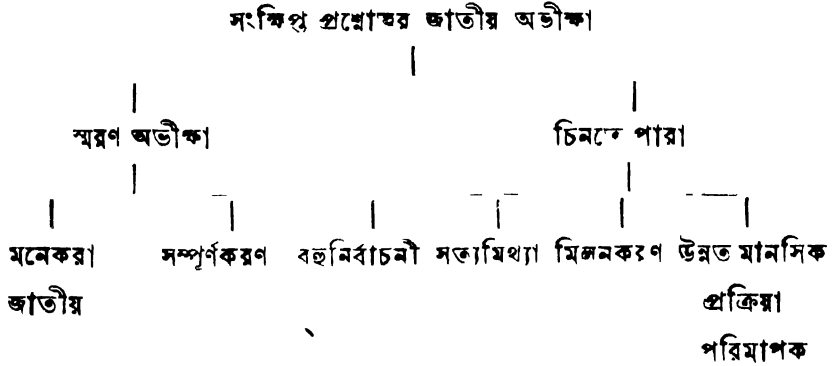
(ক) সম্পূর্ণীকরণ—(১) সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক —— ভারতবর্ষে অসেন।

(২) গীতাঞ্জলি রচনা করেন ——।

(খ) প্রশ্নবোধক—সন্ধির সময় অ, আ এর পর অ কিংবা আ থাকলে উভয় মিলে কি 'আ' কার হয় ?

(গ) বিবৃতি ধরনের—পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ——।

পলাশীর যুদ্ধ হয় —— সালে।

"Evaluation is a relatively new technical term, introduced to design a more comprehensive concept of measurement than is implied in conventional tests and examinations evaluation involves the identification and formulation of a comprehensive range of the major objectives of a curriculum.. ".

Wright Stone

(ঘ) উদ্দীপক শব্দ—জায়গার নাম কোথায় অবস্থিত।

জায়গার নাম	কোথায় অবস্থিত
ইলোরা	——।
নালান্দা	——।
মহেঞ্জোদরো	——।

এবার আমরা দেখব চিনতেপারা জাতীয় অভীক্ষা কোনগুলি।

(ক) বহুনির্বাচনী (Multiple choice test)।

(১) কালিদাস রাজনীতিবিদ / নাট্যকার / যোদ্ধা ছিলেন।

(২) হিউয়েন সাঙ বৌদ্ধ / হিন্দু / মুসলমান ছিলেন।

(খ) সত্য মিথ্যা (True-false test)।

(১) বুদ্ধদেব যীশুখৃষ্টের আগে জন্ম গ্রহন করেন।—সত্য / মিথ্যা।

(২) বেদ বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ।—সত্য / মিথ্যা।

(গ) মিলন করণ (Matching test)।

এই অভীক্ষায় দুটি পাশাপাশি তালিকা-স্তম্ভে প্রশ্নের উত্তরগুলি এলোমেলোভাবে সাজান থাকে। উত্তরগুলির পাশে প্রশ্নের নম্বর বসিয়ে উত্তরগুলি সাজাতে হয়। যেমন—

(১) দিল্লী—	স্বর্ণ মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।—
(২) টাটানগর—	১৯৪৮ সাল।
(৩) অমৃতসর—	উত্তর প্রদেশের রাজধানী।
(৪) গান্ধীজীর মৃত্যু—	ইস্পাত উৎপাদনকেন্দ্র।
(৫) শরৎচন্দ্র—	ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।
(৬) জওহরলাল—	বিশ্ব কবি।
(৭) রবীন্দ্রনাথ—	কথাশিল্পী।

(ঘ) উন্নত মানসিক প্রক্রিয়া পরিমাপক (Tests for higher mental process)।

এই সব অভীক্ষায় নতুন পরিস্থিতিতে অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ দেখা হয়।

(ক) উপমান অভীক্ষা (Analogy test)।

(১) আলোর সাথে আঁধারের যে সম্বন্ধ, দিনের সাথে—সে সম্বন্ধ।

(২) বাবার সঙ্গে মায়ের যে সম্পর্ক, স্বামীর সঙ্গে—সে সম্পর্ক।

(খ) শ্রেণীকরণ অভীক্ষা (Cassification test)।

(১) কলকাতা, হিমালয়, দিল্লী, বিন্ধ্য ইত্যাদি।

(২) কাপড়, খাতা, জামা, পেন্সিল, গেঞ্জী, মোজা, রবার ইত্যাদি।

কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে যে পদ্ধতিগুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলি নিম্নরূপ—

(১) বুদ্ধি অভীক্ষা—(Intelligence Test)।

(২) কৃতিত্বের অভীক্ষা—(Achievement Test)।

(৩) প্রবণতার অভীক্ষা—(Aptitude Test)।

(৪) ব্যক্তিত্বের অভীক্ষা—(Personality Test)।

(৫) মনোভাব ও ব্যবহার অভীক্ষা—(Test of Attitude & Behaviour)।

(৬) রেটিং স্কেল—(Rating scale)।

(৭) প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি—(Questionnaires and check tests)।

(৮) সাক্ষাৎকার—(Interview)।

(৯) ব্যক্তিজীবনের ধারাবাহিক বিবরণী—(Anecdotal Records)।

(১০) আত্মজীবনী পদ্ধতি— Auto-biographical Method।

(১১) ছাত্রছাত্রীর নিজের রোজনামচা—(Pupil's Diary)।

(১২) পরিবারগত ইতিহাস (Case history)।

(১৩) সমাজমিতিমূলক পদ্ধতি—(Sociometric Methods)।

(১৪) প্রতিফলন অভীক্ষা—(Projective Techniques) ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে একথা বলা যায় আগেকার পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটিগুলি দূর করতে গিয়ে নানারকম পদ্ধতির অবতারণা করা যেতে পারে। আগেকার পরীক্ষাপদ্ধতি ছিল রচনাধর্মী। রচনাধর্মী পরীক্ষার সুফল কুফল দুই-ই আছে। কুফলগুলি দূর করে রচনাধর্মী পরীক্ষাকেও ব্যক্তির বিভিন্ন গুণ পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া মৌখিক পরীক্ষা, ব্যবহারিক পরীক্ষা (practical), বিষয়াত্মক পরীক্ষা (objective Test), শিক্ষকের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ইত্যাদিও এই কাজের সহায়ক হোতে পারে।

যে অভীক্ষাগুলির কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলির অধিকাংশই বিষয়াত্মক প্রশ্নের (objective type of questions) উপরে নির্ভরশীল। তাই বিষয়াত্মক প্রশ্নের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি অভীক্ষাগুলিকেও স্পর্শ করে।

আধুনিক অভীক্ষার ত্রুটি বা অসুবিধা।

(১) এই অভীক্ষাগুলি রচনা করতে বহু সময়ের প্রয়োজন।

(২) অভীক্ষাগুলির রচনা কৌশল আয়ত্ত করতে হলে বিশেষ শিক্ষণের প্রয়োজন।

(৩) অভীক্ষার উত্তর দেওয়ার সময় শিক্ষার্থী অনেক সময় সঠিক উত্তর না জেনে অনুমান করে উত্তর দেয়।

(৪) অভীক্ষার সাহায্যে ঘটনামূলক জ্ঞানের পরিমাপ করা যায়, কোন রসানুভূতি, উপলব্ধি ও চিন্তাধারার পরিমাপ এতে হয় না।

(৫) অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন নতুন অভীক্ষাতেও ব্যক্তির প্রভাব থাকে।

(৬) এর মধ্যে শিক্ষার্থীর রচনাধর্মী ক্ষমতা পরিমাপের সুযোগ কম। এখানে শিক্ষার্থীর মৌলিকত্ব দেখাবার সুযোগ নেই।

(৭) নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাপত্রে সত্য মিথ্যা বিচারের ক্ষেত্রে মিথ্যা ঘটনার উল্লেখ শিক্ষার্থীর গ্রহণোন্মুখ মনের কাছে উপস্থাপন করা মনস্তত্ত্ব সম্মত নয়।

(৮) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নগুলির উত্তরের জন্য যে নির্দেশ দেওয়া হয় তা ভাল করে মানতে হলে অন্যান্য মানসিক শক্তিরও প্রয়োগ প্রয়োজন।

কিন্তু এ সব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আজকাল এই অভীক্ষাগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ অভীক্ষাগুলি গতানুগতিক পরীক্ষার চেয়ে অনেক বেশী নির্ভরশীল; যথার্থ বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ। কাজেই এই জাতীয় অভীক্ষার সাহায্যে ব্যক্তির গুণাগুণ মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করলে ফল নিঃসন্দেহে ভালই পাওয়া যাবে।

অভীক্ষালব্ধ ফলকে অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। কারণ অভীক্ষালব্ধ ফলকে এককভাবে বিচার করে শুধু তার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আমাদের ভুল থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বিভিন্ন শ্রেণীর অভীক্ষার বিবরণ (Description of different types of Test)

কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর অভীক্ষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কি তা আলোচনা করা যাক। যেমন—

শিক্ষামূলক অভীক্ষা (Educational Test)

এই অভীক্ষাকে সাধারণতঃ দু ভাগে ভাগ করা হয়—

(১) পারদর্শিতার অভীক্ষা (achievement Test) ও (২) নির্ণায়ক অভীক্ষা (diagnostic Test)।

পারদর্শিতার অভীক্ষার দ্বারা কোন শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কি পরিমাণ শিক্ষাগত বিকাশ হয়েছে তা একটি মাত্র সংখ্যামানের দ্বারা বিচার করে জানা যায়। এই অভীক্ষার সাহায্যে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের যেমন অঙ্ক, বাংলা, ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির পারদর্শিতা জানা যায়।

অন্যদিকে নির্ণায়ক অভীক্ষার দ্বারা কোন শিক্ষার্থী কোন নির্দিষ্ট বিষয় আয়ত্ত করতে কি অসুবিধা বোধ করছে তা নির্ণয় করা যায়। এই অভীক্ষায় একক সংখ্যামানের উপর নির্ভর করতে হয় না। শিক্ষার্থী ভালভাবে বুঝে কি ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে আর কি ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না সেগুলোই বেশী করে লক্ষ্য করা হয়।

এ ছাড়া আছে আদর্শায়িত পারদর্শিতার অভীক্ষা (Standardised achievement Test)—এই অভীক্ষার সাহায্যে কোন বিষয়ের কেন্দ্রিক জ্ঞান পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়। এখানকার অভীক্ষাপদগুলো (Test item) বিষয়টির সামগ্রিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে রচিত হয়। এই অভীক্ষা তৈরী করতে হ'লে নানা রকম কৌশল আয়ত্ত করতে হয় এবং এটি বিশেষ পরিশ্রম-সাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এখানে একটা বিষয়ের ঠিক কোন জায়গায় অসুবিধা তা দেখা হয়। যেমন অঙ্ক শিখতে হলে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এর মধ্যে ঠিক কোনটা শিক্ষার্থী শিখতে পারছে না তা দেখা হয়। যেটাতে অসুবিধা সেটা শেখানর জন্য বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজস্ব অসুবিধাগুলি একে একে দূর করতে পারলে তবেই আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে।

সম্ভাব্য দক্ষতার পরিমাপ (Aptitude Test)

মনোবিজ্ঞানী স্পিয়ারম্যান-এর উক্তি থেকে আমরা জানতে পারি যে মানুষের যে কোন রকম বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে দুরকম মানসিক উপাদান কাজ করে—একটা হচ্ছে সাধারণ উপাদান আর একটা হচ্ছে বিশেষ উপাদান। এই বিশেষ উপাদানকে পরিমাপ করার জন্য নানা রকম অভীক্ষা তৈরী

হয়েছে। আজকাল মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন বিশেষ ক্ষমতা সাধারণ মানসিক ক্ষমতার মতই ব্যক্তিজীবন বিকাশের পক্ষে একান্ত সহায়ক। সেইজন্য সাধারণ মানসিক ক্ষমতা পরিমাপ করার চেয়ে, সেই ক্ষমতার দ্বারা ব্যক্তিজীবন বিকাশের সম্ভাবনাকে পরিমাপ করলে অনেক বেশী লাভজনক হবে। তাই বর্তমানে শুদ্ধ ক্ষমতার চেয়ে ক্ষমতার সম্ভাব্যতাকে পরিমাপ করা হয়। এই সম্ভাব্য ক্ষমতাই ব্যক্তিজীবনের বিশেষ দক্ষতা (aptitude)। বিশেষ দক্ষতা মাপার জন্য যে সব অভীক্ষা তৈরী হয়েছে তাদের বলা হয় সম্ভাব্য দক্ষতার অভীক্ষা (Aptitude Test)।

আজকাল নানা রকম সম্ভাব্য দক্ষতা অভীক্ষা তৈরী হয়েছে। যেমন ষ্টেনকুইষ্ট্-এর যান্ত্রিক দক্ষতা পরিমাপক অভীক্ষা, সিসোর-এর সংগীতের দক্ষতা পরিমাপক অভীক্ষা ইত্যাদি। এইসব অভীক্ষার দ্বারা যান্ত্রিক দক্ষতা, সংগীতের দক্ষতা কি পরিমাণে আছে তা জানা যায় ও প্রশিক্ষণের দ্বারা তা কতটা বিকাশ হোতে পারে তাও জানা যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধরনের অভীক্ষা প্রয়োগ করে আমরা অনেক সুফল পেতে পারি; বিশেষ করে শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনার ক্ষেত্রে এই অভীক্ষা শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রসূ হোতে পারে।

অনুরাগের অভীক্ষা (Interest inventory)

শিক্ষাকাজ ঠিকভাবে পরিচালনা করতে হ'লে ও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক নির্দেশনা দিতে হলে, তাদের কোনদিকে কতটা অনুরাগ আছে তা পরিমাপ করা প্রয়োজন।

বর্তমানে অনুরাগ পরিমাপের জন্য যতগুলি অভীক্ষা আছে তাদের মধ্যে স্ট্রং-এর (Strong) অভীক্ষা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আছে কুডারের (Kuder) অভীক্ষা।

বিদ্যালয়ে বুদ্ধির অভীক্ষা, ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের অভীক্ষা ইত্যাদির সাহায্যেও শিক্ষার্থীর যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা জানতে পারি তার উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীর শিক্ষা সম্বন্ধে নির্দেশনা দেওয়া চলে।

What are the Educational and Psychological Tests? Discuss the usefulness of some of these tests in the field of education.

একাদশ অধ্যায়

শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পথনির্দেশ

Educational and Vocational guidance

শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতির পরিচয় আমরা পাই 'নির্দেশনার ধারণার' বিকাশ থেকে। এই নির্দেশনা যে কেবল শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় তা নয় সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এটি আজকাল ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু নির্দেশনা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা এখনও গড়ে ওঠে নি। তাই এখন আমরা দেখব নির্দেশনা বলতে আমরা কি বুঝি।

নির্দেশনার অর্থ কি? (Meaning of guidance)—ইংরাজী guidance কথাটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা চলে। নির্দেশনা বলতে—নির্দেশ করা (to point out), পরিচালনা করা (to direct), সাহায্য করা (to help) ইত্যাদি বোঝায়। এক কথায় বলা যেতে পারে যে কোন অজানা পথের নির্দেশ দিয়ে, সেই পথে পরিচালনা করতে সাহায্য করাই হ'ল নির্দেশনা। আগেকার দিনের বিদ্যালয় কেবলমাত্র বিদ্যাবিতরণ করেই সন্তুষ্ট থাকত, ছাত্ররা বিতরিত বিদ্যা কতটা গ্রহণ করতে পারল তা বিচার করে দেখা কর্তব্য বলে মনে করত না। কিন্তু বর্তমানের বিদ্যালয় চায় বিদ্যার্থীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে। তাই বিদ্যার্থীর গৃহ পরিবেশ, অভিজ্ঞতা, প্রাক্ষোভিক বিকাশ ইত্যাদি জেনে তবে বিদ্যালয় শিক্ষা সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়ার পক্ষপাতী। যিনি প্রকৃত নির্দেশক তিনি কখনও নিজের মত অন্যের ওপর চাপিয়ে দেন না। কারও সাহায্যের প্রয়োজন হলে তিনি পিছনে থেকে সাহায্য করেন মাত্র।

অধ্যাপক জোনস্ বলেন, নির্দেশনার মধ্যে ব্যক্তিগত সাহায্যের প্রয়োজন থাকে কিন্তু এই সাহায্য একটু অন্যরকমের। নির্দেশনা বলতে সেইরকম সাহায্যকেই বলা হয় যা সাহায্যপ্রার্থীর উদ্দেশ্যে পৌঁছতে তাকে সাহায্য করে, এবং ব্যক্তিকে তার সমস্যা সমাধানের জন্য তৈরী হোতে সাহায্য করে। নির্দেশনার প্রধান কাজ হ'ল ব্যক্তির সমস্যা সমাধান নয়, ব্যক্তি যাতে নিজের

"Guidance involves personal help, given by some one ; it is designed to assist a person in deciding where he wants to go, what he wants to do or how he can best accomplish his purposes .... ". Jones.

সমস্যা নিজে সমাধানে করতে পারে সে বিষয়ে তাকে সাহায্য করা। এই আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে—ব্যক্তির আত্মমুখী বিকাশে তাকে সাহায্য করার প্রক্রিয়াই হ'ল নির্দেশনা। মনোবিজ্ঞানী ক্রো বলেছেন, 'যে কোন ব্যক্তি অন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে যে সাহায্য পায়, তাই হ'ল নির্দেশনা।' এদিক থেকে বিচার করলে শিক্ষাকেও এক ধরনের নির্দেশনা বলা চলে। অবশ্য শিক্ষা ও নির্দেশনা উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। কারণ উভয়েই ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে ব্রতী।

নির্দেশনার শ্রেণীবিভাগ

এখন দেখা যাক নির্দেশনা কত রকমের হোতে পারে। ব্যক্তি জীবনের যে কোন ক্ষেত্রের বিকাশে সাহায্য করে নির্দেশনা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের একটি আচরণের ক্ষেত্রকে অন্য আচরণের ক্ষেত্র থেকে আলাদা করা যায় না। তাই ব্যবহারিক কার্যক্ষেত্রে একটি নির্দেশনাকে অপরটি থেকে আলাদা করলেও, একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি প্রায় অর্থহীন হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র অনুযায়ী নির্দেশনার বিভিন্ন নামকরণ করা হয়। যেমন—

(১) শিক্ষামূলক নির্দেশনা (Educational guidance)।

(২) বৃত্তিমূলক নির্দেশনা (Vocational guidance)।

(৩) ধর্মীয় নির্দেশনা (Religious guidance)।

(৪) ব্যক্তিসত্তার বিকাশমূলক নির্দেশনা (Personality guidance)।

(৫) সামাজিক নির্দেশনা (Social guidance)।

(৬) পারিবারিক নির্দেশনা (Family guidance)।

(৭) দৈহিক বিকাশমূলক নির্দেশনা (Guidance for physical development)।

(৮) অবসর যাপনের নির্দেশনা (Leisure time guidance)।

নির্দেশনার এইসব শ্রেণী বিভাগ কেবলমাত্র ব্যবহারিক সুবিধার জন্য করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এদের মধ্যে কোন স্থির সীমারেখা নেই। এখন আমরা শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনার মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের এই ধারণা পরিষ্কার হয়েছে যে শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনার উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে সাহায্য করা। মনোবিজ্ঞানী সুপার (super)

বলেছেন—"Vocational guidance is the process of helping a person to develop and accept an integrated picture of himself and of his role in the world of reality, to test that self-concept against reality and to convert that into reality with satisfaction to himself and benefit to society." সুপারের এই সংজ্ঞা থেকে আমরা বুঝতে পারি নির্দেশনার ব্যক্তিকে আত্ম-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে ও তার কর্তব্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণার বিকাশে সাহায্য করা যায়। এবং এই সাহায্যের ফলে ব্যক্তির নিজের আত্ম-তৃপ্তি আসে ও সামাজিক উন্নতি হয়।

একইভাবে বলা যায় শিক্ষামূলক নির্দেশনার কাজ হ'ল শিক্ষার্থীকে তার নিজের ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করতে সাহায্য করা। শিক্ষামূলক নির্দেশনার উদ্দেশ্য হ'ল—

(১) বিদ্যালয় নির্বাচন করতে সাহায্য করা।

(২) শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠ্যবিষয় নির্বাচন করতে সাহায্য করা।

(৩) নির্বাচিত পাঠ্যসূচী ঠিক ভাবে আয়ত্ত করতে সাহায্য করা।

(৪) বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজনে সাহায্য করা।

(৫) কোন বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হোতে সাহায্য ক· ইত্যাদি।

বৃত্তিমূলক নির্দেশনারও আবার কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। যেমন—

(১) কোন ব্যক্তিকে তার বৃত্তি নির্বাচনে সহায়তা করা।

(২) ব্যক্তিকে তার বৃত্তির উপযোগী করে তৈরী করা।

(৩) ব্যক্তির প্রকৃতি অনুযায়ী বৃত্তি খুঁজে পেতে সাহায্য করা।

(৪) ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অভিযোজনমূলক কাজে সাহায্য করা।

নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা (Need for guidance)

এখন আমরা দেখব নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা কি।

মানুষকে সমাজ বাস করতে হলে একে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

তবে কেউ হয়তো কম সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করে, আবার কেউ বা বেশী। এই নির্ভরতার নীতির উপর ভিত্তি করেই নির্দেশনার ব্যবস্থা গড়ে উঠছে।

আধুনিক সমাজে শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনার প্রয়োজন বেশী করে অনুভূত হচ্ছে। কারণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষায় গণতান্ত্রিকতা প্রবেশলাভ করেছে। ফলে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেকগুণ বেড়ে গেছে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিভিন্ন ও তারা আসছে বিভিন্ন পরিবেশ থেকে। কাজেই পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে নানা রকম বিষয়ের অবতারণা করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র একদিকে বহুবিধ পাঠ্যবিষয় ও অন্যদিকে বিভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী থাকলেই হবে না— এই দুইয়ের মধ্যে সংযোগস্থাপনের জন্যই নির্দেশনার প্রয়োজন। নির্দেশনাই বলে দেবে কোন শিক্ষার্থীর কি ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা হওয়া উচিত। তাছাড়া আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে নানারকমের পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে। শিক্ষার আদর্শ, বিদ্যালয় সংগঠন, পাঠদানপদ্ধতি ইত্যাদির মধ্যে অনেক অভিনবত্ব দেখা যাচ্ছে। এই সব নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে শিক্ষার্থীর অভিযোজন করতে হলে নির্দেশনার একান্ত প্রয়োজন।

এতো গেল ব্যক্তিগত শিক্ষাগত নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তার কথা। সমাজের দিক থেকেও নির্দেশনার প্রয়োজন আছে। কারণ আধুনিক কালে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিরও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে মোকাবিলা করতে হ'লে নির্দেশনার প্রয়োজন। সুতরাং আমরা বলতে পারি দুদিক থেকে নির্দেশনার প্রয়োজন আছে— ব্যক্তিগত ও সমাজগত দিক থেকে।

সামাজিক দিক থেকে নির্দেশনার গুরুত্ব—সামাজিক নির্দেশনার কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে বৃত্তিমূলক নির্দেশনার কথা। বৃত্তিমূলক নির্দেশনা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন ?

(১) অতি আধুনিককালে দেখা যাচ্ছে গৃহের ও পরিবারের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আগে শিশুরা একান্নবর্তী পরিবারের বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে নানান জিনিস শিখত ও নানারকম বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণও তাদের হ'ত। তাদের এইসব শিক্ষা পর্যবেক্ষণ ও অনুকরণের মাধ্যমে ঘটত। কিন্তু এখন পরিবার বলতে মা, বাবা, ভাই, বোন বোঝায়। তাছাড়া মা বাবার সময় তেমন হয় না ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা দেবার। হয়তো বা দুজনকেই

কাজে বেরুতে হয়। কাজেই গৃহের শিক্ষার ভার বিদ্যালয়ের উপরই বর্তেছে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের দায়িত্ব কেবল পুঁথিগত শিক্ষা দেওয়া নয়—ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবনের জন্যও যে শিক্ষার প্রয়োজন তাও দিতে হবে বিদ্যালয়কে।

(২) আধুনিক যুগকে বিশেষীকরণের যুগ বলা হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিশেষ ধরনের কাজে অভ্যস্ত হোতে হবে। তার ফলে সে যেটুকু জানবে তা বেশ ভালভাবে জানবে। একজনকে অনেক জিনিস জানতে হ'লে কোনটাই ভাল করে তার জানা হয় না। তাই বিশেষ কাজের জন্য নির্দেশনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

(৩) বর্তমান যুগকে শিল্পযুগও বলা চলে। এই শিল্পকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নিতে হ'লে নির্দেশনার প্রয়োজন।

(৪) এখন দেখা যায় শিক্ষা সম্বন্ধে মানুষ অনেক সচেতন হয়েছে। শিশুরা অনেকটা সময় এখন বিদ্যালয়ে কাটায়। সুতরাং এখান থেকেই যাতে তারা বৃহত্তর জীবনের প্রস্তুতি নিয়ে যেতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হ'লে নির্দেশনার প্রয়োজন।

(৫) শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাধিক্যের ফলে দেখা যাচ্ছে প্রকৃত মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন অনেকেই দারিদ্র্যের জন্য পড়তে পাচ্ছে না; আবার আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য অনেক স্বল্পমেধাবী ছাত্র বিদ্যালয়ে পড়তে আসছে। এতে অর্থনৈতিক ও মানসিক ক্ষমতার অপচয় হচ্ছে। এটি দূর করতে হ'লে নির্দেশনার একান্ত প্রয়োজন।

(৬) বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলে যন্ত্রসভ্যতার বিকাশ হয়েছে। আজকের মানুষের হাতে খানিকটা অবসর মিলেছে। এই অবসরই নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। অবসর যাপনের ঠিকমত ব্যবস্থা করতে হবে নির্দেশনার সাহায্যে; তা না হ'লে অবসর সময়েই মানুষ অসামাজিক কাজে প্রবৃত্ত হবে।

(৭) সামাজিক পরিবর্তনের সাথে ধর্মীয় ও নৈতিক পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হচ্ছে। মানুষের ধর্মবোধ ও নীতিবোধ কমে যাচ্ছে—আত্মবিশ্বাসও টলে যাচ্ছে। এগুলি আবার ফিরিয়ে আনতে হ'লে সার্থক নির্দেশনার প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে কোঠারী কমিশনের সুপারিশগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কোঠারী কমিশন বলেছেন নির্দেশনা শিক্ষার এক অপরিহার্য অঙ্গ—"Guidance and counselling should be regarded as an integral

part of education meant for all students and aimed at assisting the individual to make decisions and adjustments from time to time."

শিক্ষাক্ষেত্রে নির্দেশনা

শিক্ষাক্ষেত্রেও বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে নির্দেশনার গুরুত্ব অনেকখানি বেড়েছে। সর্বশেষ শিক্ষা কমিশন (কোঠারী কমিশন—১৯৬৬) মন্তব্য করেছেন—"The aim of guidance is both adjustive and developmental, it helps the students in making the best possible adjustment to the situations in educational institution and in home and at the same time facilitates the development of personality." শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব পরিবর্তন নির্দেশনাকে একান্ত প্রয়োজনীয় করে তুলেছে সেগুলি হ'লো—

(১) বর্তমান কালে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে অনেক বৃত্তিমূলক বিষয় সংযোজিত হয়েছে। এইসব বৃত্তিমূলক বিষয়গুলির মধ্যে কোনটা কোন শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযুক্ত তা ঠিক করে দিতে হ'লে নির্দেশনার প্রয়োজন।

(২) পাঠ্যক্রমের পরিধিও এখন অনেকটা বিস্তৃত হয়েছে। এখন আর বহির্ভূত (extra-curricular) বিষয় বলে কোন বিষয় নেই। এখন পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বিষয়গুলি হ'য়ে গেছে সহপাঠ্যক্রমিক বিষয়। এই সহপাঠ্যক্রমিক বিষয়গুলিই শিক্ষার্থীর পূর্ণবিকাশে সাহায্য করে। এগুলির সার্থকভাবে পরিচালনার জন্য নির্দেশনার প্রয়োজন।

(৩) আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ব্যক্তিগত বিকাশের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়। শিক্ষককে ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী তার শিক্ষাদানের পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে। এই নির্বাচনের জন্য শিক্ষককে নির্দেশনার সাহায্য নিতে হবে।

(৪) ভারতের মত গরীব দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে অনেক শিক্ষার্থীকেই কোন-না-কোন কাজে যোগদান করতে হয়। তাই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজের প্রতি ছাত্রাছাত্রীদের যাতে অনুরাগ সৃষ্টি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক অনুরাগ সৃষ্টি করতে হলেও শিক্ষককে নির্দেশনার সাহায্য নিতে হবে।

শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা পরিচালনা (Organisation of guidance work)

শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা পরিচালনা করতে হ'লে কতকগুলি কর্মপন্থা ঠিক করে নিতে হবে। যেমন—

(১) নির্দেশনার উদ্দেশ্য কি তা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করতে হবে।

(২) বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে ও সেই তথ্যগুলিকে নির্দেশনার কাজে লাগাতে হবে।

(৩) নির্দেশনার জন্য একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে।

(৪) নির্দেশনার বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

(৫) নির্দেশনা পরিচালকদের কর্তব্য ও দায়িত্বগুলিকে যথাযথভাবে বণ্টন করতে হবে।

(৬) নির্দেশনার জন্য অত্যাবশ্যক জিনিসের সংখ্যা সীমিত রাখতে হবে।

(৭) নির্দেশনা পরিচালনার জন্য একজন যোগ্য নেতা ঠিক করতে হবে।

(৮) নির্দেশনার পরিচালকমণ্ডলীকে যৌথ প্রচেষ্টায় কাজ চালাতে হবে। তবেই নির্দেশনার কাজ সার্থক রূপ নেবে।

নির্দেশনার বিভিন্ন তথ্য

এখন আমরা দেখব, যে-ব্যক্তিকে নির্দেশনার আওতায় আনা হবে তার সম্বন্ধে কোথা থেকে কি ভাবে তথ্য সংগ্রহ করব। সাধারণতঃ শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনার জন্য মনোবিজ্ঞানীরা চার রকমের তথ্যের কথা বলেছেন। এগুলি হ'ল—(১) ব্যক্তিগত তথ্য (Individual data) (২) সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্য (Socio-economic data) (৩) বৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য (Occupational data) (৪) শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য (Educational data)।

(১) ব্যক্তিগত তথ্য (Individual data)—শিক্ষামূলক বা বৃত্তিমূলক যে রকম নির্দেশনাই দেওয়া হোক না কেন যে-ব্যক্তিকে নির্দেশনা দেওয়া হবে তার সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতা, প্রবণতা, আগ্রহ, অনুরাগ, বৈশিষ্ট্য কি রকম আছে তা ভালভাবে জানলে তবেই তাকে নির্দেশনা দেওয়া যাবে। আজকাল ব্যক্তির বিভিন্ন রকম ক্ষমতা জানার জন্য নানারকমের অভীক্ষার সাহায্য নেওয়া হয়—যেমন পারদর্শিতা পরিমাপক অভীক্ষা (Achievement test), বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence test),

সম্ভাবনার অভীক্ষা (Aptitude test), ব্যক্তিসত্তা পরিমাপক অভীক্ষা (Personality test) ইত্যাদি। এই সব অভীক্ষার ফল ও বিভিন্ন ব্যক্তির পর্যবেক্ষণ থেকে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেওয়া যায়। ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ঠিকভাবে না জানলে কিন্তু নির্দেশনার সাহায্যে তার কি রকম সাহায্যের প্রয়োজন তা ঠিক করা যাবে না। তাই প্রথমেই জানতে হবে শিক্ষার বা কাজের কোন কোন ক্ষেত্রে তার সাফল্যের সম্ভাবনা আছে।

(২) সামাজিক ও অর্থ নৈতিক তথ্য (Socio-economic data)—ব্যক্তির সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবেশ সম্বন্ধেও ভাল রকম ধারণা থাকা প্রয়োজন। নির্দেশনা বলতে কেবলমাত্র মৌখিক উপদেশ বোঝায় না। নির্দেশনা দেওয়ার পর দেখতে হবে সেই ব্যক্তি নির্দেশিত পথে বিকাশের সুযোগ পাবে কি না। তাই নির্দেশনা দেবার আগে, ব্যক্তির পরিবার, পরিবেশ, অর্থ নৈতিক অবস্থা, বাবা, মা কি কাজ করেন ইত্যাদি জেনে নেওয়া আবশ্যক। এই তথ্যগুলির উপর নির্ভর করে ব্যক্তির পাঠক্রম ও বৃত্তি নির্বাচন করলে তবেই তা ফলপ্রসূ হোতে পারবে।

(৩) বৃত্তিমূলক তথ্য (Occupational data)—কোন ব্যক্তিকে নির্দেশনা দিতে গেলে—বিশেষ করে বৃত্তিমূলক নির্দেশনার ক্ষেত্রে—যিনি নির্দেশনা পরিচালনা করবেন তাঁর বিভিন্ন বৃত্তি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। যেমন বিভিন্ন কর্মপ্রতিষ্ঠানে কি ভাবে কাজ হয়, কি রকম পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, কি ধরনের উন্নতির সুযোগ আছে ইত্যাদির যেমন খবর রাখতে হবে তেমনি নির্দেশককে জানতে হবে কি কি দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য থাকলে কি ধরনের কাজ পাওয়া যায়। প্রত্যেক কাজেই নিযুক্ত ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন আছে। শিক্ষকতার জন্য যে রকম মানসিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন, কারখানায় কাজ করতে হ'লে সে রকম মানসিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হয় না।

বৃত্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আজকাল মনোবিজ্ঞানীরা যে কৌশল প্রয়োগ করেন তাকে কর্ম-বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Job analysis) বলা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন সংস্থা থেকে, এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ (Employment Exchange) থেকেও বৃত্তি সম্পর্কে নানান তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

(৪) শিক্ষামূলক তথ্য (Educational data)।

শিক্ষামূলক নির্দেশনার জন্য শিক্ষামূলক তথ্য সংগ্রহ করা একান্ত

প্রয়োজন। যেমন প্রত্যেক শিক্ষাস্তরে কি রকম বিদ্যালয় আছে, কি ধরনের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয়, কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হ'লে কি ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা দরকার ইত্যাদি জানা দরকার। বিভিন্ন ধরনের মানসিক ক্ষমতা, মানসিক প্রস্তুতি ও অনুরাগের প্রয়োজন। তাই কোন শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুসরণ করতে বলার আগে দেখতে হবে সেই পাঠ্যক্রম অনুসরণের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক বৈশিষ্ট্য উক্ত শিক্ষার্থীর আছে কি না। ছাত্রছাত্রীদের প্রগতির হার অনুশীলন করেও শিক্ষা সংক্রান্ত নানা অভিজ্ঞতা ও তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

নির্দেশনা ব্যক্তিজীবনের যে কোন সময়ই প্রয়োজন হতে পারে। তাই নির্দেশকের কাজ হবে ব্যক্তিগত বিভিন্ন তথ্যকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। ব্যক্তিগত তথ্যকে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় কিউম্যুলেটিভ রেকর্ড কার্ডে, অ্যানেকডোটাল কার্ডে, ব্যক্তিগত প্রোফাইল ইত্যাদিতে।

অপরপক্ষে নির্দেশকের কাছে বৃত্তি সংক্রান্তও কিছু তথ্য থাকা প্রয়োজন। এদিক থেকে জব্ প্রোফাইল (Job profile), কেরিয়ার বুকলেট ইত্যাদিও বিশেষভাবে কার্যকরী হোতে পারে।

বিদ্যালয়ে নির্দেশনা দানের পদ্ধতি (Method of school guidance)

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে নির্দেশনা কাজ পরিচালনার জন্য বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি থাকা উচিত; এঁকে সহায়ক বা counsellor বলা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে খুব কম বিদ্যালয়েই এই ব্যবস্থা আছে। তাই নির্দেশনার দায়িত্ব যে কোন একজন শিক্ষকের উপর দেওয়া হয়, তিনি তাঁর দৈনন্দিন কাজের অংশ হিসাবে এই দায়িত্ব পালন করেন। ফলে নির্দেশনার কাজ আদর্শগতভাবে সম্পন্ন হোতে পারে না, এটাও আংশিকভাবে পালিত হয়।

বিদ্যালয়ের কি কি পদ্ধতিতে নির্দেশনার কাজ চলে এখন সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। যেমন—

(১) বিদ্যার্থীদের মধ্যে শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক অনুরাগ সৃষ্টির জন্য, নির্দেশনার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে পারেন। শিক্ষকদের মধ্যে থেকে বক্তা নির্বাচন করে এক একদিন এক এক বিষয়ের উপর বক্তৃতা হলে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান ও অনুরাগ বাড়বে।

(২) নির্দেশনা দেওয়ার জন্য ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থী সম্বন্ধে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলি ঠিকভাবে সংরক্ষণ করবেন। এই তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের উপর নানারকম অভীক্ষা প্রয়োগ করবেন ও বিভিন্ন সূত্র থেকে তাদের পারিবারিক তথ্য জানতে চেষ্টা করবেন।

(৩) ব্যক্তিগত তথ্যগুলি সংরক্ষণের জন্য কিউম্যুলেটিভ রেকর্ড কার্ড বা সর্বাত্মক লিপি তৈরী করতে হবে। এ ছাড়া ব্যক্তিগত প্রোফাইল (Individual profile), এর সাহায্যেও এই তথ্যগুলি সংরক্ষণ করা চলতে পারে।

(৪) সব শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে বসেও প্রত্যেক শিক্ষার্থী সম্বন্ধে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। এর ফলে শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ও তার সম্বন্ধে একটা নিরপেক্ষ মতামত গড়ে ওঠা সম্ভব হবে।

(৫) পাঠ্যক্রমিক বিষয় ছাড়া নানারকম সহ-পাঠ্যক্রমিক বিষয়ের আয়োজন করে শিক্ষার্থীদের সুযোগ করে দিতে হবে যাতে তাদের আগ্রহ বিভিন্ন দিকে প্রকাশ পায়। তবেই তাদের আগ্রহ ও অনুরাগ কোন দিকে তা সঠিকভাবে জানা যাবে।

(৬) শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক অনুরাগ সৃষ্টির জন্য শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক স্থানসমূহ পরিদর্শনের ব্যবস্থা মাঝে মাঝে করলে ভাল হয়।

(৭) শিক্ষার্থীর নিজস্ব অনুরাগ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে জানা গেলেও তার উপর নির্ভর করে অনেক সময় বৃত্তি নির্বাচন করা সম্ভব হয় না। তার সঙ্গে শিক্ষার্থীর অভিভাবকের ইচ্ছা ও অনুরাগ জানা প্রয়োজন। এজন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের বৈঠকে বসতে হবে এবং উভয়ের চিন্তার মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে।

(৮) নির্দেশনা দানের জন্য ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থী সম্বন্ধে নানান তথ্য যাচাই করে দেখবেন এবং শিক্ষার্থীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করবেন। নির্দেশনা দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থী নির্দেশনার সম্পর্কে নিরুৎসাহিত না হয়। ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে সাহায্য করাই হবে নির্দেশনার প্রধান উদ্দেশ্য।

শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা ও শিক্ষকের দায়িত্ব—নির্দেশনার জন্য একজন মাত্র ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকেন; কিন্তু কাজটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে

সমস্ত শিক্ষক যদি যৌথভাবে দায়িত্ব নিয়ে পালন করার চেষ্টা করেন তবে এ কাজ ঠিকমত করা সম্ভব হয় না।

প্রত্যেক শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সঙ্গে গভীরভাবে মেলামেশা করার চেষ্টা করবেন, তবেই শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁদের চোখে পড়বে। নির্দেশনা বিদ্যালয়ের কাজেরই একটা অংশ এবং শিক্ষকদের কাজে সহায়তা করার জন্যই এটি বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করা হয়েছে—একথা প্রত্যেক শিক্ষক উপলব্ধি করবেন।

শিক্ষকগণ সমবেতভাবে তথ্য সংগ্রহ করে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে সাহায্য করবেন। বিভিন্ন অভীক্ষা প্রয়োগের সময়ও অনেকের সহযোগিতা প্রয়োজন। সর্বাত্মক লিপি তৈরীর কাজেও সকল শিক্ষকের সক্রিয় সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক তথ্য সংগ্রহে অংশগ্রহণ করবেন সব শিক্ষক। সবাই মিলে বিভিন্ন বৃত্তি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে পরিষ্কার ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। নির্দেশনার গুরুত্ব সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অবহিত করতে সাহায্য করবেন শিক্ষকবৃন্দ। শিক্ষকগণই বিদ্যার্থীদের নানা ধরনের কাজের সুযোগ করে দেবেন।

এছাড়াও শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, প্রধানশিক্ষক, পরিচালকমণ্ডলী, অশিক্ষক কর্মিবৃন্দ ইত্যাদিরও সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া নির্দেশনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

নির্দেশনার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সমস্যা—বর্তমানে যে কোন একটি বিদ্যালয়ে নির্দেশনার কাজ পরিচালনা করা খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে এই কাজের সাফল্য। বিষয়গুলির মধ্যে যে কোন একটির অভাব ঘটলেই নির্দেশনার কাজ ব্যাহত হোতে বাধ্য। যেমন—

(১) প্রধান শিক্ষক যদি যখন তখন নির্দেশনার জন্য ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাজে অযথা হস্তক্ষেপ করেন;

(২) অন্যান্য সহকারী শিক্ষকগণ যদি সর্বাত্মক লিপি (Cumulative Record Card) ঠিকভাবে না রাখেন;

(৩) অভিভাবকগণ যদি শিক্ষকদের সঙ্গে একমত না হন ও তাঁদের কথা শুনতে না চান; কারণ অধিকাংশ অভিভাবক তাঁদের ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। ফলে শিক্ষকদের বক্তব্য তাঁদের কাছে অর্থহীন মনে হোতে পারে।

(৪) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি যদি সহশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হয় তবে ছেলে ও মেয়েদের সমস্যা বিভিন্ন হবে—ফলে নির্দেশনা দেওয়া আরও কঠিন কাজ হবে।

(৫) নির্দেশনার তথ্য সংরক্ষণের জন্য ও শিক্ষার্থীদের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের জন্য যদি নির্দিষ্ট ঘর না থাকে ;

(৬) নানারকম অভ্যাস গঠনের জন্য যদি উপযুক্ত সরঞ্জাম না থাকে ও লাইব্রেরীর অভাব থাকে।

(৭) বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম যদি একান্তভাবে পরীক্ষা শাসিত হয়।

(৮) যদি কোন শিক্ষার্থীকে ঠিক সময়ে নির্দেশনা না দেওয়া হয়।

(৯) নির্দেশনার জন্য যদি উপযুক্ত অর্থের সংস্থান না থাকে।

(১০) যদি কোন বিদ্যালয়ে নির্দেশনার জন্য বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষক না থাকেন ইত্যাদি।

সর্বোপরি বৃত্তির পরিচিতির সঙ্গে বৃত্তির যদি কোন সম্পর্ক না থাকে অর্থাৎ বিদ্যালয় জীবনে নানাপ্রকার বৃত্তির সঙ্গে পরিচিত হয়েও পরবর্তী জীবনে যদি বৃত্তির সন্ধান না পায় অর্থাৎ চাকরী না জোটে তবে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক শিক্ষক সকলের মনেই একটা হতাশার ভাব দেখা দেবে। তার ফলে নির্দেশনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। নির্দেশনার কাজে উৎসাহ স্তিমিত হোয়ে পড়বে।

প্রশ্নাবলী

1. Write an essay on Educational guidance with special reference to the question of selection at the Higher Secondary Stage of education of West Bengal. (C. U. B. T. '67)

দ্বাদশ অধ্যায়

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য

(Mental Health of the Child)

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য জানার আগে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হওয়া দরকার যে মানসিক স্বাস্থ্য বলতে আমরা ঠিক কি বুঝি।

দেহযন্ত্রের কোন অংশ বিকল হলে যেমন আমরা দৈহিক অসুস্থতা অনুভব করি তেমান মানসিক বিভিন্ন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে না ঘটলে মানসিক অসুস্থতা দেখা দেয়। বিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যে অস্বাভাবিক মানসিক প্রক্রিয়ার ফলে তাদের আচরণের সমস্যা দেখা দেয় ও শিক্ষাদান কার্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের আলোচনা একান্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা খুব বেশী দিনের নয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৯ খৃঃ দেশে মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কামটি গঠিত হয়। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ক্ষেত্র বর্তমানে অনেক প্রসারিত হয়েছে। এই বিজ্ঞান প্রধানতঃ তিনটি উদ্দেশে কাজ করে থাকে—

(১) বিভিন্ন মানসিক রোগ নিরাময়ে সহায়তা করা।

(২) মানুষের দেহ-মনের বিকাশের স্বাভাবিক ধারা বজায় রাখা।

(৩) ব্যক্তি ও সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য ও সমতা রক্ষা করা।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও শিক্ষা (Mental Hygiene and Education)।

মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা আজ ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ। কারণ শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সাহায্য অপরিহার্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশ আর সেই বিকাশের পথে বাধা দূর করে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।

---

(1) Mental Hygiene is the study of the ways and means for keeping the mind healthy and developing — D. B. Clean.

(2) "Mental Hygiene is the practical art of assisting oneself and others to the realisation of a fuller, happier, more harmonious, and more effective life"— Bernard

শিক্ষার আর একটি লক্ষ্য হ'ল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান। মানসিক-স্বাস্থ্যবিধি পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে একান্তভাবে সাহায্য করে।

ব্যবহারিক দিক থেকেও শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শিক্ষাক্ষেত্রে নানারকম অভিজ্ঞতা মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে সাহায্য করে। অজ্ঞানতা থেকে অনেক সময় মানসিক অসুস্থতা দেখা দেয়। যেমন কোন শিশু যদি বার বার অকৃতকার্য হয় তার মনে তখন হতাশা আসে এবং এই হতাশা থেকেই নানারকম অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দেখা যায়। তাই ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করতে হলে শিক্ষাকে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের জ্ঞান শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের আচরণের স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করে; এর ফলে নিজেদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে প্রত্যেকে সক্ষম হয়। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের জ্ঞান শিক্ষককে শিক্ষাদান কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করে কারণ, শিক্ষার্থীর যে কোন সমস্যামূলক আচরণের প্রকৃত কারণ শিক্ষক সহজে জানতে পারেন ও তা দূর করার পথ খুঁজে বার করতে পারেন।

মানসিক স্বাস্থ্য এবং গৃহ ও পরিবার—শিশু জন্মগ্রহণ করে গৃহে সেখানেই সে লালিত পালিত হতে থাকে। শিশু বিদ্যালয়ে আসার আগে পর্যন্ত তার মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার দায়িত্ব গৃহের ও পরিবারের। অনেক মনোবিজ্ঞানী ব্যক্তিসত্তা গঠনের ক্ষেত্রে গৃহের ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। এঁদের মধ্যে অনেকে (যেমন ফ্রয়েড) Psychic determinism—এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। এঁরা বলেন শৈশবে যে শক্তি ব্যক্তিসত্তা গড়ার কাজ আরম্ভ করে সেই শক্তিই পরবর্তী জীবনে ব্যক্তিসত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। গৃহেই শিশু তার আবেগগুলি প্রকাশ করতে, নিয়ন্ত্রণ করতে ও পরিবর্তন করতে শেখে। আবার এখানেই সে মা বাবা ভাই বোনের স্নেহ-ভালবাসা, মায়া-মমতা, সহানুভূতি ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হয়। যে গৃহে শিশুর মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক ও নৈতিক দিকের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করা হয়, সে গৃহের শিশু মানসিক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য ও বিদ্যালয়—মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে যে সব প্রতিষ্ঠান সক্রিয় অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে গৃহের পরেই নাম করা যায় বিদ্যালয়ের। বিদ্যালয় আজ শুধু বিদ্যা বিতরণ করেই ক্ষান্ত হয় না এর কর্মপরিধি আজ গৃহ ও সমাজকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে।

বিদ্যালয়ের নানান ঘটনা ও পরিস্থিতি শিশুর সামনে এক অজানা পরিবেশের সৃষ্টি করে। এই পরিবেশ শিশুমনে গভীর ভাবে দাগ কাটে। কাজেই বিদ্যালয়ের এই পরিবেশের সাথে শিশুকে সঙ্গতিবিধান করতে হবে— তা না পারলে তার আচরণ সমস্যামূলক বলে চিহ্নিত হবে।

শিক্ষক, সহপাঠী বন্ধুদের আচরণ শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে, বিদ্যালয়ের পরিবেশ যদি আনন্দময় না হয় তবে তা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হবে।

অনেক শিশুর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় সে তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারছে না। তার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে হয়তো:—

(১) পাঠ্যক্রমটি শিশুর উপযুক্ত নয়।

(২) শিক্ষকের নির্দয় ব্যবহার তার মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, তার ফলে তিনি যে বিষয় পড়ান সে বিষয় তার ভাল লাগে না।

(৩) সহপাঠীদের বিদ্রূপ সে সহ্য করতে পারে না—ফলে তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়।

(৪) গৃহ পরিবেশের প্রভাবে—বিশেষতঃ মা বাবার মধ্যে মতদ্বৈধতা থাকলে শিশুমনের মানসিক দ্বন্দ্ব আরও বেড়ে যায়।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কাজের তিনধারা- মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান যেভাবে কাজ করে তাকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। (১) সংরক্ষণমূলক (Preservative) (২) প্রতিরোধমূলক (Preventive) ও (৩) প্রতিকারমূলক (Curative)। অর্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রথম কাজ হল মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখা, কেউ যাতে অসুস্থ না হয় তা দেখা। এর পরের কাজ হল কেউ যাতে মানসিক রোগে আক্রান্ত না হয় তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সব শেষে দেখা যায় যদি কেউ মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে তবে তা নিরাময়ের চেষ্টা করা।

ব্যক্তির আচরণের ধারা—পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্য আমরা কতকগুলি আচরণ করে থাকি। এই আচরণের মূলে আছে নানারকম চাহিদা (need)। দৈহিক বিকাশের মূলে আছে জৈবিক চাহিদা (organic)। মানসিক বিকাশের মূলে আছে মানসিক চাহিদা (psychological)। চাহিদাগুলি আবার ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ও সামাজিক জীবন যাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

যেগুলি ব্যক্তির নিজস্ব প্রয়োজন সেগুলি হল,—নিরাপত্তার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা, আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা ইত্যাদি। আর ভালবাসার চাহিদা, সঙ্গলাভের চাহিদা ইত্যাদি হ'ল সামাজিক চাহিদা।

ব্যক্তি যদি তার চাহিদা অনুসারে পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে সঙ্গতিবিধান করতে পারে তবে তার প্রাক্ষোভিক সমতা বজায় থাকবে ও মানসিক শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ হবে। এই সঙ্গতিবিধানের জন্য ব্যক্তিকে কখনও পরিবেশের পরিবর্তন করতে হয় আবার কখনও বা হয়তো দুয়েরই পরিবর্তন করতে হয়। এইভাবে দেখা যাচ্ছে ব্যক্তি কোন-না-কোনভাবে তার চাহিদা পরিতৃপ্তির পথ খোঁজে—আর এই পরিতৃপ্তির মধ্যে দিয়ে তার মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখে। কিন্তু যদি কোন কারণে ব্যক্তি তার চাহিদার পরিতৃপ্তি করতে না পারে তবে তার প্রাক্ষোভিক সমতা নষ্ট হয়ে যায়, ফলে তার মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই দ্বন্দ্বই প্রকাশ পায় তার অসামাজিক আচরণের মধ্যে দিয়ে যাকে বলা হয় অপসঙ্গতি (maladjustment)।

আমরা তাহলে দেখতে পেলাম ব্যক্তির চাহিদা অপূর্ণ থাকলে অপসঙ্গতি দেখা দেয়। যখন চাহিদা পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় তখন ব্যক্তির মানসিক সমতা বজায় থাকে। অনেক সময় অতৃপ্ত চাহিদাকে আমরা অবদমন করার চেষ্টা করি; তাতে আপাতঃভাবে সচেতন স্তর থেকে অতৃপ্ত চাহিদার অস্তিত্ব মুছে ফেলা যায় বটে, কিন্তু তারা অচেতন স্তরে গিয়ে বাসা বাঁধে ও সেখান থেকে আমাদের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে, ফলে আচরণের মধ্যে অসঙ্গতি সৃষ্টি হয়।

কিন্তু যখন ব্যক্তি তার চাহিদা সম্পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত করতে না পারলেও আংশিকভাবে তা করতে সক্ষম হয় তখন তার আচরণের অসঙ্গতি অনেকটা দূর হয়ে যায়—অপসঙ্গতির মাত্রা অনেক কমে যায়। সঙ্গতিবিধানের প্রক্রিয়া অনুসারে মানুষকে তিনভাগে ভাগ করা যায় :—

(১) যারা পরিপূর্ণভাবে পরিবেশে সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে পারে তাদের বলা হয় স্বাভাবিক মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি (Normal)।

(২) যে সব ব্যক্তি আংশিকভাবে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে তাদের বলা হয় অনুস্বাভাবিক মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি (Sub-normal)

(৩) আর যারা পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয় তাদের বলা হয় অস্বাভাবিক মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি (abnormal)

সাধারণ মানুষ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে যে কোন স্তরে থাকতে পারে। তাই মানসিক স্বাস্থ্য একটা গতিশীল ধারণা মাত্র, এটা কোন স্থিতাবস্থা নয়; মানসিক স্বাস্থ্য কথাটি সম্পূর্ণ আপেক্ষিক।

আজকাল শিক্ষাকেন্দ্রে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যেসব চাহিদার সৃষ্টি হয় তার যথাযোগ্য পরিতৃপ্তির পথ করে দিতে না পারলে তাদের মধ্যে অপসঙ্গতি মূলক আচরণ দেখা দেবে; এবং এই আচরণ শুধু বিদ্যালয় জীবন নয় তাদের পরবর্তী জীবনকেও প্রভাবিত করবে।

মানসিক অপসঙ্গতির কারণ (Causes of Maladjustment)

সাধারণভাবে আমরা দেখেছি চাহিদার অতৃপ্তি থেকে মানসিক অপসঙ্গতি জন্মায়, কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা এর নানারকম কারণ খুঁজে বার করে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে কতকগুলি মানসিক অবস্থাও এই মানসিক অপসঙ্গতির কারণ। যেমন—

(১) নিরাপত্তার অভাববোধ (Sense of insecurity)—খুব ছোট বেলা থেকে শিশুমনে এই নিরাপত্তার অভাববোধ খুব বেশী করে জাগ্রত হয়। মা বাবার সামান্য অবহেলা শিশু সইতে পারে না। শিশুর দৈহিক ও জৈবিক সুখের অভাব ঘটলে, মা-বাবা রূঢ় বা শাসনমূলক ব্যবহার করলেন, ভাই বোনের জন্ম হলে শিশুমনে নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব সৃষ্টি হয়।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সহানুভূতিহীন আচরণ, সহপাঠী বন্ধুদের অশোভন আচরণ, রূঢ় মন্তব্য, বিদ্যালয়ের নিরানন্দময় পরিবেশ, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি, অযথা শাস্তিদান ইত্যাদি শিক্ষার্থীর মনে নিরাপত্তার অভাববোধ জাগ্রত করে।

(২) অন্তর্দ্বন্দ্ব (Mental Conflicts)—প্রায় সব রকম অপসঙ্গতির মূলেই আছে মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব। নানারকম কামনা-বাসনা ব্যক্তির মনে আবেগ সৃষ্টি করে। এই বাসনাগুলি অনেক সময় পরস্পরবিরোধী হয় তাই এগুলিকে সাধারণতঃ অবদমন করা হয়। এই অতৃপ্ত কামনা-বাসনা থেকেই অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

ব্যক্তি সামাজিক নিয়মকানুনের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করে। তাই সে নিজের অপসঙ্গতিমূলক আচরণকে সহজে প্রকাশ করতে দিতে চায় না। অনেক বাসনা এমন স্ববিরোধী হয় যে সেগুলি সাধারণ ও স্বাভাবিক পথে চরিতার্থ করা সম্ভব হয় না। তখনই কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় অথবা অবদমন করতে হয়। শিশুমন কল্পনার জগতে চরিতার্থতার পথ খোঁজে কিন্তু সেখানেও সে বাধা পায়। তার ফলে তার স্বাভাবিক আচরণ ব্যাহত হয় ও চাহিদা অতৃপ্ত থাকে। এই অতৃপ্তিজনিত ব্যর্থতার জন্যই ব্যক্তির মনের প্রক্ষোভিক ভারসাম্যটি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

(৩) আক্রমণাত্মক মনোভাব (Hostile attitude)—অনেক সময় নানারকম বিরূপ অভিজ্ঞতার ফলে ব্যক্তির মধ্যে আক্রমণাত্মক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই আক্রমণাত্মক মনোভাব সমাজ অনুমোদিত পথে প্রকাশ করা যায় না বলে তা অবদমন করার চেষ্টা করা হয়। এখানে ব্যক্তির প্রবণতা ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়। ফলে ব্যক্তি নানারকম অসঙ্গত আচরণ করে।

(৪) অপরাধমূলক অনুভূতি (Feeling of guilt)—ব্যক্তির অপরাধ-মূলক আচরণ থেকেও অনেক সময় অপসঙ্গতির সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি নিজের কোন অসামাজিক আচরণের জন্য নিজেকে মনে মনে দোষী করে ফেলে। এর পর সে কোন কাজ করতে গেলেই দৃঢ়তার সঙ্গে আর করতে পারে না আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। এসব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নানারকম অসামাজিক আচরণ করতে বাধ্য হয়।

মানব মনের বিশ্লেষণ (Analysis of Human mind)।

আমরা প্রত্যেকেই মনের অধিকারী হয়েও আমাদের নিজেদের মনের খবর আমরা রাখি না। মনে হয়, সত্যিই 'সবচেয়ে দুর্গম যে পথ মানুষ আপন অন্তরালে'। কাজেই মনের খবর রাখা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

আমাদের সবরকম আচরণের ব্যাখ্যা আমরা সবসময় দিতে পারি না, তাই একদল মনোবিজ্ঞানী মনকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করে আমাদের আচরণের ব্যাখ্যা খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন; এঁদের বলা হয় মনঃসমীক্ষণবাদী (Psycho-analysts)। এই মতের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আমরা সিগ্‌মণ্ড

ফ্রয়েডের (Sigmund Frued) নাম উল্লেখ করতে পারি। ফ্রয়েড নিজে ছিলেন একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। তিনি এই মনঃসমীক্ষার সাহায্যে মানুষের মনের অলিগলির খবর সংগ্রহ করে মানুষের অসঙ্গতিমূলক আচরণের কারণ খুঁজে পেয়েছেন এবং এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে মনের বিকার সারানর কাজে ব্যবহার করে বিশেষভাবে কৃতকার্য হয়েছেন।

ফ্রয়েড ক্ষেত্রগত দিক থেকে (Topographically) মনকে তিনটি অংশে ভাগ করেছেন। ফ্রয়েডের আগে আমাদের মনের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার ছিল না। তিনিই প্রথম বললেন, আমাদের মনের তিনটি স্তর আছে যথা—(১) চেতন (Conscious) (২) প্রাক-চেতন (Pre conscious or Sub-conscious) এবং (৩) অবচেতন (Un-conscious)।

চেতন মন—মনের যে অংশের কাজ আমরা বুঝতে পারি অর্থাৎ মনের যে অংশের কাজের সঙ্গে বাস্তব জগতের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে তাকেই আমরা চেতন মন বলি। ফ্রয়েডের ধারণা, এই চেতন অবস্থা অবচেতন মনের থেকে আয়তনে অনেক ছোট ও দুর্বল। একটি হিমবাহ যখন জলের উপর ভাসে তখন তার অধিকাংশ অংশই জলের তলায় থাকে, তেমনি আমাদের মনটাকে যদি হিমবাহের সঙ্গে তুলনা করি তবে দেখা যাবে মনের মোট দশভাগের একভাগ হবে সচেতন মন আর বাকি ৯ ভাগ হবে অবচেতন মন।

প্রাক-চেতন মন—চেতন মনের ঠিক নীচেই আছে প্রাক-চেতন মন। এই স্তরে যে সব অভিজ্ঞতা থাকে সেগুলো সম্বন্ধে আমরা সব সময় সচেতন থাকি না, কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই অভিজ্ঞতাগুলোকে চেতন স্তরে আনতে পারি। এই প্রাক-চেতন স্তর চেতন ও অবচেতন স্তরের মাঝখানে থাকে। এই স্তরের পরিধি নিতান্তই কম।

অবচেতন মন—প্রাক-চেতন স্তরের নীচেই আছে মনের সবচেয়ে বৃহত্তম স্তর। এই স্তরের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই থাকে না। অবচেতন মনের মধ্যেই থাকে আমাদের সব রকমের আদিম প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা। মনের এই অংশ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত; কিন্তু তাই বলে মনের এই স্তর নিষ্ক্রিয় নয় বরং অতিমাত্রায় সক্রিয়। মনের অতল গহনে কামনাবাসনা-গুলি থাকলেও এগুলি সবসময় চরিতার্থ হওয়ার জন্য পথ খোঁজে ও সচেতন মনের কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

তিনটি স্তরের বৈশিষ্ট্য—চেতন মনকে সব সময় বাইরের জগতের সঙ্গে

যোগাযোগ রেখে চলতে হয়। এই মনের কাজকর্ম সমাজ অনুমোদিত পথে চালিত হয়। তাই একে মানসিক শৃঙ্খলা ও সংহতি বজায় রেখে চলতে হয়।

অচেতন মনের সঙ্গে বাইরের জগতের কোন যোগসূত্র নেই। এই স্তরটি হ'ল আদিম, আত্মকেন্দ্রিক ও প্রচণ্ড শক্তিশালী উৎক্ষেপনধর্মী আদিম কামনা-বাসনার বাসস্থল। এর কাজ তাই অসঙ্গতিপূর্ণ ও আদিম। ফ্রয়েড এই স্তরকে লিবিডো (Libido) নাম দিয়েছেন; তিনি বলেন, এই স্তরের বাসনাগুলি যৌন রঙে রঙিন। অবশ্য যৌন কথাটি এখানে কেবলমাত্র Sex-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় নি—এর অর্থ অনেক ব্যাপক। সৃষ্টির যে প্রেরণা, উদ্দামতা তাকেই ফ্রয়েড যৌন বলে আখ্যা দিয়েছেন।

অচেতন মনে কামনা-বাসনাগুলো আসে কোথা থেকে? এর দুটো উৎস আছে—একটা হোল যে সব কামনা-বাসনা তাদের অসামাজিক প্রবৃত্তির জন্য অবদমিত হয় সেগুলো এসে অচেতন মনে বাসা বাঁধে। এই অবদমনের কাজ সব সময় চলে। অপরটা হ'ল জন্ম থেকেই কতকগুলো কামনা বাসনা এই স্তরে থেকে যায় যেগুলো কখনও চেতনস্তরে মাথা তোলে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর বাসনাগুলিকে মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং নাম দিয়েছেন "জাতিগত অচেতন" (Archetype)।

অচেতন মনের ইচ্ছাগুলো বাধানিষেধের বেড়া মানতে রাজী নয়, তারা এটা ভাঙতে চায়। কিন্তু এগুলি পূরণের জন্যে বাইরের জগত থেকে যা সংগ্রহ করতে হবে তা সমাজের চোখে একান্তভাবে নিন্দনীয়; তাই এগুলিকে অপূর্ণতার নিষ্ফল আক্রোশে মাথা কুটে মরতে হয়। অবদমনের কাজে সাহায্য করে মনের যে অংশটি তাকে ফ্রয়েড নাম দিয়েছেন সেন্সার (censor) বা প্রহরী। প্রাক-চেতন স্তরে এর অধিষ্ঠান। একে বিবেক বলে মনে করা যেতে পারে।

মনের ক্রিয়াগত দিক (Dynamic aspect)—থেকেও ফ্রয়েড মনকে তিনটি ভাগে ভাগ করার পক্ষপাতী। (১) ইদম্ (Id) (২) অহম (Ego) ও (৩) অধিসত্তা (Super-ego)। ইদম্ হল সম্পূর্ণভাবে অচেতন। এটি হল লিবিডোর আবাসস্থল—আদিম কামনা বাসনার উৎস। ইদমের প্রবৃত্তি আদিম, বন্য; ইদম্ সুখভোগের নীতি (Pleasure Principle) মেনে চলে। তাই এর মধ্যে বিচার বুদ্ধি, যুক্তি, শালীনতা, সামাজিকবোধ, নীতিবোধ এসব কিছুই নেই। আর বাইরের জগতের সঙ্গে এর যোগাযোগও নেই। এটি চায়

তেমন যেমন করে সুখভোগ করতে—তা সে ভালই হোক আর মন্দই হোক। কিন্তু ইদম সরাসরি নিজের কামনা-বাসনা পূরণ করতে পারে না। তাই ইদম, অহম্ বা Igo-র দ্বারস্থ হয়। তখন অহম্ চেষ্টা করে ইদমের কামনা-বাসনা-গুলোকে পর্যালোচনা করে বাস্তব জগতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলা যায় কি না।

অহম্‌কে বাস্তবতার নীতি (Reality Principle)—অনুসরণ করে চলতে হয়। অহম্ যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি মেনে চলে ; সে জানে বাস্তবের সঙ্গে যোগ রেখে চলতে গেলে সামাজিক নিয়মকানুন মেনে চলা উচিত ; তাই সে ইদমের সব কামনা-বাসনা পরিতৃপ্ত করতে পারে না। বাস্তবের কঠিন অনুশাসনের জন্ত অহম্ ইদমের অনেক বাসনাকে দমিয়ে রাখে ; তখন এই অবদমিত বাসনাগুলো অতৃপ্ত থাকে। কিন্তু যখন অহম্ বোঝে যে ইদমের বাসনাগুলোকে তৃপ্ত করলে সমাজের কাছ থেকে কোন সমালোচনা বা শাস্তি ভোগ করতে হবে না তখন সেই বাসনাগুলোকে অহম্ চরিতার্থ করে।

অহমের আবার দুটো ভাগ আছে—চেতন ও অবচেতন। চেতন অহম্ বাস্তবের সঙ্গে যোগ রাখে আর অবচেতন অহম্ ইদমের সঙ্গে যোগ রেখে চলে। শিশু যখন জন্মায় তখন তার অহম্ থাকে দুর্বল, অপূর্ণ ; বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অহম্ পূর্ণতা লাভ করে।

মনের অপর অংশটির নাম হল অধিসত্তা। কাজের দিক থেকে অহম্‌কে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়—(১) একটা হল কর্মকর্তা অহম্ (২) আরেকটা হল সমালোচক অহম্। এই সমালোচক অহমকেই বলা হয় অধিসত্তা বা Super Ego। অহম্‌কে যদি বিজ্ঞ বলা হয় তবে এই অধিসত্তা হবে এর বিবেক (Conscience) ; কিন্তু অধিসত্তার অনেকখানি অংশ অচেতন থাকে বলে অধিসত্তা অহমের চেয়ে ইদমের খবর বেশী রাখে। তবে অধিসত্তার আসল কাজ হল অহমের কাজের সমালোচনা করা ; এই সমালোচনার সাহায্যেই অহম্, ইদমের কামনা-বাসনাগুলোকে অবদমন করতে পারে।

বাস্তবিকপক্ষে মন কিভাবে কাজ করে তা একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। যখন ইদমের অন্ধকার গুহা থেকে কোন অসামাজিক ইচ্ছা অবচেতন থেকে চেতন মনে উঠে আসতে চায় তখন অহম্-এর প্রহরীরা অহম্‌কে সাবধান করে দেয়, ফলে অহম্ সেই ইচ্ছাগুলোকে অবদমিত করে আবার গভীর গুহায় ফেরৎ পাঠায়। প্রহরী অধিসত্তার (Super Ego) কঠোর অনুশাসন অহম্

মেনে চলে। অবদমিত ইচ্ছাগুলো অবচেতন মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। ফলে নানারকম Complex-এর সৃষ্টি হয়। এর জন্যই অনেক সময় ব্যক্তির আচরণকে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে এর চিকিৎসা করা যায়।

কখনও কখনও সেন্স'র যখন অসবধান থাকে, যেমন ঘুমের সময়, তখন খুব গোপনে নগ্ন কামনা-বাসনাগুলো চেতন মনে চলে আসে। চেতন মনের আলোতে তাদের নিজেদের স্বরূপ ধরা পড়ে; তখন তাদের অবদমন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু কখনও কখনও অহম্ নগ্ন ইচ্ছাগুলোকে সামাজিক সাজ পোষাক পরিয়ে অধিসত্তার চোখকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে। কাজেই অনেক সময় ইদমের আদিম বাসনাগুলোকে রূপ দেওয়ার জন্য অহম্ও ভেতরে ভেতরে কাজ করে। ফ্রয়েড অহম্-এর এই অবস্থার নাম দিয়েছেন দ্বিধা-বিভক্ত অহম্ (Dissociated Ego)।

অহমের কাজের যে বিবরণ আমরা পেলাম তা খুব একটা সুখকর নয়।

এখানে দেখা যাচ্ছে অহম্‌কে এক সঙ্গে তিন প্রভুর মন রেখে চলতে হয়—(১) বাস্তব জগৎ (২) অবাধ্য ইদম্ (৩) সমালোচক অধিসত্তা। এই তিন প্রভুর সঙ্গে বনিবনা করে চলতে চলতে যদি কোন রকমে এক দিকের যোগসূত্র ছিন্ন হয় তাহলেই মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। ফ্রয়েড বলেন মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির কোন কারণে এই অহম্ সত্তাটি তিন প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি বলে তার মানসিক বিকার দেখা দিয়েছে।

ফ্রয়েড মানসিক সংগঠনের প্রকৃতিকে প্রাণধর্মী (Vitalistic) বলে বর্ণনা করেছেন। মনঃসমীক্ষা হল একটা গতিশীল (dynamic) বিজ্ঞান —এতে মানব আচরণের ব্যাখ্যা আছে। ফ্রয়েড বলেন আমাদের মানসিক সক্রিয়তার পেছনে দুটো বিপরীতধর্মী আদিম শক্তি কাজ করে—(১) প্রাণশক্তি (Eros) (২) মরণশক্তি (Thanatos)। প্রাণশক্তির মধ্যে ভালবাসার মাত্রা বেশী—নিজেকে ভালবাসা, অন্যকে ভালবাসা, আত্মসংরক্ষণ, জাতিসংরক্ষণ ইত্যাদি। এই শক্তির মধ্যে প্রাণীর বেঁচে থাকার ইচ্ছা প্রবল থাকে।

মরণশক্তি হল ঠিক এর উল্টো। এ যেন প্রাণীকে মৃত্যুর দিকে, ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এই শক্তির মধ্যে থাকে ঘৃণা, বিদ্বেষ, পীড়ন ও ধ্বংস। এই মরণশক্তির মধ্যে আবার দুটো রূপ দেখা যায়—(১) ধর্ষকাম (Sadism)

(২) মর্ষকাম (Masochism)। ধর্ষকাম হল অন্যকে নিপীড়ন করে আনন্দ উপভোগ করা। মর্ষকাম হল নিজেকে নিপীড়ন করে সুখ অনুভব করা।

লিবিডো (Libido)

ফ্রয়েড বলেন লিবিডো একটা মানসিক শক্তিবিশেষ। এই লিবিডো ব্যক্তির বিকাশ ও পরিণতির জন্য দায়ী। লিবিডোই বিক্ষু তেজ ও উদ্যমের উৎস—এর থেকেই জন্ম নেয় গভীর মনের কামনা-বাসনা।

সব মানুষের সমান লিবিডো থাকে না। কারো কম, কারো বা বেশী থাকে। জন্মের সময় লিবিডো সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি ক্রমপরিণতি লাভ করে। লিবিডো সাধারণত: যৌনমূলক ও সহজাত প্রবৃত্তি পরিতৃপ্তির জন্য বাইরের জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে।

ফ্রয়েড লিবিডোর ক্রমবিকাশের ধারাকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন—

(১) শৈশব স্তর (Infancy)—জন্মের পর থেকে ৫-৬ বছর বয়স পর্যন্ত এই স্তর পড়ে। এই স্তরে লিবিডো থাকে শিশুর মুখে। তাই একে মৌখিক রতি-স্তর (oral erotic) বলা হয়। এর পর আসে মৌখিক ধর্ষণমূলক স্তর (oral sadistic)। এর পর লিবিডো আসে শিশুর পায়ুতে (Anal erotic)। সব শেষে আসে লিঙ্গের স্তরে (Phallic)

(২) প্রসুপ্তকাল (Latent period)—৫-৬ থেকে ১২-১৩ বছর পর্যন্ত লিবিডো সুপ্ত অবস্থায় থাকে; কিন্তু লিবিডোর ক্রমবিকাশ ঠিকই হোতে থাকে।

(৩) যৌবনাগমনকাল (Adolescence)—১২-১৩ থেকে ১৮-২০ বছর বয়স পর্যন্ত লিবিডো তার বিভিন্ন অবস্থানগুলি ছেড়ে জননেন্দ্রিয়ে এসে আশ্রয় নেয়।

লিবিডো যে সব সময় ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক পথে এগিয়ে চলে তা নয়। কখনও কখনও অস্বাভাবিক পথেও চলে ও অস্বাভাবিক আশ্রয়ে সাময়িকভাবে অবস্থান করে। একেই ফ্রয়েড বলছেন লিবিডোর সংবন্ধন (Fixation)। তিনি বলেন সম্পূর্ণ লিবিডোর সংবন্ধন হয় না, কিন্তু অংশের এরূপ হয় বাকি অংশ ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে চলে।

প্রত্যাবৃত্তির সাহায্যে এই সংবন্ধনটি প্রকাশিত হয়। সংবন্ধনের ফলে ব্যক্তির আচরণ শৈশবের কোন এক স্তরের আচরণে সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে সে শিশুসুলভ আচরণ করে; কিন্তু এর কারণ সে বুঝতে পারে না। তাই এই

আচরণের কারণ তাকে বুঝিয়ে দিলে তার লিবিডো ক্রমবিকাশের পথে আবার চলতে থাকবে।

প্রত্যাবৃত্ত (Regression)—চলার পথে কোন মানসিক আঘাত পেলে বা চাহিদা পরিতৃপ্তি ব্যর্থ হলে লিবিডো স্বাভাবিক পথে তো চলেই না বরং পিছিয়ে এসে শৈশবের কোন নিশ্চিত আশ্রয়ে অবস্থান করে। লিবিডোর এই পশ্চাদপসরণকেই বলা হয় প্রত্যাবৃত্তি। এই প্রত্যাবৃত্তি অনেক সময়ই মনো-বিকারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মানসিক কৌশল (Mental Mechanism)

মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অহম্‌কে কতকগুলি কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এগুলিকেই বলা হয় মানসিক কৌশল।

মানসিক কৌশলগুলির উদ্দেশ্য দু'রকমের হতে পারে। (১) অবদমিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে অহমের আত্মরক্ষা (২) ইদমের ইচ্ছাগুলিকে আংশিকভাবে তৃপ্তিদান। উদ্দেশ্য অনুযায়ী কৌশলগুলিকে দুরকম নাম দেওয়া হয়—প্রতি-রক্ষণ কৌশল (Defence Mechanism) ও পলায়নমূলক কৌশল (Escapist Mechanism)। এখন দেখা যাক কৌশলগুলি কিরকম।

প্রতিরক্ষণ কৌশলের মধ্যে পড়ে—

(১) অনুকম্পন (Compensation)—কারো মনে যদি কোন কারণে হীনমন্যতা আসে তবে সে এই কৌশল অবলম্বন করে। নিজের হীনমন্যতা ঢাকবার জন্য অন্য কোন দিকে সে নিজের উৎকর্ষতা প্রমাণ করার চেষ্টা করে। চেহারা ভাল না হলে সুন্দর পোষাকে নিজেকে অন্যের চোখে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করে। কেউ হীনমন্যতা ঢাকবার জন্য আত্মগরিমা ও উন্নাসিকতার ভাব প্রকাশ করে। ছোট শিশুরা অনেক সময় বন্ধুদের কাছে স্বীকৃতি না পেলে চুরি করা, মিথ্যে কথা বলা ইত্যাদির মাধ্যমে স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করে। বড়রা অনেক ক্ষেত্রে সামান্য ব্যাপারে বাজে তর্ক করে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করে প্রমাণ করে যে সে নিজে সবজান্তা।

(২) নেতিবাচক মনোভাব (Negativism)—শিশুদের কোন কাজ করতে বারণ করলে সেটা আরও বেশি কোরে করে। যেটা করতে বলা হয় সেটার উল্টোটাই করে বসে। প্রবাদ বাক্যে বলা হয়—"পাগলা রে পাগলা সাঁকো নাড়াস না"। সে বলে—"ভাল কথা মনে করিয়ে দিলি" অর্থাৎ

শিশুকে কিছু করতে না বল্লেই তার জেদ চেপে যায়, সে সেটা বেশি করে দেখিয়ে দেখিয়ে করে।

(৩) অবদমন (Repression)—ইদমের অধিকাংশ আদিম বাসনা সমাজ অনুমোদিত পথে চরিতার্থ হয় না। তখন সেগুলিকে জোর করে মনের অবচেতন স্তরে নির্বাসন দিতে হয়; এই জোর করে দাবিয়ে রাখার নামই হোল অবদমন। অবদমন অবশ্য নিকৃষ্টতম কৌশল, কারণ বার বার অবদমনের ফলে অহম্ সত্তা দুর্বল হ'য়ে পড়তে পারে।

(৪) উদ্গমন (Sublimation)—ইদমের নগ্ন বাসনাকে সরাসরি তৃপ্তি দেওয়া যায় না বলে অহম্ অনেক সময় তাদের অবাঞ্ছিত পথ থেকে সরিয়ে এনে বাঞ্ছিত পথে প্রকাশ করে; একেই বলে উন্নীতকরণ বা উদ্গমন।

(৫) প্রতিক্রিয়া সংগঠন (Reaction Formation)—ব্যক্তি তার অবদমিত ইচ্ছাকে অস্বীকার করার জন্য সেই ইচ্ছার ঠিক বিপরীত মনোভাব প্রকাশ করে। কেউ খুব ভয় পেয়েছে হয়তা—সেটাকে সে অস্বীকার করে দেখাতে চাইবে সে একটুও ভয় পায়নি—খুব সাহসী। যাদের মনে অপরাধ প্রবণতা থাকে তারাই অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দিতে বলে।

এবার মনের পলায়নমূলক কৌশলগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক সেগুলির স্বরূপ কেমন। এগুলির মধ্যে দিবাস্বপ্ন, অভেদীকরণ, প্রক্ষেপণ, অপব্যাখ্যান বা যৌক্তিকরন, পলায়ন প্রবৃত্তি ও তীব্র অন্তর্মুখিতাই প্রধান।

(১) দিবাস্বপ্ন (Fantasy বা Day Dreaming)—ইদমের অতৃপ্ত ইচ্ছাগুলি কল্পনার মাধ্যমে বা দিবাস্বপ্নের মাধ্যমে আংশিক পরিতৃপ্তির পথ খোঁজে। বাস্তবের অপূর্ণতা ও অতৃপ্তিকে কল্পনার সাহায্যে পূর্ণতা ও আনন্দ উপভোগের পথ বলে মনে করে। ইদমের অপূর্ণ বাসনাগুলি কল্পনার মাধ্যমে পূর্ণতা পেলে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য ভালই থাকে। কিন্তু দিবাস্বপ্ন অতিরিক্ত মাত্রায় হলে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। লটারীর টিকিট কাটলে টাকা পেলে কি করবে তা নিয়ে মনে মনে হিসেব করা অথবা আমি যখন মন্ত্রী হব তখন কি কি করব কল্পনায় সেই কাজের তালিকা তৈরী করা ইত্যাদি দিবাস্বপ্নের উদাহরণ।

(২) অভেদীকরণ (Identification)—হীনমন্যতা কারো মধ্যে থাকলে অন্য লোকের সাফল্য, কৃতিত্বের সম্মান ইত্যাদিকে নিজের কৃতিত্ব ও সম্মান

বলে মনে করে। সিনেমায় ছবি দেখে যখন আমরা কাঁদি বা হাসি তখন আমরা ছবির চরিত্রগুলির সঙ্গে নিজেদের একাত্মতা অনুভব করি।

(৩) প্রক্ষেপণ (Projection)—ইদমের বাসনাগুলি অতৃপ্ত অবস্থায় বাইরের জগতের কোন জিনিসের ওপর প্রক্ষেপিত করে। নিজেরা দোষ করে যখন অন্যের ঘাড়ে চাপাই তখন হয় প্রক্ষেপণ। কোন স্ত্রী যদি স্বামীকে পছন্দ না করে তবে সে বলে বেড়ায় তার স্বামীই তাকে দেখতে পারে না।

(৪) অপব্যাখ্যান বা যৌক্তিকরণ (Rationalisation —যে বাসনাগুলি অতৃপ্ত থেকে যায় তাদের জন্য আমরা মোটামুটি একটা যুক্তি খাড়া করে মনে খানিকটা সান্ত্বনা পাই, যেমন গাড়ী কেনার পয়সা না থাকলে আমরা বলি গাড়ী না কেনাই ভাল, কারণ ওতে অনেক ঝামেলা আছে। পরীক্ষায় ভাল ফল করতে না পারলে প্রশ্ন কঠিন ছিল অথবা পরীক্ষক ভাল নম্বর দেয় নি ইত্যাদি বলে যুক্তি খাড়া করে মানসিক সান্ত্বনা লাভ করে থাকি।

(৫) পলায়ন প্রবৃত্তি (Withdrawal)—তীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব ও প্রক্ষোভজনিত অস্থিরতার জন্য ব্যক্তি অনেক সময় বাস্তবের সম্মুখীন হতে ভয় পায়। সামাজিক মেলামেশা যাঁরা চান না শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে তাঁরা সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি এড়িয়ে চলেন।

(৬) তীব্র অন্তর্মুখিতা (Eextreme Introvertion)—কেউ যদি নিরাপত্তার অভাববোধ করে, কারো উপহাস সহ্য করতে না পারে, তাহলে সে বাস্তবের সম্মুখীন হতে চায় না। নিজেকে সে সর্বদা আড়ালে রাখতে চায়। সে নিজের পাশে এক বেড়াজাল তৈরী করে বাস করে। কারোর সঙ্গে মিশতে চায় না, লোকের সামনে মোটেই বেরুতে ও কথা বলতে চায় না।

মনের এই বিশ্লেষণের সাহায্যেই জানা গেছে শিশুর কোন সমস্যামূলক আচরণের কথা কারও থাকে তার অবচেতন মনে। এই সমস্যাগুলিকে মনোবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। এইজন্য বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের এত প্রচলন হয়েছে।

প্রশ্নাবলী

1. What is a mental conflict ? How does it arise in the mind of the child ? Discuss the consequences of a mental canflict in the child.

2. Discuss the role of the home and the school in building up the personality of the child.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অপরাধপ্রবণতা (Delinquency)

শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় নানারকম সমস্যা হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এ সমস্যাগুলিকে অবশ্য অনেকে শিক্ষামূলক সমস্যা না বলে সামাজিক সমস্যা বলার পক্ষপাতী।

খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যখন সমাজ নির্ধারিত আচরণ-রীতি না মেনে চলে তখন তাকে আমরা সমস্যামূলক আচরণ বলি (Problem behaviour)। কিশোর বা প্রাপ্তযৌবন স্তরের এরূপ আচরণকে অপরাধ-প্রবণতা নাম দেওয়া হয় (Delinquency)। আবার একই ধরণের আচরণ যখন প্রাপ্তবয়স্কেরা করে থাকেন তখন তাকে বলা হয় আইনগত অপরাধ (crime)।

এখন প্রশ্ন হল অপরাধপ্রবণতা ঘটে কেন?

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন বাল্যে ও কৈশোরে পরিবেশের সঙ্গে যদি কোন কারণে অপসঙ্গতি ঘটে থাকে তবে অপরাধের নেশা তাকে পেয়ে বসে। আবার কোন শিশুর মৌলিক চাহিদা যদি অতৃপ্ত থেকে যায় তবে অবচেতন মনে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তা থেকেও অপরাধপ্রবণতা জন্ম নেয়। মনোবিজ্ঞানীরা বাইবেলের মত বলতে চান, পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে নয়,—অপরাধকে ঘৃণা কর, অপরাধীকে নয়। কাজেই অপরাধপ্রবণতার কারণ খুঁজে বার করে তা সারান যায় কি না তা দেখতে হবে।

এ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী সিরিল বার্ট (Cyril Burt)-এর প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, প্রাক্ষোভিক অসমতাই অপরাধপ্রবণতার প্রধান কারণ। এছাড়াও কতকগুলি কারণ আছে। সেগুলি হল—

(১) বংশগত সূত্রে পাওয়া কারণ (Hereditary)।

(২) পরিবেশগত কারণ (Environmental)।

(৩) সামাজিক (Social)।

(৪) অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক কারণ (Other psychological factors)।

(১) বংশগতসূত্রে পাওয়া কারণ—অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় অপরাধীর

সন্তান অপরাধী হয়। শিশুর বংশে যদি কেউ অপরাধপ্রবণ থেকে থাকে তবে শিশুটিও বংশধারার মাধ্যমে অপরাধপ্রবণতার বীজটা পেতে পারে।

আবার দেখা যায় যে শারীরিক অক্ষমতা, রোগ, দোষ-ত্রুটি ইত্যাদিও বংশগত সূত্রে শিশু পায়। এগুলি পেলে তার মনে একটা অসহায়তা ও হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়; ফলে সে আর পাঁচজনের সঙ্গে ও পরিবেশের সঙ্গে ঠিকভাবে খাপ খাওয়াতে পারে না। ফলে তার মধ্যে অপরাধপ্রবণতা আস্তে আস্তে জন্মায় ও বৃদ্ধি পায়।

তাছাড়া বুদ্ধি তো জন্মসূত্রেই পাওয়া। যারা ক্ষীণবুদ্ধি তাদের অপরাধ করার দিকে ঝোঁক বেশী। কারণ এরা বুদ্ধিমানদের মত ভালমন্দ ও ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে পারে না। সেই জন্য তারা কি করছে তা তারা নিজেরাই বুঝতে পারে না।

আর উচ্চবুদ্ধিসম্পন্নরা যে একেবারে অপরাধপ্রবণ হয় না এমন কথা বলা যায় না। এদের অজস্র চাহিদা থাকে। সব চাহিদা তো আর পূরণ করা যায় না। কাজেই এদের চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে অনেক ফাঁক থেকে যাচ্ছে। এর থেকেই জন্ম নিচ্ছে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কমপ্লেক্স।

(২) পরিবেশগত কারণ—অপরাধপ্রবণতার জন্য বংশগত কারণের চেয়ে বেশী দায়ী এই পরিবেশগত কারণ। গৃহপরিবেশ শিশুর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর গৃহপরিবেশ যদি স্বাস্থ্যকর না হয় তাহলে শিশুর ব্যক্তিত্বের ঠিকমত বিকাশ হয় না। সে দুর্বলচেতা ও বিপথগামী হোতে চায়। এইজন্য অনেকে বলেন অপরাধ প্রবণতা শিশুর জন্মগত নয়, গৃহপরিবেশই শিশুকে অপরাধপ্রবণ করে গড়ে তোলে।

অতিরিক্ত দারিদ্র্য, পরিবারে লোকের সংখ্যাধিক্য, আমোদ-প্রমোদের সুযোগের অভাব ইত্যাদি শিশুকে বিপথে নিয়ে যেতে চায়। যে সমস্ত গৃহে মা-বাবার সম্পর্ক স্বাভাবিক নয় সে শিশু দেখা যায় প্রায়ই অপরাধপ্রবণ হয়। অনেক সময় ত্রুটিপূর্ণ শৃঙ্খলাও অপরাধপ্রবণতার কারণ হয়ে থাকে। অতিরিক্ত আদর, অতিরিক্ত অবহেলা ইত্যাদি শিশুর পক্ষে খারাপ। বাবা-মায়ের বৈষম্য-মূলক আচরণও শিশুকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে। অনেকেই শিশুকে বকাবকি বা মারধর করে, পর মুহূর্তেই অনুতপ্ত হয়ে শিশুকে আদরের বন্যায় ভাসিয়ে দেন। তাঁরা ভাবেন, শাস্তির ফলে শিশুর মনে যে রাগ জন্মেছিল আদরের ফলে তা চলে যাবে। এ ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। বরং এই বৈষম্যমূলক

আচরণের ফলে শিশুমনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, বাবা-মার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে শিশুর একটা খারাপ ধারণা জন্মায়।

শিশুর গৃহ পরিবেশের পরেই বিদ্যালয় পরিবেশের কথা ভাবতে হয়। শিশু দিনের অনেকটা সময়ই বিদ্যালয়ে কাটায়। তাই বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা, বৈশিষ্ট্য, প্রথা ইত্যাদি শিশুমনে ছায়া ফেলে। যেখানে বিদ্যালয়ের পরিবেশ সামাজিক পরিবেশ সেখানে শিশুও বেশ সামাজিক হয়ে ওঠে।

(৩) সামাজিক কারণ—ব্যাপক পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে অপরাধ-প্রবণতার কারণ ও মাত্রা, সামাজিক সংগঠন ও সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব কতকগুলি বিধিনিষেধ ও নৈতিক আদর্শ থাকে। এগুলির দ্বারা ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজের মধ্যে যদি আভ্যন্তরীণ দলাদলি, ঘুষ-খাওয়া, কালোবাজারী, প্রতারণ ইত্যাদির মাত্রা বেড়ে যায় তবে অপরাধপ্রবণতাও বেড়ে যাবে।

(৪) মনস্তাত্ত্বিক কারণ—প্রত্যেক শিশুর মৌলিক চাহিদাগুলি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। শিশুর ভালবাসার চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা ইত্যাদির পরিতৃপ্তি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু এগুলি প্রায় সময়ই অতৃপ্ত থেকে যাওয়ার ফলে অপসঙ্গতি দেখা দেয়। এই অপসঙ্গতি দূর করার জন্য শিশু নানারকম পরিপূরক আচরণ করে। এই ধরনের আচরণ সমাজের কাছে অবাঞ্ছিত মনে হয়। আসলে এরা না জেনেই অপরাধ করে ফেলে।

অপরাধপ্রবণতার শ্রেণীবিভাগ

অপরাধমূলক আচরণের শ্রেণীবিভাগ—এবার আমরা দেখব যে কোন ধরনের আচরণকে আমরা অপরাধমূলক আচরণ বলব। এই আচরণের মধ্যে পড়ে—অপহরণ বা চুরি, মিথ্যে কথা বলা, ভয় দেখানো, দম্ভ দেখানো, আক্রমণ, ধূমপান, এলোমেলো ঘুরে বেড়ানো, ক্লাসপালানো, শৃঙ্খলা ভঙ্গ, নেতিবাচক মনোভাব, প্রতারণা ও যৌন অপরাধ ইত্যাদি।

(১) নেতিমূলক আচরণ—সব কিছুর দোষ খুঁজে বার করা, সব রকম সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করা, কোন নির্দেশ না মানা, কারোর সহযোগিতা না করা ইত্যাদিকে আমরা নেতিমূলক আখ্যা দিয়ে থাকি। এগুলি যাদের মধ্যে থাকে তাদের প্রত্যেক কাজে একটা প্রতিবাদের প্রবণতা থাকে। তবে এগুলো খুব

মারাত্মক অন্যায় কিছু নয়। এগুলোকে ভালপথে চালনা করলে খুব ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।

শিশুর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতার চাহিদা থেকে এই ধরনের মনোভাব গড়ে ওঠে। তাই শুধু শাসন করে এই মনোভাব দূর করা যায় না। চাহিদার তৃপ্তির সুযোগ করে দিলে বরং অনেকখানি এই মনোভাব দূর হয়।

(২) ভীরুতা—যে সব ছেলেমেয়ে পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেনি তারাই পরিবেশ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে ও আপন জগতে বাস করে। কোন কাজে এদের উৎসাহ থাকে না—নিজেদের অক্ষমতাকে এরা মেনে নেয়। অনেক সময় অতিরিক্ত শাসনের ফলে শিশুর মধ্যে এধরনের আচরণ কেন্দ্রীভূত হয়। এদের স্বাভাবিক করতে হোলে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে। এদের কাজে এগিয়ে দিয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করতে হবে।

(৩) ক্লাস পালানো—এই রকম অপরাধপ্রবণতা অনেক শিশুর মধ্যেই দেখা যায়। বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শাস্তির ব্যবস্থা থাকলে, শ্রেণীকক্ষে শিশু তার মনের মত খোরাক না পেলে, শিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতিতে ত্রুটি থাকলে পাঠ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ কমে যায়, তার ফলে ক্লাস পালানোর প্রবণতা দেখা দেয়। এই আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে এর সঠিক কারণ খুঁজে বার করতে হবে, শিক্ষককে এ ব্যাপারে সচেতন হ'তে হবে, পাঠে আগ্রহ সঞ্চারের চেষ্টা করতে হবে।

(৪) মিথ্যে কথা বলা—শিশুরা নানা কারণে মিথ্যে কথা বলে। কখনও খেলাচ্ছলে, কখনও কল্পনার জাল বিস্তার করে, কখনও অতিরঞ্জিত করে মিথ্যে কথা বলে। এগুলো অবশ্য তেমন ক্ষতিকর নয়। কিন্তু যখন শিশু উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয় তখন সেটা মারাত্মক রূপ নেয়। যে সব শিশু পড়া পারে না তারা নিজের অক্ষমতাকে ঢাকবার জন্য নানারকম মিথ্যে বলে। এই মিথ্যাকে শিশুরা অহমের আত্মরক্ষার কৌশল হিসাবে ব্যবহার করে। এগুলোও দূর করতে হলে কারণ খুঁজে বার করতে হবে ও বিদ্যালয়ের উন্নতি করতে হবে।

(৫) আক্রমণাত্মক মনোভাব—অনেক শিশুকে দেখা যায় অন্যকে খুব মারধোর করে। নিরাপত্তার অভাববোধ থেকেই আক্রমণাত্মক মনোভাব জাগে। আত্মস্বীকৃতি পাওয়ার জন্য সে এরকম আচরণ করে। খুব সহানুভূতিশীল মন নিয়ে এই আচরণকে সংযত করার চেষ্টা করতে হয়।

(৬) চুরি করা—শিক্ষার্থীদের মধ্যে চুরি করার আচরণও দেখা যায়। কোন বিশেষ চাহিদা চরিতার্থ করার জন্য শিশু অনেক সময় চুরি করে। কোন কোন শিশু বিশেষ মানসিক বিকারের জন্য চুরি করে। একে অস্বাভাবিক চুরি (pathological stealing) বলা হয়। মানসিক দ্বন্দ্বের দরুণ শিশু কোন বিশেষ বস্তুকে, কোন আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রতীক হিসেবে ধরে নিয়ে চুরি করে ফেলে; ঐ বস্তুটি পাওয়ার মধ্যে সে আনন্দ পায়। অহম্ সত্তার প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিলে এই প্রবণতা খানিকটা দূর করা যায়।

(৭) যৌন অপরাধ—বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নানারকম অপরাধ-প্রবণতা দেখা যায় তার মধ্যে যৌন অপরাধ একটা বড় অপরাধ। কৈশোরে যৌনচেতনা আসার সঙ্গে সঙ্গে কিশোরদের মনে নানারকম কৌতূহল জন্মায়; এই কৌতূহল মেটাতে গিয়ে তারা অনেক সময় বিকৃত যৌন আচরণ করে ফেলে। নানারকম অশালীন মন্তব্য ও ইঙ্গিত করে থাকে।

এগুলি দূর করার জন্য কিশোরদের সামনে সুস্থ জীবনাদর্শ তুলে ধরতে হবে। স্বাস্থ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত যৌনশিক্ষার যে অংশ পড়ে সেই অংশটুকু তাদের সামনে তুলে ধরলে এই অপরাধপ্রবণতা খানিকটা কমতে পারে।

অপরাধপ্রবণতা দূর করার উপায়

এখন দেখা যাক অপরাধপ্রবণতা দূর করা যাবে কি করে। সামাজিক স্বাস্থ্য বজায় রাখলে অপরাধপ্রবণতা অনেকাংশে কম হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অপরাধপ্রবণতা দুভাবে দূর করা যায়—(১) প্রতিরোধমূলক উপায়ে (২) নিরাময়মূলক উপায়ে। প্রতিরোধ ব্যবস্থা আবার ব্যক্তিগতভাবে দেওয়া যায় ও সমষ্টিগতভাবে দেওয়া যায়।

প্রতিরোধমূলক উপায় (Preventive measure)—শিশু একবার অপরাধপ্রবণ হয়ে গেলে তারপর সারানর চেয়ে অপরাধপ্রবণ যাতে না হয় সেদিকে একান্তভাবে খেয়াল রাখা উচিত। এখন দেখা যাক ব্যক্তিগতভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা কি ভাবে করা যায়। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যখন ব্যক্তিগত-ভাবে ফলপ্রদ হয় তখন তাকে ব্যক্তিগত প্রতিরোধমূলক উপায় বলা হয়। যেমন—

(১) শিশুর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী (২) শিশুর উন্নত চরিত্র যাতে হয় বাবা-মার সেদিকে নজর রাখতে হবে (৩) শিশুর প্রতি আদর, অনাদরের

বৈষম্য দূর করতে হবে (৪) শিশুর খাদ্য, বিশ্রাম, খেলাধূলা ও অবসর যাপনের সুব্যবস্থা করতে হবে, (৫) শিশুর সঙ্গী ও বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, (৬) শিশুকে স্বাধীনতা দিতে হবে ও চাহিদার পরিতৃপ্তি বিধানের চেষ্টা করতে হবে, (৭) শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হবে।

যদি সামাজিক সংগঠনের উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় তবেই তাকে সমষ্টিগত প্রতিরোধমূলক উপায় বলব। সমাজের সংগঠনের উন্নতি হলেই ব্যক্তির উন্নয়ন হবে। সামাজিক সংগঠনের উন্নতি করতে হলে—

(১) দেখতে হবে সমাজ যেন প্রগতিশীল হয়। প্রাচীন গোঁড়ামী যেন তাকে পেয়ে না বসে, (২) সমাজে যেন কোন ব্যক্তির নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ না হয়, (৩) প্রত্যেক সমাজের যেন নির্দিষ্ট আদর্শ ও নৈতিক মান থাকে, (৪) সামাজিক বিধি নিষেধের উপর ব্যক্তির যেন শ্রদ্ধা ও আনুগত্য থাকে।

নিরাময়মূলক উপায় (Curative measure)—বহু সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যদি কোন কারণে অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয় তবে তা নিরাময় করে ফেলা উচিত। এ ক্ষেত্রে অবশ্য মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। এছাড়াও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা হিসেবে কতকগুলি উপায় অবলম্বন করা যায়। যেমন—

(১) যদি পরিবেশের প্রভাবে শিশু অপরাধপ্রবণ হ'য়ে থাকে তবে পরিবেশ বদল করে তা দূর করার চেষ্টা করা। শিশুর গৃহপরিবেশ ভাল না হ'লে তাকে দূরে কোন ছাত্রাবাস বা আশ্রমে রাখা। (২) শিশুর চাহিদা মেটানর ব্যবস্থা করা (৩) শিশুর পারিবেশটি সৃজনধর্মী করা (৪) শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করার চেষ্টা করা (৫) সব সময় শিশুকে কাজে ব্যস্ত রাখা (৬) অবসর যাপনের সুব্যবস্থা করা, কিছু সদভ্যাস গড়ে তোলা (৭) অপরাধপ্রবণ শিশুর প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করা (৮) নিয়মশৃঙ্খলার সঙ্গে শিশুকে অভ্যস্ত করান, ইত্যাদি।

অপরাধপ্রবণ শিশুদের সঙ্গে শিক্ষক কেমন ব্যবহার করবেন এখন এটাই হ'ল প্রশ্ন—

শিক্ষকই শিশুর বিভিন্ন সমস্যা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন ও সমাধানের পথ খুঁজে বার করতে পারেন। অপরাধ প্রবণ শিশুকে ধৈর্য ও সহানুভূতির সঙ্গে দেখবেন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন তিনি। শিশুর আগ্রহ অনুযায়ী কাজ দিতে এবং শিশুর কতকগুলি ভাল অভ্যাস গঠনে সাহায্য করবেন শিক্ষক। তিনি শিশুর দোষ ত্রুটিকে বড় করে না দেখে হাল্কা করে দেখতে

চেষ্টা করবেন। শিশুর কাজ নিয়ে যেন কেউ বিদ্রূপ না করে তা দেখবেন শিক্ষক। শিশুর মা বাবার সঙ্গে পরামর্শ করবেন তিনি। শিক্ষক শিশুর বিশ্বাসভাজন ও ভালবাসার পাত্র হবেন। শিশুর সঙ্গীসাথী যদি মনোমত না হয় তবে তারও পরিবর্তন দরকার। নানা রকম সহপাঠ্যক্রমিক বিষয়ের অবতারণা করে শিশুর বহুবিধ চাহিদা মেটানর পথ করে দিতে হবে তাঁকে। এক কথায় বলা যায় শিক্ষককে অপরাধপ্রবণ শিশুর সঙ্গে খুব মিশতে হবে; দরদী মন থাকলে তিনি নিশ্চয়ই তার মঙ্গল করতে পারবেন।

প্রশ্নাবলী

1. Describe maladjusted children. How can they be psychologically helped ? (C. U. B. T. 1967)

2. What is delinquency ? Discuss its various manifestations. How can you treat a delinquent child ?

চতুর্দশ অধ্যায়

ব্যক্তিসত্তার সামাজিক বিকাশ

(Developing the Social Aspects of Personality)

সামাজিক বিকাশ বলতে বুঝি শিশুর পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্রমবিকাশ। শিশু যখন জন্মায় তখন সে সামাজিক থাকে না অসামাজিক থাকে এ প্রশ্নই উঠে না। ধীরে ধীরে শিশু যখন সমাজের বহু মানুষের সঙ্গে, সংঘের ও সংগঠনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে তখন একক শিশু সামাজিক শিশুতে রূপান্তরিত হয়। শিশুর সামাজিক বিকাশ ঘটলে তার মধ্যে কতকগুলো বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন শিশুর মধ্যে সামাজিক আচরণের উপযোগী মানসিক সংগঠন, নির্ভরশীলতা, সহানুভূতি, সহযোগিতা, দয়া, মায়া, মহত্ত্ব, বন্ধুত্ব ইত্যাদি গুণ যে গুলি এতদিন তার মধ্যে সুপ্ত ছিল সেগুলি উপযুক্ত পরিবেশ পেলে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠে।

অন্যান্য বিকাশের সঙ্গে সমতা রেখে ব্যক্তিজীবনে সামাজিক বিকাশ সুরু হয়। প্রথমে শিশু সহজ সামাজিক প্রতিক্রিয়া শেখে, ধীরে ধীরে জটিল সামাজিক পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য তৈরী হয়।

এই সামাজিক বিকাশের ধারা সর্বদাই উন্নতির দিকে যাচ্ছে। সামাজিক বিকাশ সমাজ পরিবেশেই সম্ভব ; কৃত্রিম পরিবেশে সম্ভব নয়।

সামাজিক বিকাশ দৈহিক, মানসিক এবং প্রাক্ষোভিক বিকাশের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।

সামাজিক বিকাশ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করতে থাকে।

সামাজিক বিকাশকে দু'দিক থেকে দেখা যায়। (১) সামাজিকীভবন (Socialisation) (২) সামাজিক পরিণমন (Social maturity)।

সামাজিকীভবন—জন্মমুহূর্ত থেকে শিশু ধীরে ধীরে সামাজিক হোতে থাকে। শিশু জন্মের একমাসের মধ্যে আশেপাশের মানুষ সম্বন্ধে সচেতন হয়। ২ মাসের মধ্যে অন্যান্যদের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে শেখে। ৩।৪ মাসের সময় দেখা যায় শিশু খুব কাঁদছে কিন্তু পাশে কেউ কথা বললে চুপ করে যায়, কাছ থেকে চলে গেলে আবার কাঁদে। ৫।৬ মাস বয়সে আদর ও বকুনিকে তফাৎ করতে শেখে। বকুনি দিলে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদে। নতুন লোকের কাছে যেতে চায় না। ৮।৯ মাস বয়সে শিশু একটু আধটু অনুকরণ করতে শেখে। ১ বছর বয়সে শিশুকে কোন কিছু করতে নিষেধ করলে সে আর তা করে না। দেড় বছর বয়সে সে সমবয়সীদের থেকে বড়দের সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে মিশতে বেশী ভালবাসে।

২ বছর বয়সেও শিশু সমবয়সীদের সঙ্গে বেশীক্ষণ খেলতে পছন্দ করে না। ৩—৫ বছর বয়সে তার সহযোগিতার মনোভাব দেখা যায়। ৬ বছর বয়সে শিশুর সামাজিক বৈশিষ্ট্য আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এই সময় সে দলগত খেলা পছন্দ করে। ১২ বছর পর্যন্ত এই মনোভাব অক্ষুন্ন থাকে।

১২ বছরের পর শিশু যখন কৈশোরে পৌঁছয় তখন তার সামাজিক বিকাশ এক বিশেষ রূপ নেয়। দলের প্রতি আনুগত্য বাড়ে, সমবেদনা, ন্যায়-অন্যায় বোধ ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক পরিণমন—সামাজিক বিকাশ বহু ভিন্নধর্মী শক্তির সমন্বয়ে ঘটে থাকে। এই শক্তির কতকগুলি সহজাত আর কতকগুলি পরিবেশ সঞ্জাত।

সহজাত শক্তিগুলির প্রথমেই আসে পরিণমন। সামাজিক বিকাশ নির্ভর করে আর ও স্বজনের আচরণের উপর আর এই আচরণ নির্ভর করে শিশুর

দৈহিক, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক পরিণমনের উপর। ধরা যাক একটা ৪ বছরের শিশুকে ৮ বছরের উপযোগী আচরণ শেখান গেল। আর একটা ৬ বছরের ছেলেকেও ৮ বছরের আচরণ শেখান গেল। দুজনেরই ৮ বছর বয়সের সময় দেখা যাবে দুজনের শেখার কোন তফাৎ নেই। একজন ৪ বছর অভ্যাস করে যা ফল পেল অন্য জন ২ বছর অভ্যাস করেও তাই ফল পেল। এটা পরিণমনের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

বুদ্ধি—বুদ্ধির উপরও শিশুর সামাজিক বিকাশ অনেকখানি নির্ভর করে। সকলে সমান বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় না, আর বুদ্ধি বাড়ার হারও সকলের ক্ষেত্রে সমান থাকে না। ফলে সামাজিক আচরণ একই বয়সের শিশু সমানভাবে আয়ত্ত করতে পারে না। সাধারণ বুদ্ধি শিশু সামাজিক আচরণের পক্ষে যথেষ্ট তবে সাধারণের চেয়ে কমবুদ্ধি হোলে সামাজিক আচরণ আয়ত্ত করা কষ্টকর।

এছাড়া জন্মগত প্রবণতা, মনঃপ্রকৃতি ও প্রক্ষোভ ইত্যাদি সহজাত উপাদানের উপরও শিশুর সামাজিক বিকাশ নির্ভর করে।

শিখন—পরিবেশের যে শক্তি শিশুর সামাজিক বিকাশকে প্রভাবিত করে তার মধ্যে শিখন প্রধান। প্রচেষ্টা ও ভুল, অন্তর্দৃষ্টি, অনুবর্তন পদ্ধতি ছাড়াও শিশু অনুকরণ ও অভির্ভাবনের মাধ্যমে শেখে।

শিশুর গৃহপরিবেশও তার আচরণকে অনেকখানি প্রভাবিত করে। শিশু যে সমাজে বাস করে তার কৃষ্টি, প্রথা, রীতিনীতি শিশুর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তর—শিশুর পরিবারের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা তার সামাজিক বিকাশে সাহায্য করে। গরীবের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রায় আত্মপ্রত্যয়ের অভাব দেখা যায়। অন্যদিকে আবার বড়লোকের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঔদ্ধত্য, অবাধ্যতা, দাম্ভিকতা, আলস্য, অমনোযোগ ইত্যাদি দেখা যায়।

সামাজিক আচরণে বৈষম্য—সামাজিক আচরণের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করছে বিভিন্ন শক্তি ও উপাদান। বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে এইসব শক্তির তারতম্য ঘটে। ফলে শিশুর সামাজিক আচরণেরও তারতম্য ঘটে। যেমন কেউ খুব মিশুক হয়, কেউ আত্মকেন্দ্রিক ও লাজুক হয়, কেউ কর্তৃত্বপ্রিয়, কেউবা আক্রমণধর্মী হয়। সামাজিক বিকাশের পথে কোন বাধা না পড়লে শিশুর সমাজজীবন সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়। কিন্তু শিশুকে সব সময় প্রতিকূল অবস্থার

সঙ্গে আপোষ করে বড় হোতে হোলে তার মধ্যে অসামাজিক ভাব বেড়ে যায়।

সমানুভূতি (Identification)—অপরের সুখে দুঃখে সুখ-দুঃখ অনুভব করার নাম সমানুভূতি। ব্যক্তির নিজস্ব সংগতি বিধানের পক্ষে এটা যেমন প্রয়োজনীয় সমাজজীবন গঠনের পক্ষেও একটা অপরিহার্য।

সমানুভূতিমূলক আচরণ শিশুর মধ্যে যাতে গড়ে ওঠে সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এটা অবশ্য জোর করে শেখান যায় না—আশেপাশের বড়দের আচরণের মধ্যে যদি সমানুভূতিমূলক আচরণ দেখা যায়, তবেই শিশু পরোক্ষভাবে কখনও তা রপ্ত করে ফেলে।

বন্ধুত্ব—শিশুর মধ্যে যখন থেকে ভালবাসার প্রক্ষোভ জাগে তখন সে অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্বের পরিধি বেড়ে যায় ও বন্ধু নির্বাচনের মাপকাঠি যায় বদলে। একই সামাজিক সংগঠনের মধ্যে থাকলে সাধারণতঃ শিশুদের মধ্যে বন্ধুও হয়। তাছাড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, পরিবারের আদর্শ ও সাংস্কৃতিক মান এই বন্ধুত্বকে অনেকখানি প্রভাবিত করে।

আক্রমণধর্মিতা ও প্রতিরোধ—খুব ছোট বেলা থেকেই শিশুর মধ্যে প্রতিরোধ প্রবণতা দেখা যায়। শিশুর পছন্দমত কাজ না হলে শিশু হাত পা শক্ত করে, চীৎকার করে কাঁদে। একটু বড় হলে এটি একগুঁয়েমিতে ও অবাধ্যতায় রূপান্তরিত হয়। প্রতিরোধমূলক আচরণের মধ্যে দিয়ে শিশু আসলে প্রচলিত সামাজিক আচরণের স্বরূপটা জানতে চায় ও সেই সঙ্গে নিজের আচরণটাও যাচাই করে নিতে চায়। বাবা মা শিশুর সঙ্গে আচরণের সময় শিশুর ইচ্ছা ও চাহিদা ঠিকমত বুঝতে পারেন না; ফলে তাঁরা যেহেতু শিশুর পছন্দের উল্টো আচরণ করছেন, শিশুও তাঁদের পছন্দের উল্টো আচরণ করতে চায়। এছাড়া অন্যান্য বয়স্কদের আচরণ যেমন শিক্ষক ইত্যাদির আচরণকেও শিশু তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে মনে করে; তাই সে প্রতিরোধমূলক আচরণের মধ্যে দিয়ে তার শোধ নিতে চায়। অনেক সময় শিশুর সামর্থ্যের বাইরে কাজ দিলে তার মধ্যে প্রতিরোধমূলক আচরণ গড়ে ওঠে।

অবশ্য বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধমূলক আচরণ অনেকখানি কমে যায়। সে ক্রমশঃ দশেরপ্রিয় ও সামাজিক হতে থাকে, ফলে সে আপনা থেকেই সামাজিক আচার-আচরণ শিখে ফেলতে চায়।

প্রতিরোধমূলক আচরণের সঙ্গে আক্রমণধর্মী আচরণের একটা যোগ আছে। সাধারণতঃ অতিরিক্ত রাগ থেকেই এই আচরণের জন্ম। শিশু একটু বড় হলে মারামারি, ঝগড়া ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে এই আচরণ প্রকাশ করে। বড় হলে এই আক্রমণধর্মী মনোভাবটি পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়; তার ফলে দৈহিক স্তর ছেড়ে এটি মানসিক স্তরে উন্নীত হয়; তখন একে অপরকে সমালোচনা, নিন্দা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, উপহাস ইত্যাদি করে আক্রমণধর্মী আচরণ চরিতার্থ করে। নানারকম প্রতিযোগিতামূলক ও সৃষ্টিমূলক কাজের ব্যবস্থা করলে আক্রমণধর্মী আচরণ খানিকটা প্রশমিত হয়। সামাজিক পরিবেশে সাফল্য লাভের জন্য সংযত মাত্রায় আক্রমণধর্মিতার মনোভাব থাকা অপরিহার্য।

প্রতিযোগিতা—শিশু যখন থেকেই সামাজিকতা বোধের আওতায় আসে তখন থেকেই তার মধ্যে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব দেখা যায়। স্কুলে আসতে সুরু করলেই শিশু অন্যের কাছ থেকে নিজের কাজের প্রশংসা ও সমর্থন পাবার জন্য লালায়িত হয়। এর ফলেই কিন্তু শিশুদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। এই মনোভাব বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই চলে এবং সারা জীবন থাকে।

আমাদের সমাজে প্রতিযোগিতামূলক আচরণকে সমর্থন করা হয়, কারণ এর ফলে শিশু নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে কাজ করতে যায়। স্কুল-জীবনে দেখা যায় ক্লাস প্রমোশন, পরীক্ষায় মার্কস পাওয়া, পুরস্কার পাওয়া ইত্যাদির সাহায্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবকে তীব্র করার চেষ্টা করা হয়। এই প্রতিযোগিতামূলক আচরণের মধ্যে দিয়ে শিশু অন্যের কাছে নিজের মূল্য প্রমাণ করতে চায়। গৃহপরিবেশেও মা বা ও আত্মীয়স্বজনরা শিশুরা আচরণকে অন্য সমবয়সী শিশুদের আচরণের সঙ্গে তুলনা করে প্রতিযোগিতার মনোভাব বাড়িয়ে দেন। প্রতিযোগিতামূলক আচরণটি ঠিক পথে পরিচালিত না হলে এর থেকে ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা ইত্যাদি আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে, স্বাভাবিকভাবেই শিশুদের মধ্যে সহযোগিতা ও প্রীতির ভাব কমে যায়, শিশুরা স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। যারা প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হয় তাদের মনে আশাভঙ্গ, আত্মগ্লানী, লজ্জা ইত্যাদি এসে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে দেয়। বহুক্ষেত্রে তারা সমস্যামূলক আচরণ করে। ফলে সমাজ জীবনের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্য শিশুদের মধ্যে অতিরিক্ত প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে না তোলাই ভাল।

সহযোগিতা—প্রতিযোগিতার থেকে সহযোগিতামূলক মনোভাব সামাজিক পরিবেশের পক্ষে ভাল। এ বিষয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মনে কোন সংশয় নেই। সহযোগিতামূলক আচরণের মধ্যে দিয়ে শিশু দলগত স্বার্থকে বড় করে দেখতে শেখে। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে শিশু ব্যক্তিস্বার্থকে বড় বলে মনে করে। দলগত কল্যাণই যে শিশুর আদর্শ—একথা তাকে বুঝিয়ে দিতে পারলে—শিশুর পরিবেশে সহযোগিতামূলক আচরণ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং এর ফলে শিশুর কাজের অগ্রগতি প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের ফলে যে অগ্রগতি তার চেয়ে কম হবে না। সহযোগিতামূলক আচরণের আর একটি ভাল দিক হল এর মধ্যে কোন তিক্ততা, রেষারেষি ও অবাঞ্ছিত মনোভাব নেই। বরং সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের মনোভাবের ফলে সমাজের মধ্যে মানসিক ও সামাজিক বিকাশের পক্ষে এক অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সমাজজীবন ঐক্যবদ্ধ ও স্থায়ী হয়।

প্রশ্ন

1. Describe a few social behaviours that determine the nature of the child's social growth.

পঞ্চদশ অধ্যায়

শিক্ষায় রাশিবিজ্ঞান (Educational Statistics)

গাণিতিক তত্ত্বের ব্যবহারের উপর নির্ভর করে যে কোন বিজ্ঞানের অগ্রগতি। গণিত হ'ল পরীক্ষিত বিজ্ঞান। তাই এর ফলাফল, বিজ্ঞানের যুক্তিকে অকাট্য করার কাজে ব্যবহৃত হয়। রাশি বিজ্ঞান হ'ল গণিতেরই একটি শাখা, যে বিজ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কোন বিশেষ বস্তুকে অথবা বিশেষ সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে পর্যবেক্ষণের সাহায্যে রাশি তত্ত্বের সংকলন ক'রে তাদের তাৎপর্য নির্ণয় করা হয় তাকে রাশিবিজ্ঞান (Statistics) বলা হয়। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে গিয়ে রাশিবিজ্ঞানের বিভিন্ন নাম হয়েছে। মনোবিজ্ঞানে এর নাম হ'ল Psychometry, অর্থবিজ্ঞানে এর নাম Econometry, নৃতত্ত্বে এর নাম হ'ল Anthropometry, সমাজবিদ্যায় এর নাম Sociometry, প্রাণীবিদ্যায় নাম হয়েছে Biometry ইত্যাদি।

রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

(১) রাশিবিজ্ঞানের সাহায্যে খুব সহজে কোন জিনিসের প্রকৃত স্বরূপ জানা যায়।

(২) রাশিবিজ্ঞানের জ্ঞান আমাদের নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছুতে ও পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করে।

(৩) এই বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা খুব কম পরিমাণ সংখ্যা-তত্ত্ব (data) থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারি।

(৪) রাশিবিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের পর্যবেক্ষণের ফলাফলকে অর্থপূর্ণ ও বোধগম্য করতে পারি।

(৫) রাশিবিজ্ঞান কোন বিশেষ জ্ঞান থেকে অন্য বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে সাহায্য করে।

(৬) কোন ঘটনা অনেকগুলি কারণে ঘটে। রাশিবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা কোন ঘটনার আসল কারণ খুঁজে বার করতে পারি।

রাশিবিজ্ঞানের পদ্ধতি

প্রত্যেক বিজ্ঞানের মত রাশিবিজ্ঞানও কতকগুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে চলে যেমন—

(১) **তথ্য সংগ্রহ** (Collection of data)—কোন জিনিসের বা মানুষের কোন বিশেষ গুণ সম্বন্ধে জানতে হলে সে সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে হয়; এই তথ্য গুণবাচক বা সংখ্যাবাচক হোতে পারে। গুণবাচক হোক আর সংখ্যাবাচক হোক এর থেকে যে রাশিমালা আমরা পাব সেটাই আমাদের জ্ঞান অন্বেষণে সাহায্য করবে। তথ্য সংগ্রহ অবশ্য নানারকমে হোতে পারে। যেমন—(১) কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময়ে পর্যবেক্ষণ করে।

(২) বিভিন্ন ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট সময়ে পর্যবেক্ষণ করে।

(৩) কোন প্রতিষ্ঠানের বিবরণী থেকে আহৃত তথ্য।

(২) **সারি বিন্যাস** (Rank order)—বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে তুলনামূলক কোন জিনিস জানতে হলে পরিমাপের জিনিষগুলোকে গুণ অনুসারে সাজিয়ে ফেললে ভাল হয়।

স্কোর (Score)—ব্যক্তির পরিমাপকে অঙ্কের সাহায্যে প্রকাশ করলে তাকে স্কোর বলা হয়। ব্যক্তির উচ্চতা, পরীক্ষার ফলাফল, মাসিক বেতন

ইত্যাদি স্কোরের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যগুলি স্কোর দিয়ে প্রকাশ করা যায় না।

স্কেল (Seale)—স্কোর অথবা নাম্বারগুলিকে কোন একক (unit) হিসেবে যখন ধাপে ধাপে সাজান হয় তখন তাকে স্কেল বলা হয়। স্কেলের সংখ্যাগুলো একের থেকে অন্যের সমান দূরত্ব বজায় রাখে। কোন স্কেলের অন্তর্ভুক্ত পর পর দুটি সংখ্যার বিয়োগ ফলই হ'ল স্কেল। যেমন—১০, ১৫, ২০ ইত্যাদি এখানে ৫ সংখ্যায় স্কেল ধরা হয়েছে।

অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন সারি (Variables—Continuous and discrete Series)—সে সব ক্ষমতা বা গুণকে স্কোর দিয়ে প্রকাশ করা হয় তাকে বলা হয় Variable। এই Variable কে দু ভাগে ভাগ করা যায়—অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন সারি। অবিচ্ছিন্ন সারিতে দুটো স্কোরের মধ্যে যে ফাঁক থাকে তাকে প্রয়োজনে আরও ছোট ছোট অংশে ভাগ করা যায়। যেমন, ৪ ফুট ৫ ফুট ৬ ফুট—এই সারিতে ৪′ ৩″—৪′ ৬″—৪′ ৯″ ইত্যাদিতে ভাগ করা যায়, আবার ৫′ ৩″—৫′ ৬″—৫′ ৯″ ইত্যাদিতে ভাগ হয়।

কিন্তু বিচ্ছিন্ন সারিতে স্কোরের যে ব্যবধান থাকে তাকে আর ভাগ করা যায় না। যেমন ৪টি মানুষ ৫টি মানুষ ৬টি মানুষ ইত্যাদি। এদের মধ্যে ভাগ বাস্তব ক্ষেত্রে হয় না।

ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন (Frequency Distribution)—সাধারণ স্কোরগুলিকে পরিসংখ্যান শাস্ত্রে বা রাশিবিজ্ঞানে যেভাবে সাজান হয় তাকে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন বলে। ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে স্কোরগুলি কতবার এসেছে—সেই অনুসারে সাজান হয়। এইভাবে কতকগুলি অবিন্যস্ত স্কোরকে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে যখন সাজান হয় তখন তাকে বিন্যস্ত স্কোর বলা হয়। ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন তৈরী করার কতকগুলি নিয়ম আছে। যেমন—

(১) প্রথমে স্কোরগুলির প্রসার কত তা ঠিক করে দিতে হয়। বৃহত্তম স্কোর ও ক্ষুদ্রতম স্কোর-এর মধ্যে যে ব্যবধান তাকে প্রসার বলে। বৃহত্তম স্কোর থেকে ক্ষুদ্রতম স্কোর বিয়োগ করলে প্রসার (Range) পাওয়া যায়।

(২) স্কোরগুলিকে সাজাবার জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভাগ করতে হয়। একে শ্রেণী ব্যবধান (Class Interval) বলে। শ্রেণী ব্যবধান নির্ভর করে স্কোরের প্রকৃতি ও প্রসারের উপর।

(৩) এইবার প্রত্যেকটি স্কোর যে শ্রেণী ব্যবধানের অন্তর্ভুক্ত সেই শ্রেণী-ব্যবধান অনুসারে তাকে সাজাতে হবে।

ধর, যাক ৫০টা স্কুলের ছেলের অঙ্কের পরীক্ষা নিয়ে ৫০ জনের মার্কস্ পাওয়া গেল। সেগুলি হল—

৮৫	৬৬	৫১	৪৫	৬৬	৯১	৭৭	৬৪	৭১	৭৪
৪৭	৭৮	৫৮	†৪২	৭০	৫৮	৭১	৬৭	৮০	৭৮
৭৩	৪৮	৬৮	৮৭	৮১	৭২	৬৫	৬৯	৭৩	৭৯
*৯৭	৮১	৭৬	৮৭	৫৬	৭২	৬২	৯৩	৭৩	৮৪
৭৫	৫৬	৭৬	৬১	৫৩	৭২	৬২	৭৯	৮৮	৮৩

প্রথমে এই স্কোরগুলির প্রসার বার করে নিতে হবে। এর বৃহত্তম স্কোর হল ৯৭ আর ক্ষুদ্রতম স্কোর হল ৪২। ৯৭ থেকে ৪২ বিয়োগ দিলে পাওয়া যাবে ৫৫—এটাই হল এর রেঞ্জ।
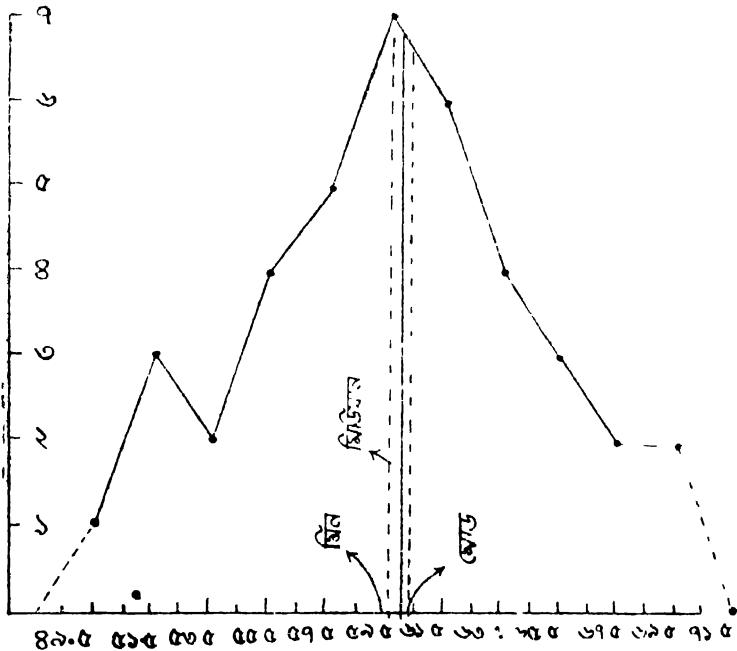
এর পরের কাজ হল ক্লাস ইণ্টারভ্যাল ঠিক করে নেওয়া। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে শ্রেণী ব্যবধান এমনভাবে বার করতে হবে যেগুলি দশের কম বা কুড়ির বেশী না হয়। এখানে যদি ৫ এর ব্যবধানে ভাগ করা হয় তবে ৫৫কে ৫ দিয়ে ভাগ করলে ১১ পাওয়া যাবে; আর এর উপরের একটা শ্রেণী বেশী নেওয়ায়

দরকার। তাহলে হবে ১১+১=মোট ১২টি শ্রেণী ব্যবধান যদি ১০ নেওয়া হোত তবে শ্রেণীর সংখ্যা হোত ৫+১=৬টি। আমরা এখানে ৫কে ব্যবধান হিসেবে ধরে নিয়ে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন করব।—

এখানে স্কোরগুলিকে নিজেদের শ্রেণী ব্যবধান অনুসারে সাজান হল। ছবিতে বাঁ দিকের প্রথম সারিতে শ্রেণী ব্যবধান দেখান হয়েছে। সব চেয়ে বড় স্কোরটি আছে সবার উপরে। তারপর ক্রমশঃ ছোট হোতে হোতে সব চেয়ে ছোট স্কোর পেলাম সেটি আছে সবার নীচে। Rangeকে ধাপ দূরত্ব দিয়ে ভাগ করলে ধাপ সংখ্যা পাওয়া যায়। যেমন এখানে—

৯৭ হচ্ছে সবচেয়ে বড় স্কোর
৪২ „ „ ছোট „
৫৫ হচ্ছে Range

ধাপ দূরত্ব হচ্ছে ৫। $\frac{\text{Range}}{\text{ধাপ দূরত্ব (Class interval)}}+১$

তাহলে অঙ্কটা হবে $\frac{৫৫}{৫}+১=১১+১=১২$।

(গ্রাফ কাগজে প্লট করার সুবিধার জন্য একটি শ্রেণী বেশী নিতে হয়।)

(২) দ্বিতীয় সারিতে—মধ্য বিন্দু নির্ণয় করা হয়েছে। কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিমূলক মান হিসাবে ঐ শ্রেণীর মধ্যবিন্দুকেই ধরা হয়। যে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত স্কোরগুলির প্রত্যেকটির মান ঐ শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর সমান বলে ধরা হয়। মধ্য বিন্দু বার করার সূত্র হল—

$$\text{মধ্যবিন্দু}=\text{শ্রেণীর নিম্ন প্রান্ত}+\frac{\text{ঊর্ধ্ব প্রান্ত}-\text{নিম্নপ্রান্ত}}{২}$$

এই সূত্র ধরে অঙ্কটি করলে দাঁড়াবে, ৪০—৪৪ এর মধ্য বিন্দু হবে

$৩৯\cdot৫+\frac{৪৪\cdot৫-৩৯\cdot৫}{২}=৩৯\cdot৫+\frac{৫}{২}=৩৯\cdot৫+২\cdot৫=৪২$

(৩) তৃতীয় স্তরে—প্রত্যেকটি স্কোর কোন শ্রেণীতে কতবার পড়েছে তা একটা করে দাগ দিয়ে বোঝান হয়; একে ট্যালি (Tally) বলা হয়। যেমন ৪০—৪৪ এই শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যে আছে ১টা স্কোর—৪২। কাজেই একটা দাগ দিয়ে বোঝান হল। ৪৫—৪৯ এর মধ্যে আছে ৪৫,৪৭,৪৮—এই তিনটি স্কোর, তাই এখানে তিনটে দাগ পড়ল।

(৪) এর পরের স্তরে Tallyর দাগগুলোকে গুণে সংখ্যায় প্রকাশ করা

হয়েছে। একে বলা হয় frequency। এটা দেখে কোন সারিতে কতকগুলো স্কোর আছে তা বেশ বোঝা যায়।

ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের চিত্র—এলোমেলো স্কোরগুলিকে ফ্রিকোয়েন্সী অনুসারে শ্রেণী ব্যবধানে সাজিয়ে যে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন করা হয় তাকে ছবি দিয়েও সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায়। সাধারণতঃ দুরকম ছবি দিয়ে প্রকাশ করা যায়—(১) ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন বা বহুভূজ (২) হিষ্টোগ্রাম বা আয়তরেখ অঙ্কন।

(১) **ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন**—যে কোন গ্রাফ আঁকার সময় প্রথমে একটা অধঃরেখা (Base line) ঠিক করে নিতে হয়। একে বলা হয় X অক্ষরেখা। এই X রেখার বাঁ দিকে সর্বশেষ প্রান্তে লম্বভাবে একটা রেখা টানতে হয়। একে বলা হয় Y অক্ষরেখা।

এখন নীচের X অক্ষরেখার উপর শ্রেণী ব্যবধানগুলি পর পর বসাতে হবে। এই শ্রেণী ব্যবধান বসাবার সময় শ্রেণী ব্যবধানের প্রান্তগুলি বসাতে হবে, যেমন ৪০—৪৪ (৩৯·৫—৪৪·৫) বসাতে হবে।

এরপর Y অক্ষরেখার উপর ফ্রিকোয়েন্সীগুলি বসাতে হবে। প্রতিটি শ্রেণী ব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সী সেই শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দুর উপর বসাতে
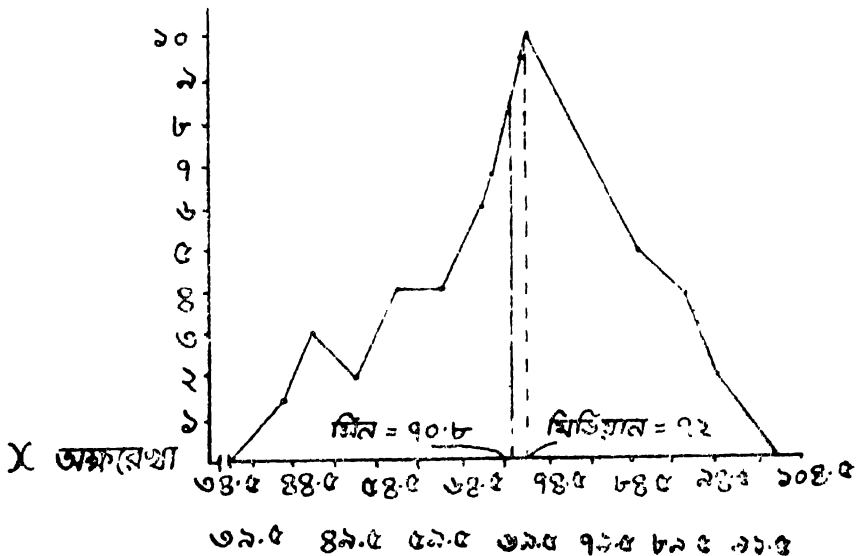
হবে। যেমন ৪০—৪৪ বা ৩৯·৫—৪৪·৫ শ্রেণীর ফ্রিকোয়েন্সী হোল ১।

এই শ্রেণীর মধ্যবিন্দু হচ্ছে ৪২। এর উপর লম্বভাবে Y অক্ষরেখায় এক একক দূরে একটা বিন্দু বসাতে হবে। এইভাবে যখন সব বিন্দু বসান হয়ে যাবে তখন বিন্দুগুলিকে সরলরেখা দিয়ে যোগ করলে ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনটি পাওয়া যাবে।

হিস্টোগ্রাম বা স্তম্ভচিত্র (Histogram)—ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের আর এক চিত্ররূপ হ'ল হিস্টোগ্রাম বা বহুভুজ। হিস্টোগ্রামে আমরা প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর উপর ফ্রিকোয়েন্সী বসিয়ে থাকি অর্থাৎ সমস্ত শ্রেণীকে কেবলমাত্র মধ্যবিন্দুর সাহায্যে প্রকাশ করে থাকি। কিন্তু হিস্টোগ্রামে সমস্ত শ্রেণী ব্যবধানটি একটি আয়তক্ষেত্রের সাহায্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়। হিস্টোগ্রামের নীচের রেখাটি শ্রেণীর দূরত্ব নির্দেশ করে ও উচ্চতা ঐ শ্রেণীর ফ্রিকোয়েন্সী নির্দেশ করে। শ্রেণীগুলির দূরত্ব সমান থাকে বলে আয়তক্ষেত্রের প্রস্থগুলি সমান হয় কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সী একরকম থাকে না বলে আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা বিভিন্ন হয়।

হিস্টোগ্রাম আঁকার নিয়ম প্রায় পলিগন আঁকার মতই। কেবলমাত্র ফ্রিকোয়েন্সী ঐ শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দুর উপর না বসিয়ে শ্রেণীর নিম্ন ও উচ্চ প্রান্তের উপর Y অক্ষরেখার একক অনুযায়ী দুটি বিন্দু বসিয়ে একটি আয়তক্ষেত্র আঁকতে হয়। এইভাবে প্রত্যেক শ্রেণী ব্যবধানের উপর নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সী অনুযায়ী একটি করে আয়তক্ষেত্র আঁকলেই সম্পূর্ণ হিস্টোগ্রামটি পাওয়া যায়।
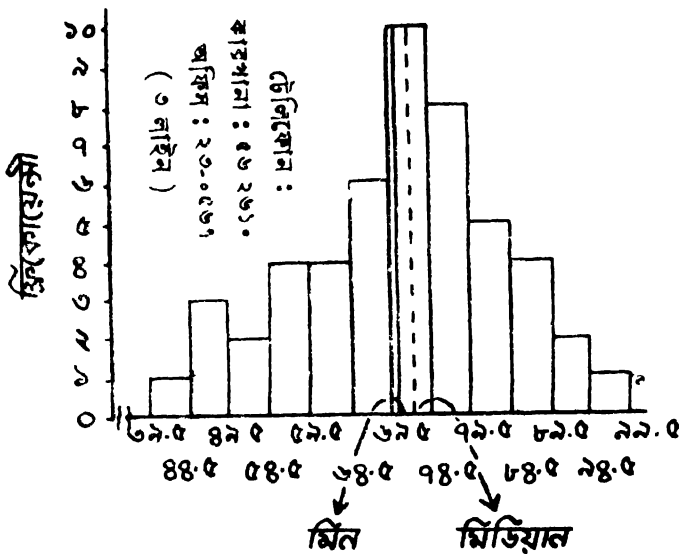
একই অক্ষরেখার উপর একই বা বিভিন্ন বণ্টনের দুটি বহুভুজ দুটি হিস্টোগ্রাম

অথবা একটি বহুভুজ ও একটি হিষ্টোগ্রাম কখনও কখনও আঁকা হয়। এর ফলে দুটি বণ্টনের একটা চমৎকার তুলনামূলক ধারণা পাওয়া যায়।

কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central Tendency)।

কোন পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণ থেকে পাওয়া অবিন্যস্ত স্কোরগুলিকে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে সাজানর পর তাদের কেন্দ্রীয় পরিমাপ বার করা হয়। কোন বণ্টনের কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলতে এমন একটা অঙ্ক বোঝায় যেটি সমস্ত স্কোরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। এটা ধরে নেওয়া হয় যে বিভিন্ন স্কোরের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তারা যখন একটা বণ্টনের অন্তর্ভুক্ত হয় তাদের বণ্টনের মাঝামাঝি জায়গায় যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকে; একেই বলা হয় কেন্দ্রীয় প্রবণতা। কেন্দ্রীয় প্রবণতার সাহায্যে স্কোরগুলির একটা সংক্ষিপ্ত ও সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়। আবার দুই বা ততোধিক দলের একটা তুলনামূলক চিত্রও পাওয়া যায় এই কেন্দ্রীয় প্রবণতার সাহায্যে। সাধারণতঃ তিনভাবে এই কেন্দ্রীয় প্রবণতার মাপ নির্ধারিত হয়—(১) গাণিতিক মিন (Arithmetic Mean) (২) মিডিয়ান (Median) ও (৩) মোড (Mode)।

(১) গাণিতিক মিন—কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের মধ্যে এই গাণিতিক মিন সবচেয়ে বেশী প্রচলিত। মিন বার করার নিয়ম হ'ল সমস্ত স্কোরগুলিকে যোগ করে সেই যোগফলকে মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা। সূত্রটি হ'ল :

$$M = \frac{\Sigma X}{N}$$

এখানে M = মিন ; X = স্কোর

N = স্কোরের মোট সংখ্যা

ΣX = স্কোরগুলির যোগফল

যেমন—দেখা গেল একটি ছেলে পাঁচবার পরীক্ষায় নম্বর পেয়েছে—৫০০, ৪০০, ৬২৫, ৫২৫ ও ৩৫০। তাহলে তার নম্বরের মিন কত? এটি কষতে হলে $\frac{৫০০+৪০০+৬২৫+৫২৫+৩৫০}{৫}$

$= \frac{২৪০০}{৫} = ৪৮০$

∴ মিন = ৪৮০।

মিন নির্ণয়ের এই সূত্রটি প্রয়োগ করা হয় যখন স্কোরগুলি অবিন্যস্ত অবস্থায়

থাকে। কিন্তু যখন ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে স্কোরগুলি শ্রেণীতে সাজান থাকে তখন মিন নির্ণয় করার সূত্র হোল— $M = \frac{\Sigma fX}{N}$

এখানে E মানে যোগফল; f মানে ফ্রিকোয়েন্সী; X মানে প্রত্যেক শ্রেণী ব্যবধানের মধ্য বিন্দু; N মানে স্কোরের মোট সংখ্যা।

শ্রেণী ব্যবধান	মধ্যবিন্দু	ফ্রিকোয়েন্সী	fX
৯০—৯৯	৯৪·৫	৪	৩৭৮·০
৮০—৮৯	৮৪·৫	৫	৪২২·৫
৭০—৭৯	৭৪·৫	৫	৩৭২·৫
৬০—৬৯	৬৪·৫	৭	৪৫১ ৫
৫০—৫৯	৫৪·৫	৩	১৬৩·৫
৪০—৪৯	৪৪·৫	৭	৩১১·৫
৩০—৩২	৩৪·৫	৮	২৭৬·০
২০—২৯	২৪·৫	৫	১২২·৫
১০—১৯	১৪·৫	৬	৮৭·০
০— ৯	৪·৫	৫	২২·৫
		N = ৫৫	fX = ২৬০৭·৫

মিন : $\frac{\Sigma fX}{N}$ অঙ্কটি কষলে হবে $\frac{২৬০৭·৫}{৫৫} = ৪৭·৪$

মিডিয়ান নির্ণয়ের উপায়।

স্কোরগুলি যখন অবিন্যস্ত অবস্থায় থাকে তখন মিডিয়ান বার করতে হোলে স্কোরগুলিকে আয়তন অনুসারে সাজিয়ে নিতে হয়। যেমন যদি সংখ্যা থাকে—৬, ৮, ৭, ১১, ১০, ৯, ৭। এই সংখ্যাগুলির মিডিয়ান বার করতে হোলে প্রথমে এগুলি আয়তন অনুসারে সাজিয়ে নিতে হবে। যেমন—৬, ৭, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১। এখানে মোট ৭টা স্কোর আছে। ৮ ঠিক মাঝখানে আছে। এর উপরে আছে ৪ টে স্কোর, নীচে আছে ৪ টে স্কোর। অতএব ৮ হোলো এই স্কোরগুলির মিডিয়ান বা মধ্যবিন্দু। এরূপ স্কোরের মিডিয়ান নির্ণয়ের সূত্র হল—$\frac{N(সংখ্যা)+১}{২}$

এখানে স্কোর সংখ্যা $\frac{৭+১}{২} = ৪$ অর্থাৎ চতুর্থ স্কোরটি হবে মিডিয়ান। চতুর্থ স্কোর এখানে হচ্ছে ৮। অতএব ৮ মিডিয়ান।

এখানে স্কোর সংখ্যা বিজোড় ছিল বলে মিডিয়ান খুব সহজে বার করা গেছে। কিন্তু স্কোরসংখ্যা জোড় থাকলে তখন মধ্য বিন্দুটি গঠন করে নিতে হয়। যেমন—

৮·৫
৬, ৭, ৮, ↑, ৯, ১০, ১১

সূত্র অনুসারে মিডিয়ান বার করলে দাঁড়াবে স্কোর সংখ্যা ছিল ৬।

$\frac{৬+১}{২}=\frac{৭}{২}=৩·৫$ অর্থাৎ ৩নং স্কোর ও ৪ নং স্কোরের মাঝখানে আছে মিডিয়ান।

ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে স্কোরগুলি যদি বিন্যস্ত থাকে তবে মিডিয়ান বার করার সূত্র হোল—

$$Mdn = L + \left(\frac{\frac{N}{2}-F}{fm}\right) \times i$$

L মানে যে শ্রেণী ব্যবধানে মিডিয়ানটি পড়ে তার নিম্নপ্রান্ত। $\frac{N}{2}$=মোট স্কোর সংখ্যার অর্ধেক। F=L এর নীচে শ্রেণী ব্যবধানগুলিতে যত স্কোর আছে তাদের যোগফল।

fm=যে শ্রেণী ব্যবধানে মিডিয়ানটি পড়ে সেই শ্রেণী ব্যবধানটির স্কোরের সংখ্যা।

i=শ্রেণী ব্যবধানের দৈর্ঘ্য।

শ্রেণী ব্যবধান	মধ্য বিন্দু	f	fX
১৯৫—১৯৯	—১৯৭	—১	১৯৭
১৯০—১৯৪	—১৯২	—৩	৫৮৪
১৮৫—১৮৯	—১৮৭	—৪	৭৪৮
১৮০—১৮৪	—১৮২	—৫	৯১০
১৭৫—১৭৯	—১৭৭	—৭ ↑ ২০	১৪১৬
১৭০—১৭৪	—১৭২	—১০	১৭২০
১৬৫—১৬৯	—১৬৭	—৬ ↑ ২০	১০০২
১৬০—১৬৪	—১৬২	—৪	৬৪৮
১৫৫—১৫৯	—১৫৭	—৪	৬২৮
১৫০—১৫৪	—১৫২	—২	৩০৪
১৪৫—১৪৯	—১৪৭	—৩	৪৪১
১৪০—১৪৪	—১৪২	—১	১৪২
		N—৫০	৮৫৪২

মিন $= \frac{৮৫৪২}{৫০} =$ ১৭০.৮০ ।

মিডিয়ান আছে ১৭০—১৭৪ এই শ্রেণী ব্যবধানে। এই শ্রেণী নিম্নপ্রান্ত হোল—১৬৯.৫০ ।

F হল—২০

fm হল—১০

i হল—৫

∴ মিডিয়ান হল ১৬৯.৫০ + ৫$\left(\frac{২৫-২০}{১০}\right)$ = ১৬৯.৫০ + $\frac{৫\times৫}{১০}$ = ১৬৯.৫০ + ২.৫০ = ১৭২.০০ ।

মোড—অবিন্যস্ত সারিতে মোড নির্ণয়ের উপায় হল যে স্কোরটি সবচেয়ে বেশীবার এসেছে সেটিই হল মোড। এটিকে crude মোড বা empirical মোড বলা হয়। কিন্তু True মোড বলতে যে কোন ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের সর্বোচ্চ শিখরকে বোঝায়। এর সূত্র হল **Mode = 3 Mdn − 2 Mean** উপরের উদাহরণ থেকে অঙ্কটি কষলে হবে ৩ × ১৭২.০০ — ২ × ১৭০.৮০

= ৫১৫.০০ — ৩৪১.৬০ = ১৭৪.৪০

∴ মোড = ১৭৪.৪০ ।

মিন নির্ণয়ের আর একটি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি আছে। ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে যখন স্কোরের সংখ্যা বেশী হয়, তখন একটা সংক্ষিপ্ত উপায়ে মিন নির্ণয় করা যায়। এই পদ্ধতিতে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের মাঝামাঝি জায়গায় একটা কল্পিত মিন ধরে নিয়ে অঙ্কটি কষতে হয়।

যে শ্রেণীতে ফ্রিকোয়েন্সী সবচেয়ে বেশী, সেই শ্রেণীর মধ্যবিন্দুকে Assumed Mean (A.M.) বা কল্পিত মিন ধরে নেওয়া হয়। এর সূত্র

হ'ল—$A.M. + \frac{\Sigma fx^1}{N} \times i$

আরও সংক্ষেপ করে বলা হয় $A.M. + Ci$

$$C = Correction = \frac{\Sigma fx^1}{N}$$

শ্রেণী ব্যবধান	মধ্যবিন্দু	f	x^1	fx^1
৭০—৭১	৭০·৫	২	৫	১০
৬৮—৬৯	৬৮·৫	২	৪	৮
৬৬—৬৭	৬৬·৫	৩	৩	৯
৬৪—৬৫	৬৪·৫	৪	২	৮
৬২—৬৩	৬২·৫	৬	১	৬
				+৪১
৬০—৬১	৬০·৫	৭	০	০
৫৮—৫৯	৫৮·৫	৫	−১	−৫
৫৬—৫৭	৫৬·৫	৪	−২	−৮
৫৪—৫৫	৫৪·৪	২	−৩	−৬
৫২—৫৩	৫২·৫	৩	−৪	−১২
৫০—৫১	৫০·৫	১	−৫	−৫
				−৩৬
				৪১ − ৩৬ = ৫
		N = ৩৯		= ৫

মিন : আনুমানিক = ৬০·৫

Ci = $\frac{৫}{৩৯}$ = ·১২৮

i = ২

Ci = ·১২৮ × ২ = ·২৫৬

আনুমাণিক মিন Ci = ৬০·৫০ + ·২৫৬ = ৬০ ৭৬

∴ মিন = ৬০·৭৬

মিডিয়ান হবে—৫৯·৫ + $\left(\frac{১৯·৫ - ১৫}{৭}\right)$ × ২ = ৫৯·৫ + $\frac{৪·৫}{৭}$ × ২

= ৫৫·৫ + $\frac{৯}{৭}$

= ৫৯·৫ + ১·২৮৬ = ৬০·৭৮ (মিডিয়ান)

∴ মিডিয়ান = ৬০·৭৮

মোড হবে—(৩ × ৬০·৭৯) — (২ × ৬০·৭৬) = ১৮২·৩৭ — ১২১·৫২

= ৬০·৮৫

∴ মোড—৬০·৮৫

এখানে দেখা যাচ্ছে মিন, মিডিয়ান ও মোড প্রায় কাছাকাছি। কাজেই এখানে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন খুব স্বাভাবিক।

মিন, মিডিয়ান ও মোড নানান উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। যখন আমরা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কেন্দ্রীয় প্রবণতা পেতে চাই তখন আমরা মিন ব্যবহার করি। এক্ষেত্রে অবশ্য বণ্টনটি নর্মাল হওয়া চাই।

যখন দীর্ঘ গণনা করতে হয় তখন অল্প সময়ে মিডিয়ানের সাহায্যে উত্তর পাওয়া যায়। বণ্টনটিও এখানে খুব স্বাভাবিক থাকে না।

যখন সবচেয়ে তাড়াতাড়ি আমরা কেন্দ্রীয় প্রবণতার সাহায্যে পরিমাপ করতে চাই তখন মোড ব্যবহার করি। এটা একটা কাজ চালান গোছের পরিমাপ।

প্রশ্নাবলী

1. What do you understand by Central Tendency? What are the usual measures of Central Tendency used in educational statistics?

বিষমতার পরিমাপ (Measuring Variability)—কেন্দ্রীয় প্রবণতা হল বিশেষ কোন স্কোরগুচ্ছের প্রতিনিধিস্বরূপ। এর সাহায্যে আমরা স্কোরগুলির একটি সামগ্রিক ধারণা পাই; কিন্তু স্কোরগুলির সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য এতে জানা যায় না। একটা স্কোরগুচ্ছের সঙ্গে অন্য একটি স্কোরগুচ্ছের কি তফাৎ, কোনটির চেয়ে কোনটি বেশী বৈষম্যপূর্ণ এসব জানতে হলে বিষমতার সাহায্য নিতে হবে।

বিষমতা সাধারণতঃ চার রকমে প্রকাশ করা হয়। যেমন (১) রেঞ্জ (Range) (২) মিন বিচ্যুতি (Mean Deviation) (৩) আদর্শ বিচ্যুতি (Standard Deviation) ও (৪) চতুর্থাংশ বিচ্যুতি (Quartile Deviation)

(১) রেঞ্জ—স্কোরগুলি কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে তা জানা যায় রেঞ্জের সাহায্যে। কোন একটি বণ্টনে সব চেয়ে বড় স্কোর থেকে ছোট স্কোরকে বাদ দিলে রেঞ্জ পাওয়া যায়।

(২) মিন বিচ্যুতি—কোন বণ্টনের কেন্দ্রীয় প্রবণতা থেকে তার প্রত্যেকটি স্কোরের যে বিচ্যুতি সেই বিচ্যুতির গড়কেই মিন বিচ্যুতি বলে।

(৩) আদর্শ বিচ্যুতি—আদর্শ বিচ্যুতি হল মিন থেকে নেওয়া বিচ্যুতি-

গুলিকে বর্গ করে নেওয়া ফল অবিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে আদর্শ বিচ্যুতি বা SD বার করায় সূত্র হোল—$\sqrt{\frac{\Sigma d^2}{N}}$

কিন্তু বিন্যস্ত স্কোরের ক্ষেত্রে প্রতিটা আলাদা স্কোরের বিচ্যুতি না বার করে প্রতি শ্রেণী ব্যবধানের মধ্য বিন্দু ও মিনের মধ্যে ব্যবধান বার করা হয় এবং সেই বিচ্যুতির বর্গ করে নেওয়া হয়। এর সূত্র হল—

$$i\sqrt{\frac{\Sigma fx'^2}{N}-\left(\frac{\Sigma fx'^2}{N}\right)^2}$$

আদর্শ বিচ্যুতির উদাহরণ—

স্কোর	মধ্যবিন্দু	f	x'	fx'	fx'²
২০০—২০৪	২০১·৫	০	০	০	০
১৯৫—১৯৯	১৯৬·৫	১	৫	৫	২৫
১৯০—১৯৪	১৯১·৫	২	৪	৮	৩২
১৮৫—১৮৯	১৮৬৫	৪	৩	১২	৩৬
১৮০—১৮৪	১৮১·৫	৫	২	১০	২০
১৭৫—১৭৯	১৭৬·৫	৮	১/৫	৮/৪৫	৮
১৭০—১৭৪	১৭১·৫	১০	০	০	০
১৬৫—১৬৯	১৬৬·৫	৬	—১	—৬	৬
১৬০—১৬৪	১৬১·৫	৪	—২	—৮	১৬
১৫৫—১৫৯	১৫৬·৫	৪	—৩	—১২	৩৬
১৫০—১৫৪	১৫১·৫	২	—৪	—৮	৩২
১৪৫—১৪৯	[illegible]	৩	—৫	—১৫	৭৫
১৪০—১৪৪	১৪১·৫	১	—৬	৬	৩৬
১৩৫—১৩৯	১৩৬·৫	০	০/১	০/৫৫	০
		N = ৫০	—৬	—১২	৩২২

S·D এর সূত্র $i\sqrt{\frac{\Sigma fx'^2}{N}-\left(\frac{\Sigma fx^1}{N}\right)^2}$

৫অঙ্কটি হবে $\sqrt{\frac{৩২২}{৫০}-\left(\frac{-১২}{৫০}\right)^২} = ৫\sqrt{\frac{৩২২}{৫০}-\left(\frac{১৪৪}{২৫০০}\right)}$

$= ৫\sqrt{৬\text{'}৪৪-\text{'}০৫৮৬} = ৫\sqrt{৫\text{'}৮৬}$

$= ৫ \times ২\text{'}৪২২ = ১২\text{'}১১০$

∴ আদর্শ বিচ্যুতি হল ১২'১১০

(৪) চতুর্থাংশ বিচ্যুতি—কোন বণ্টনের স্কোরগুলিকে চার ভাগ করলে এক চতুর্থাংশ স্কোর পাই ; একে 25th Percentile বা First Quartile (Q_1) বলা হয়। এই বিন্দুর নীচে মোট স্কোরের ২৫% শতাংশ স্কোর আছে। দ্বিতীয় চতুর্থাংশ হল মিডিয়ান। তিন চতুর্থাংশ হল 75th Percentile বা Third Quartile (Q_3) যার নীচে মোট স্কোরের ৭৫% শতাংশ স্কোর আছে। চতুর্থাংশ বিচ্যুতি হল প্রথম চতুর্থাংশ ও তিন চতুর্থাংশের মধ্যবর্তী বিন্দু। চতুর্থাংশ বার করার সূত্র হল—

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

উপরে আদর্শ বিচ্যুতির যে স্কোর বণ্টন দেখানো হয়েছে ঐ বণ্টনটিরই Q বার করা যাক। এর জন্য Q_1 ও Q_3 আগে কষে বার করে নিতে হবে।

$$Q_1 = L + \frac{\frac{N}{4} - F}{fm} \times i$$

$$= ১৫৯\text{'}৫ + \frac{১২\text{'}৫ - ১০}{৪} \times ৫ = ১৫৯\text{'}৫ + \frac{২\text{'}৫}{৪} \times ৫$$

$$= ১৫৯\text{'}৫ + \frac{১২\text{'}৫}{৪} = ১৫৯\text{'}৫ + ৩\text{'}১৩ = ১৬২\text{'}৬৩$$

$$Q_3 = L + \frac{\frac{3N}{4} - F}{fm} \times i = ১৭৪\text{'}৫ + \frac{৩৭\text{'}৫ - ৩০}{৮} \times ৫$$

$$= ১৭৪\text{'}৫ + \frac{৭\text{'}৫}{৮} \times ৫ = ১৭৪\text{'}৫ + \frac{৩৭\text{'}৫}{৮}$$

$$= ১৭৪\text{'}৫ + ৪\text{'}৬৯ = ১৭৯\text{'}১৯$$

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2} = \frac{১৭৯\text{'}১৯ - ১৬২\text{'}৬৩}{২} = \frac{১৬\text{'}৫২}{২} = ৮\text{'}২৬$$

∴ $Q = ৮\text{'}২৬$

আমরা দেখতে পাচ্ছি নানাভাবে একটি বণ্টনের বিষমতার পরিমাপ করা যায়। কিন্তু কখন কোন পদ্ধতি ব্যবহার করব ?

যখন স্কোর সংখ্যা খুব কম ও বিস্তৃত, যখন খুব তাড়াতাড়ি বিষমতার পরিমাপ জানা দরকার তখন রেঞ্জ ব্যবহার করতে হয়।

যখন স্কোরের কেবলমাত্র মিডিয়ানটা জানা থাকে—বণ্টনের উপরের দিক প্রায় অজানা থাকে তখন সাধারণতঃ বিষমতার পরিমাপ জানার জন্য ব্যবহৃত হয়।

যখন খুব পরিশ্রম না করেও মোটামুটি নির্ভরযোগ্য একটা বিচ্যুতি জানার প্রয়োজন হয়, যখন বণ্টনটিতে চরম বিচ্যুতিসম্পন্ন স্কোর থাকে তখন মিন বিচ্যুতি ব্যবহার করা হয়।

আবার যখন বিষমতার নিখুঁত পরিমাপটি আমরা জানতে চাই, যখন স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্রের সংশ্লিষ্ট নানারকম ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া যায়।

সহগতি (Correlation) বা সহ-পরিবর্তন।

আমাদের আশে পাশে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায় যেগুলির মধ্যে একটির পরিবর্তন ঘটলে অন্যটিরও পরিবর্তন দেখা যায়। এই দুই ঘটনার মধ্যে সহ পরিবর্তনের সম্পর্ক আছে—বলা হয়। যেমন বৃষ্টি পড়লে গরম কমে। এই সহপরির্তন তিন রকমের হ'তে পারে। (১) সমমুখী সহপরিবর্তন (Positive) (২) বিপরীত সহ-পরিবর্তন (Negative) ও (৩) প্রভাবশূন্য সহপরিবর্তন (Indiffeient)।

(১) সমমুখী সহ-পরিবর্তন—যখন দুটি ঘটনাব মধ্যে একটি বাড়লে অন্যটিও কমে তখন এই দুটি ঘটনার মধ্যে সমমুখী সহপরির্তনের সম্পর্ক আছে বলা হয়। যেমন জ্বর যত বাড়তে থাকে থার্মোমিটারের পারার উচ্চতাও তত বাডতে থাকে। আবার জ্বর যখন কমে যায় থার্মোমিটারের পারার উচ্চতাও তখন কমে যায়।

(২) অনুরূপভাবে বলা যায় যখন দুটি ঘটনাব মধ্যে একটি বাড়লে অন্যটি কমে—আবার একটি কমলে অন্যটি বাড়ে, তখন তাদের মধ্যে বিপরীত সহ-পরিবর্তনের সম্পর্ক আছে বলা যেতে পারে। যেমন দেশে শিক্ষার প্রসারে অপরাধ প্রবণতা কমে আবার শিক্ষার প্রসার কমলে অপরাধ প্রবণতা বাড়ে।

(৩) আবার এমন অনেক ঘটনা ঘটে যেগুলি একটি অপরটির সঙ্গে কোনভাবেই যুক্ত নয়, সেগুলিকে প্রভাবশূন্য সহপরিবর্তন বলে। যেমন কলকাতায় বৃষ্টি হ'ল আর মেদিনীপুরে বন্যা হ'ল।

সহ-পরিবর্তনের মান নির্ণয় (Co-efficient of correlation)—সহ-পরিবর্তনের মানকে সাধারণত r অক্ষর দিয়ে বোঝান হয়। এই r যে পদ্ধতিতে নির্ণয় করতে হয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রচলিত পদ্ধতি হ'ল প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতি (Product Moment Method)।

প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে প্রথমে অভিকার্থীর প্রতি স্কোরের মিন-বিচ্যুতি বার করে নিতে হয়। প্রত্যেকের দুটি করে স্কোর থাকে। ফলে দুটি করে মিন-বিচ্যুতি x ও y পাওয়া যায়। তারপর এ দু'টিকে গুণ করে xy পাওয়া যায়। আবার এইভাবে পাওয়া xy-গুলিকে যোগ করে Σxy পাওয়া যায়।

এরপর স্কোর গুচ্ছ দুটির সিগমা বার করে নিতে হয়। এই সিগমার গুণফলকে মোট সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হয়। প্রোডাক্ট মোমেণ্টের সূত্র হ'ল—

$$r = \frac{\Sigma xy}{N\sigma x\ \sigma y}$$

ধরা যাক ৫ জন ছাত্রের উপর বুদ্ধির অভীক্ষা ও স্মৃতির অভীক্ষা প্রয়োগ করে দুটি স্কোর গুচ্ছ পাওয়া গেল। তাদের সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় করা হচ্ছে—

(১) ছাত্র	(২) বুদ্ধির স্কোর	(৩) স্মৃতির স্কোর	(৪) x	(৫) y	(৬) xy
ক	২২	৩০	৩	০	০
খ	১৯	২৫	০	—৫	০
গ	১৬	১০	—৩	—২০	৬০
ঘ	২০	৪০	১	১০	১০
ঙ	১৪	৪৫	—১	১৫	—১৫
					৫৫

বুদ্ধির স্কোরের মিন=১৯ , সিগমা=২'২৪

স্মৃতির স্কোরের মিন=৩০ ; সিগমা=১৩'৬৯

সূত্র $r = \frac{\Sigma xy}{N\sigma x\ \sigma y} = \frac{৫৫}{৫ \times ২'২৪ \times ১৩'৬৯} = '৩৬$

সারি পার্থক্যের পদ্ধতি (Rank Difference Methed)—সারি পার্থক্যের পদ্ধতির সাহায্যেও সহ-পরিবর্তনের মান নির্ণয় করা যায়। এই পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের স্কোর অনুযায়ী সারি বিন্যাস করে নিয়ে তাদের দুটি গুচ্ছের সারিগত পার্থক্য থেকে সহ পরিবর্তনের মান নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে সহপরিবর্তনের যে মান পাওয়া যায় তাকে রো বা P বলে। এই পদ্ধতি প্রোডাক্ট মোমাণ্ট-এর মত অতখানি হয়তো নির্ভরযোগ্য নয় তবে কাজ চালানর পক্ষে বিশেষ কার্যকরী। এই পদ্ধতিটি মনোবিজ্ঞানী স্পিয়ারম্যান আবিষ্কার করেন।

রো বা P নির্ণয়ের সূত্র$=1-\dfrac{6\times\Sigma D^2}{N(N^2-1)}$

ধরা যাক ৬ জন ছাত্রের বুদ্ধির অভীক্ষা ও স্মৃতির অভীক্ষা দিয়ে দুটি স্কোরগুচ্ছ পাওয়া গেল।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ছাত্র	বুদ্ধিরস্কোর	স্মৃতিরস্কোর	বুদ্ধির স্কোরের সারি	স্মৃতির স্কোরের সারি	পার্থক্য D	পার্থক্য² (D^2)
ক	১০	১৬	৪	২	২	৪
খ	৭	১৪	৫	৩	২	৪
গ	১৫	১৮	২	১	১	১
ঘ	২০	১২	১	৪	—৩	৯
ঙ	৬	৮	৬	৬	.	০
চ	১২	১০	৩	৫	—২	৪
					০	২২

সূত্র অনুসারে অঙ্কটি হবে : $১-\dfrac{৬\times২২}{৬(৩৬-১)}$

$=১-\frac{১৩২}{২১০}=\frac{৭৮}{২১০}=\cdot৩৭$

সিগমা স্কোর বা আদর্শ স্কোর

মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে স্কোর পাওয়া যায় সেগুলিকে অনেক সময় স্কেলের আকারে সাজিয়ে নেওয়ার দরকার হয়। একটা ছেদহীন সরলরেখার উপর স্কোরগুলিকে ছোট থেকে বড়তে সাজিয়ে নিলে তাকে স্কেল বলে।

শিক্ষাশ্রয়ী রাশিবিজ্ঞানে সাধারণতঃ বিশেষ অভীক্ষা থেকে পাওয়া স্কোরগুলিকে আদর্শ স্কোরে নিয়ে যাওয়া হয়। এর ফলে স্কোরগুলি একটা বিশেষ স্কেলের আকারে পরিণত করতে হয় এবং সেগুলিকে তখন পরস্পরের তুলনা করতে সুবিধা হয়।

ধরা যাক অভীক্ষার মিন—১২০ এবং আদর্শ বিচ্যুতি হল—২৪। এখন যদি কোন ছাত্র ঐ অভীক্ষায় ১৪৪ পেয়ে থাকে তবে তার মিন-বিচ্যুতি হবে ১৪৪ − ১২৪ -- ২৪। এবার এই মিন-বিচ্যুতিকে যদি অভীক্ষার আদর্শ-বিচ্যুতি দিয়ে ভাগ করি তবে ছাত্রটির স্কোর বার হবে $\frac{২৪}{২৪}$ = ১·০০।

একজন ছাত্রী দুটি বিষয় পরীক্ষা দিয়েছে, তাতে সে যা মার্কস পেয়েছে তা দেখে বলতে হবে সে কোন বিষয়ে বেশী ভাল। যেমন অমিতা ইংরাজীতে পেয়েছে ৫০ আর বাংলায় পেয়েছে ১৬৮। এটি দুটি স্কোরকে এমন একটা আদর্শ স্কোরের বণ্টনে নিয়ে যেতে হবে যার মিন=২০০ এবং σ = ৫০।

এই দুটি স্কোরের মধ্যে তুলনা করতে হবে।

আদর্শ স্কোর বার করার সূত্র হল—

$$X' = \frac{\sigma'}{\sigma}(X - M) + M'$$

এখানে X = প্রদত্ত বণ্টনের সাধারণ স্কোর

X′ = নতুন বণ্টনের আদর্শ স্কোর

M = প্রদত্ত বণ্টনের মিন

M′ = আদর্শ স্কোর বণ্টনের মিন

σ = সাধারণ স্কোরের SD

σ' = আদর্শ স্কোরের SD

অমিতার ইংরাজী অভীক্ষার আদর্শ স্কোর = $\frac{৫০}{১০}$(৫০ − ৫২) + ২০০ = ১৯০।

অমিতার বাংলা অভীক্ষার আদর্শ স্কোর = $\frac{৫০}{১২}$(১৬৮ − ১২০) + ২০০ = ৪০০।

এখানে আদর্শ স্কোর দুটির মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাবে যে অমিতা বাংলার চেয়ে ইংরাজীতে অপেক্ষাকৃত ভাল।